আল্লামা শিবলী নু'মানী

# ইসলামী দর্শন

ইসলামী দর্শন

# ইসলামী দর্শন

আল্লামা শিবলী নু'মানী

# ইসলামী দর্শন

## প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড



মুহাম্মদ আবদুল্লাহ অনূদিত

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

হিজরী পঞ্চদশ শতক উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রকাশিত

ইসলামী দর্শন ঃ
অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল্লাহ
এম. এম., এম. এ. (ট্রিপল), এম. ফিল
সহযোগী অধ্যাপক, উর্দু-ফার্সী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ই. ফা. প্রকাশনা ঃ ৯৮৭
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন গ্রন্থাগার
ইসলাম-দর্শন
২৯৭'০১

প্রথম প্রকাশ ঃ
সেপ্টেম্বর, ১৯৮১
ভাদ্র, ১৩৮৮
জিল্‌কদ, ১৪০১

প্রকাশ করেছেন ঃ
মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
৬৭, পুরানা পল্টন, ঢাকা-২

প্রচ্ছদ এঁকেছেন ঃ
এম. এ. কাইয়ুম

ছেপেছেন ঃ
তাজ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৬এ/১, কোর্ট হাউজ স্ট্রীট, ঢাকা-১

বেঁধেছেন ঃ
সোসাইটি বুক বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
২৬, কুমারটুলী লেন, ইসলামপুর রোড, ঢাকা-১

মূল্য ঃ ৪০'০০

---

ISLAMI DARSHAN : Islamic Philosophy written by Allama Shibli Numani in Urdu and translated by Muhammad Abdullah into Bengali and published by the Islamic Foundation Bangladesh to celebrate the fifteenth century Al-Hijrah.

Price Tk. 40·00 ; U. S. Dollar : 5·00

# প্রসংগ-কথা

কোন্ কোন্ মৌলিক বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপনের উপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত এবং আল্লাহ্-রসূল, কুরআন-হাদীস, ইহকাল-পরকাল, শরীঅত-তরীকত প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে কিরূপ ধারণা পোষণ করা অপরিহার্য—এসব জানা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। এ ছাড়া কি তত্ত্ব বা দর্শনের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন মুসলিম সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হলো এবং ফলে ইসলামের ধর্মীয় বিশ্বাস ও বিধি-বিধান সম্পর্কে নানা মতবাদের উদ্ভব হলো, তা অনুধাবন করাও আমাদের ধর্মীয় দায়িত্ব। ইসলামের জন্মলগ্ন থেকে যুগে যুগে অন্য ধর্মাবলম্বী ও বিধর্মীদের দিক থেকে ইসলামের ধর্মীয় মতবাদ, সামাজিক বিধি-বিধান, অর্থনৈতিক চিন্তাধারা ও নির্দেশনা এবং সাংস্কৃতিক রীতি-নীতির অনেক বিরূপ সমালোচনা হয়েছে, আবার অন্য দিক থেকে ইসলামের অপরূপ সৌন্দর্যের গুণ-গানও করা হয়েছে এবং এই সৌন্দর্য-সুরভির আকর্ষণে মোহিত হয়ে বিশ্বে মুসলমানদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে এবং তাদের শক্তি-সামর্থ্য, তাদের ভাবধারার প্রগতিশীলতা আর যুগোপযোগিতাও জগদ্বাসীর সামনে দিন দিন ভাস্বর থেকে ভাস্বরতর হয়ে উঠছে। আমাদের কর্তব্য, আধুনিক বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির ফলে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও বিধর্মীদের দিক থেকে ইসলামের বিধি-বিধান যেসব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে বা হচ্ছে এবং আধুনিক শিক্ষার প্রসারের ফলে মুসলিম তরুণদের মনে নিজ ধর্ম সম্পর্কে যে সব সন্দেহের উদ্রেক হচ্ছে, তা নিরসন করা, অন্যদিকে অমুসলিম মহল থেকে ইসলামের যেসব সর্বজনীন মূল্যবোধের স্বীকৃতি পাওয়া গেছে, তা তুলে ধরা।

আল্লামা শিবলী নু'মানী ছিলেন মুসলিম বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী দার্শনিক। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বা নাস্তিকদের দিক থেকে ধর্মীয় বিশ্বাস ও ইসলামের বিধি-বিধানের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনীত হয়েছে বা আধুনিক শিক্ষিত মুসলিম তরুণদের মনে নিজ ধর্ম সম্পর্কে কোন কোন বিষয়ে যেসব প্রশ্ন জাগে, সে বিষয়ে তিনি সম্যকভাবে ওয়াকিফহাল ছিলেন। এসব সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে তিনি আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে ও আধুনিক পদ্ধতিতে উর্দু ভাষায় 'ইল্মুল-কালাম' ও 'আল-কালাম' নামক দু'টি বই রচনা করেন। প্রথমোক্তটিতে তিনি 'ইল্মে কালাম' তথা

ধর্মীয় বিশ্বাস শাস্ত্রের মূলনীতি, 'ইল্‌মে কালাম'-এর ইতিহাস ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় সংক্ষেপে তুলে ধরেন। শেষোক্তটিতে ধর্মীয় বিশ্বাস সংক্রান্ত মৌলিক বিষয়গুলো এবং ইসলামী বিধি-বিধানের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বিবৃত যাবতীয় বিষয়ের খুঁটিনাটি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন।

বাংলা সাহিত্যে এরূপ একটি গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছিল। অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ আল্লামা শিবলী রচিত 'ইল্‌মুল-কালাম' ও 'আল-কালাম' নামক গ্রন্থদ্বয় বাংলায় রূপান্তরিত করে 'ইসলামী দর্শন' নামে অভিহিত করেন এবং তা দু'খণ্ডে বিভক্ত করেন। প্রথম খণ্ডে 'ইল্‌মুল-কালাম' এবং দ্বিতীয় খণ্ডে 'আল-কালাম-এর অনুবাদ স্থান লাভ করে। অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় বাংলা সাহিত্যের এ প্রয়োজন পূরণ করে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। এ বইটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্-কে জানায় আন্তরিক মুবারকবাদ।

এ. জেড. এম. শামসুল আলম
মহাপরিচালক,
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

তাং, ঢাকা—২২।৮।৮১

# উৎসর্গ

স্নেহ ও প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ
আমার পত্নী ওয়াযীফা বেগম-কে
—অনুবাদক

# সূচী

## প্রথম খণ্ড

## ইলমুল-কালাম

# প্রথম খণ্ড

## ইল্‌মুল্‌-কালাম

# আল্লামা শিবলী নু'মানী (১৮৫৭-১৯১৪)

## ।। মোহাম্মদ ইকবাল সলীম গহন্দরী ।।

আল্লামা শিবলী নু'মানী ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে আজমগড় জেলার অন্তর্গত বিন্দাওল্ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে আজমগড় শহরের স্বীয় বাসভবন—শিবলী মন্‌জিলে ওফাত প্রাপ্ত হন। ইন্তেকালের সন্ধিক্ষণে তিনি আপন গ্রন্থাগার, বাসভবন এবং তৎসংলগ্ন বাগানবাড়ীটি 'দারুল মুসাননিফীন' প্রতিষ্ঠার জন্য ওয়াক্‌ফ্ করেন। বাগানবাড়ীর পাশে ছিল শিবলী প্রতিষ্ঠিত একটি হাই স্কুল। স্কুলটি বর্তমানে একটি জাঁকালো কলেজে পরিণত হয়েছে। এটি 'শিবলী কলেজ' নামে অভিহিত।

আল্লামা শিবলী নু'মানী ছিলেন একাধারে গবেষক, কবি, অধ্যাপক, বাগ্মী, মহৎ সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার এবং তদুপরি ছিলেন এক অভূতপূর্ব আলিম শ্রেণীর জনক। ওফাতের পূর্বে তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ শিষ্য ও উপশিষ্যদের নিয়ে বিশেষজ্ঞদের এমন একটি দল সৃষ্টি করেন, যাঁরা সারা দেশে তাঁর ব্রতকে কেবল জিন্দাই রাখেন নি, বরং তার যথেষ্ট অগ্রগতিও সাধন করেন। তাঁদের জ্ঞান সাধনার ফলে জাতি গবেষণা ও গ্রন্থ রচনায় উদ্বুদ্ধ হয়। এঁদের শিষ্যরাও শিবলীর অভিযানকে আরো ত্বরান্বিত করেন। এজন্যই আল্লামা শিবলীকে বিশেষ ব্যক্তিরূপে অভিহিত না করে 'জ্ঞান ও সাহিত্য সেবা প্রতিষ্ঠান'-রূপে আখ্যায়িত করা হয়। জ্ঞান সাধনা ও সাহিত্যচর্চা ক্ষেত্রে তিনি এক বিশেষ চিন্তাধারার উদ্‌গাতারূপে পরিগণিত। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে দু'চারজনকে খতিয়ে দেখলে বুঝতে পারবেন যে, এঁদের প্রত্যেককেই এক একটি বিদ্যাপীঠ বলা যায়।

মওলানা শিবলী নু'মানীর শিষ্যদের মধ্যে ঃ

১। **মওলানা যফর আলী খান** ছিলেন সাংবাদিকতা, কাব্য ও সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে অসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী। যাঁরা

তাঁর পরশ পেয়ে ধন্য হন, তাঁদের সবাই আজ উন্নতির শিখরে অধিষ্ঠিত।

২। **মওলানা সৈয়দ সুলাইমান নাদবী** ছিলেন বিদ্যাবুদ্ধির মধ্যমণি। তিনি জ্ঞানের আলো বিকিরণ করে বিশ্বকে উদ্ভাসিত করেন। গবেষণা ও ধর্মীয় জ্ঞানক্ষেত্রে তিনি যেন অকূল সমুদ্র। তাঁর কাছে শত শত বিদ্বান ও লেখক শিক্ষালাভ করেন, যাঁরা আজ আমাদের জন্য গৌরবের পাত্র।

৩। **খাজা আবদুল ওয়াজেদ নাদবীর** নিকট শিক্ষালাভ করে শত শত লোক বিশিষ্ট বিদ্বান ও লেখকরূপে খ্যাতি অর্জন করেন।

৪। **মওলানা আবদুস সালাম নাদবী** একজন বিখ্যাত গ্রন্থকার। তিনি 'উসওয়া-এ-সাহাবা' (সাহাবাদের আদর্শ) এবং জ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ক অন্যান্য গ্রন্থের রচয়িতা।

৫। **ইকবাল সুহাইল** হলেন ইউ. পি. পরিষদের সদস্য, কবি, বাগ্মী ও সমালোচক।

দেখুন! এ হলো মাত্র পাঁচজনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। শিবলী নু'মানী এহেন জ্ঞান-গবেষণা শক্তিসম্পন্ন লোকের একটি বড় দল সৃষ্টি করেন। এঁদের শিষ্য ও অনুশিষ্যরা শিবলীর আরব্ধ কাজ সুসম্পন্ন করে চলেছেন।

আল্লামা শিবলী উর্দুর 'চার স্তম্ভের' একজন। উর্দু সাহিত্যে, বিশেষত, জ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধক্ষেত্রে তিনি যে রচনাশৈলী অবলম্বন করেন, তা জনপ্রিয় ও প্রচলিত। তাঁর রচনাভঙ্গি সম্পর্কে কোন এক চিন্তাশীল ব্যক্তি যে মন্তব্য করেন, তা আজ লোকমুখে প্রচলিত। মন্তব্যটি হলো এইঃ শিবলীর রচনাশৈলীতে এমন একটি আকর্ষণ রয়েছে, বিরুদ্ধবাদী লোকেরাও তাঁর বিরুদ্ধে কিছু লিখতে গেলে তাঁর লেখনীভঙ্গির অনুসরণ না করে পারেন না।

আল্লামা শিবলীর রচনায় সারল্য, মাধুর্য ও প্রাণ-প্রাচুর্যের যে মনোরম সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়, তার তুলনা খুঁজে মেলা ভার। তাঁর লেখা জ্ঞানমূলক হোক বা সাহিত্য বিষয়ক, গবেষণা-ধর্মী হোক বা রসাত্মক, পদ্য হোক বা গদ্য—সব ক্ষেত্রেই তিনি যা দিয়েছেন, তা উচ্চমানের এবং বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। তাঁর রচনাবলীতে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর লেখা দৃষ্ট হয় না। তাঁর

গ্রন্থাবলী কেবল উর্দু ভাষার জন্যেই গৌরবের বস্তু নয়, যে সব ভাষায় সেগুলো অনূদিত হয়েছে, তাদের জন্যেও অমূল্য জ্ঞানসম্পদ-রূপে বিবেচিত।

আল্লামা শিবলী বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে 'আল-ফারুক', 'শেরুল-আজম', 'সীরাতুন নবী', 'সীরাতুন্নুমান'সহ বেশ কয়েকখানি কিতাব ফার্সী, ইংরেজী, আরবী ও তুর্কী ভাষায় অনূদিত হয়। যদি তাঁর সাবলীল লেখনীধারা অথবা বুদ্ধিভিত্তিক বিষয়াদিতে গবেষণা শক্তির চরম উৎকর্ষ লক্ষ্য করতে হয়, তবে তাঁর গ্রন্থদ্বয়—'আল্‌-কালাম' ও 'ইলমুল কালাম' প্রণিধান করুন। এতে রয়েছে ইলমে কালামের ইতিহাস এবং ইসলামী দর্শনবিদদের নিয়ে আলোচনা। এ রচনার ফলে সৃষ্টি হয় এক বিশেষ আধুনিক ইলমে কালাম। এ বিষয়ে লিখিত এর চাইতে অধিকতর উৎকৃষ্ট গ্রন্থ উর্দু, তুর্কী বা ইংরেজীতে খুঁজে পাওয়া যায় না। ফার্সী তো দূরের কথা, আরবীতেও এর চাইতে উত্তম গ্রন্থ পরিলক্ষিত হয় না।

জ্ঞান পিপাসুদের উপকারার্থে আমরা গ্রন্থটির উভয় খণ্ড একত্রীভূত করে প্রকাশ করছি।

'অ-মা-তাওফীকী ইল্লা বিল্লাহ'—আল্লাহ্ ছাড়া সহায় নেই।

## 'ইলমে কালাম' এর উপকারিতা

সক্রেটিস, প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের যুগকে দর্শনের 'স্বর্ণযুগ' বলা হয়। এঁরা মৌলিক চিন্তাধারার প্রাচুর্যে তহযিব-তমদ্দুনের কায়ায় নবপ্রাণ সঞ্চার করেন; বিশ্ব, আত্মা এবং স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কে নতুন মতবাদ প্রবর্তন করেন। এসব মতবাদ ক্রমশ বিপ্লবের আকার ধারণ করে। ফলে, এমন একটি চিন্তাধারা গড়ে উঠে, যার বহুল প্রচার ও প্রভাব দীর্ঘকাল যাবত আকায়েদ অর্থাৎ ধর্মীয় বিশ্বাস-দেহে আঘাত হানতে থাকে। এর অশুভ পরিণতির কথা ভেবে কেবল রাজনীতিবিদরাই নয়, শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সেরা লোকেরাও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। এর আরো একটি প্রতিক্রিয়া এই দাঁড়ালো যে, পরবর্তী বংশধরেরা জীবন দর্শনের প্রত্যেকটি দিক নিয়ে অতিরিক্ত মাথা ঘামাতে আরম্ভ করে।

দর্শন জন্ম নেয় সন্দেহের গর্ভে এবং তা জীবনীশক্তি লাভ করে ধর্ম এবং আকায়েদের সংস্পর্শ ছাড়াই। সুতরাং, দর্শনের বহুল চর্চা

এবং সূক্ষ্ম আলোচনা মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিকে জড়সড় করে তোলে। দার্শনিকগণ আল্লাহ্ এবং বিশ্ব নিয়ে ভাবতে শুরু করেন। তাঁরা যুক্তি ও জ্ঞানের আলোকে আল্লাহ্র অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব প্রমাণে উঠে পড়ে লাগলেন।

ইসলাম বলতে বুঝায়—ধর্মীয় বিশ্বাস, ইবাদত আর সচ্চরিত্র। এমন এক সময় ছিল, যখন এই মূল নীতিগুলো ছিল সুস্পষ্ট ও হৃদয়স্পর্শী। এগুলো সকলের পক্ষেই ছিল সমভাবে গ্রহণীয়। যাঁরা রসূল করীম (সঃ)-এর সাহচর্য লাভ করেন এবং তাঁর বাণীও শুনতে পান, তাঁরা ভাবতেন, তাঁর বাণীকে কার্যে পরিণত করাই হলো প্রকৃত ঈমান। তাঁদের মনে কোন বিষয়ে সন্দেহের উদ্রেক হয়নি। যতদিন রসূল করীম ও তাঁর সাহাবিগণ দুনিয়াতে ছিলেন, ততদিন কোন দর্শন মুসলমানদের ঈমান ও ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত হানতে পারেনি। 'খেলাফতে রাশেদা'র পর খলীফাদের মাথায় দেশ বিজয়ের খেয়াল চাপে। ফলে, মুসলমানদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক চিন্তাধারায় বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়। এদিক থেকে আব্বাসী খলীফাদের যুগ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁরা ইসলামের চিরন্তন সারল্য ও সাম্য ত্যাগ করে একনায়কত্ব, বিলাস-ব্যসন ও স্বেচ্ছাচারিতার বেসাতি আরম্ভ করেন। তাঁরা একদিকে ইরানী ও গ্রীকদের দর্শনকে আরবীতে রূপান্তরিত করেন, অন্যদিকে পাশ্চাত্য জগতের সাথে সাংস্কৃতিক ও তমদ্দুনিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। এই টানা-পোড়েনের ফলে মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে অক্ষত রাখা মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। ইসলামী আকায়েদে শত শত প্রশ্নের উদ্ভব হয়। আত্মা, নুবুওয়াত এবং আল্লাহ্র অস্তিত্ব সম্পর্কে অবিশ্বাস আর সন্দেহের ঝড় উঠে পাশ্চাত্য জগতের 'হাঁ বোধক' বা 'না বোধক' চিন্তাধারার ছড়াছড়ি বড় বড় মুসলিম ধর্ম প্রচারক ও তফসীরকারদের পথভ্রষ্ট করে দেয়। তাঁদের ইসলামবিরোধী সমালোচনা মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাসে ফাটল ধরাতে আরম্ভ করে। মুসলিম চিন্তানায়কগণ এ সময়ই 'ইলমে কালাম' (ধর্মীয় বিশ্বাস সম্বন্ধীয় বিদ্যা)-এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং এর উন্নতি সাধনে ব্রতী হন। খোলা মাঠে নেমে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার সাহস পাশ্চাত্য জাতিসমূহের ছিল না। তারা জানতো যে, তলোয়ার দিয়ে যদি মুসলমানদের পদানত করার চেষ্টা করা হয়, তবে তাদের পরিণতি

হবে এমনি, রসুল করীমের দুশমনদের যেমন হয়েছিল কোন এক সময়। এই পরিপ্রেক্ষিতে তারা দর্শনের আড়ালে আশ্রয় নেয় এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের হাতিয়ার নিয়ে ইসলাম ধর্মের উপর হামলা চালাতে শুরু করে। মুসলিম চিন্তানায়কগণ ভাবলেন, দর্শনের ঢাল দিয়ে দর্শনের রদ করাই হলো প্রতিরোধের সর্বোত্তম পন্থা। এঁদের যুক্তিবাদ ও ঐশী জ্ঞানভিত্তিক চিন্তাধারা কেবল নাস্তিকতাকেই রুখে দাঁড়ায়নি, সমালোচকদের সামনেও তাঁরা এটা প্রমাণ করে দিলেন যে, অভ্যন্তরীণ শক্তি হোক বা বহিঃশক্তিই হোক, বিরোধী শিবিরের মোকাবিলায় তাঁরা যথেষ্ট শক্তির অধিকারী। মুসলিম চিন্তাবিদদের এ চিন্তাধারাই আবু মুসলিম, আবু বকর, আবুল কাসেম বলখী এবং আরো অন্যান্য ওলামাকে অগ্রগতির পথে ধাবিত করে। তাঁরা পাশ্চাত্য চিন্তাধারা রদ করার জন্য কুরআনের তফসীর করেই ক্ষান্ত হননি, ইলমে কালাম বিষয়ে কতক স্বতন্ত্র গ্রন্থও রচনা করেন। এঁরাই পৃথিবীকে সর্বপ্রথম এক বিশেষ 'আধুনিক ইলমে কালাম' এর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ইমাম রাযী, ইমাম গাযালী, ইবনে রুশদ বা কাজী আযুদের ভাবধারা ও মতবাদ যাই হোক না কেন, এঁদের সবারই লক্ষ্য ছিল নিছক যুক্তিবাদের ধারাকে রোধ করা। মুসলমানদের মধ্যে তখন প্রতিরোধের এ মনোভাব দ্রুত প্রসার লাভ করতে থাকে।

এই মহান ব্যক্তিদের পদক্ষেপ ও দূরদর্শিতার ফলে মিসর, সিরিয়া তুরস্ক ও অন্যান্য মুসলিম দেশে ইলমে কালামের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়। এসব দেশের মুসলিম চিন্তাবিদরা এ শাস্ত্রকে এত উন্নত, দৃঢ় ও বিস্তৃত করে তোলেন যে, এর সামান্য ধাক্কায় গ্রীক ও ইরানী দর্শনের লৌহ দুর্গ ধ্বসে পড়ে। তা সত্ত্বেও গ্রীক ও ইরানী দর্শনের ছিটে ফোঁটা ও বিচ্ছিন্ন ভগ্নাবশেষের প্রভাবে মুসলিম ভারতের চিন্তাধারা প্রভাবিত না হয়ে পারেনি। স্যার সৈয়দ আহমদ গোড়াতেই এ আসন্ন বিপদ আঁচ করতে সক্ষম হন। মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাস বিকৃত হোক, তারা কালের প্রবাহে ভেসে যাক ও পথভ্রষ্ট হোক—এটা তাঁর মোটেও সহ্য হতো না। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ 'তফসীরুল্ কুরআনে'র প্রণয়ন এই অনুভূতিরই ফলশ্রুতি।

স্যার সৈয়দের পর শিবলী নু'মানীই প্রথম ব্যক্তি, যিনি একনিষ্ঠভাবে নাস্তিক্যের ক্রমবর্ধমান ধারাকে রোধ করার জন্য চেষ্টা করেন।

তিনি 'নাদওয়াতুল ওলামা'র এক সভায় আলেম সমাজকে সতর্ক করে বলেন, "দর্শনের আড়ালে কুফ্‌র ও নাস্তিক্যের যে ধারা ভারতের দিকে বয়ে আসছে, তা রোধ করা আলেম সমাজের কর্তব্য।" খুব কম লোকই শিবলীর কথায় সায় দেয়। কেউ কেউ তাঁকে 'জড়বাদী', আবার কেউ কেউ 'ধর্মহীন' বলে অভিহিত করে। বস্তুত তিনি ছিলেন একজন মুসলিম দরদী। তিনি হাসিমুখে বিরুদ্ধ শিবিরের প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর দিতেন। তিনি চেষ্টা করতেন যে, জনসাধারণ যেন ভাবাবেগে প্রবাহিত না হয় এবং তাঁর মর্মবাণী উপলব্ধি করে।

শিবলী ছিলেন হানাফী পন্থী। এ বিষয়ে লোকের মনে যেন সন্দেহের উদ্রেক না হয়, সেজন্য তিনি কেবল 'সীরাতুন্ নু'মান'ই রচনা করেন নি, নিজ নামের সাথে স্থায়ীভাবে 'নু'মানী' শব্দটিও সংযোজিত করেন।

'আল-কালাম' ও 'ইলমুল-কালাম' নামক গ্রন্থ দু'টি শিবলীর সবচাইতে বড় অবদান। প্রথমে তাঁর ইচ্ছা ছিল গ্রন্থদ্বয়কে চার খণ্ডে সমাপ্ত করা। কিন্তু দুই খণ্ড প্রকাশিত হবার পর দেখলেন যে, তাঁর মূল উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ হয়েছে। তাই আর অগ্রসর হওয়ার ইচ্ছা ত্যাগ করেন।

গাযালী এবং রাযীর ভাবধারায় শিবলী অনেকটা উপকৃত হন। তিনি এ রচনাদ্বয়ের মাধ্যমে এক বিশেষ ইলমে কালামের ভিত্তি স্থাপন করেন। এতে এমন সব প্রশ্নের আলোচনা স্থানলাভ করে, ভারতের বুকে সময় সময় যার উদ্ভব হয়ে থাকে। মিশনারীদের খ্রীস্ট ধর্ম প্রচার এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক অন্তর্দ্বন্দ্ব ভারতীয় মুসলমানদের মন-মেজাজকে অতিষ্ঠ ও পরাভূত করে রেখেছিল। তারা যুগের একজন গাযালী বা রাযী বা ইবনে রুশদের আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় ছিল। তারা নাস্তিকদের অভিযোগ রদ করে আপন ধর্মীয় বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যুক্তির খোঁজে উন্মুখ হয়ে রয়েছিল।

শিবলী মুসলমানদের বিপদগামী হতে দেননি। তিনি সুষ্ঠু বুদ্ধিভিত্তিক প্রমাণ দিয়ে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসসমূহ প্রতিষ্ঠিত করেন। যাঁরা দর্শন ও যুক্তিবিদ্যার চর্চা করেন, তাঁরা ভাল করে জানেন যে, ভারতে আজ পর্যন্ত শিবলীর সমকক্ষ কোন 'কালামবিদ' জন্মগ্রহণ করেনি। তাঁর এ রচনাদ্বয়ের জ্ঞান ও যুক্তিবাদের আলোকে ইসলামের মৌলিক আকীদাসমূহ উপলব্ধি করা যায়। যারা এতদিন নিজেদের

ধর্মীয় বিশ্বাসকে কেবল হাওয়ার উপর দাঁড় করিয়ে রেখেছিল এবং মনের টানেই আপন ধর্মীয় বিশ্বাসে অটল ছিল, তাদের জন্য এই গ্রন্থদ্বয় ছিল মহার্ঘ্য। এর ফলে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস খুবই দৃঢ়তা লাভ করে। শিবলী রচিত গ্রন্থদ্বয়ের উপকারিতা এখানেই শেষ নয়। পাশ্চাত্য দর্শনের দিক থেকে ইসলামী আকায়েদের বিরুদ্ধে যে সব প্রশ্নের অবতারণা করা হয়, সেগুলোর দাঁতভাঙ্গা জওয়াব দেবার জন্যও মুসলিম চিন্তাবিদগণ এ রচনাদ্বয়ের সাহায্য গ্রহণ করতে আরম্ভ করেন।

শিবলী যখন 'ইলমুল-কালাম' ও 'আল-কালাম' রচনায় রত ছিলেন, তখন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে মুসলমানরা ছিল পর্যুদস্ত। এছাড়া পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থাও তখন ইসলামী আকায়েদকে বিনষ্ট করার জন্য ছিল যথেষ্ট। আজ বাংলাদেশে খ্রীস্টান মিশনারিগণ নব নব কৌশলে ইসলামের মৌলিক আকায়েদ বিনষ্ট করতে বদ্ধপরিকর। এমতাবস্থায় শিবলীর 'আল-কালাম' ও 'ইলমুল-কালাম'-এর উপকারিতা আরো বেড়ে যেতে বাধ্য।

## বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

[ আল্-হামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন্ অস্সলাতু আলা রসূলিহী মুহাম্মাদেঁও-অ-আলিহী-অ-আস্হাবিহী আজমাঈন ]

দুনিয়ার প্রায় সকল জাতির কাছেই ধর্ম সবচাইতে প্রিয় বস্তু। মুসলমানদের কাছে এ-তো ছিল প্রাণাধিক প্রিয় এবং এর বিশেষ কারণও ছিল। তা'হলো – 'মুসলমান' বলতে কোন বংশ, পরিবার, দেশ, লোকালয় বা ব্যক্তি বিশেষকে বুঝায় না; এ হলো একটি ভাবধারার নাম। মুসলিম জাতীয়তাবাদের মৌল উপাদান বা উৎস হলো—ধর্ম। তাই এ দিকটা বাদ দিলে জাতীয়তাবাদের অস্তিত্বই থাকে না। এ ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়েই মুসলমানরা যুগে যুগে তাদের ধর্মকে সর্ববিধ সঙ্কট থেকে রক্ষা করার জন্য দুর্বার চেষ্টা চালায়।

আব্বাসী খলীফাদের শাসনামলে গ্রীস ও পারস্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান আরবী ভাষায় রূপান্তরিত হয়। প্রত্যেক জাতিকে স্বাধীনভাবে ধর্মীয় আলোচনা করা এবং বিতর্কে অংশ গ্রহণ করার পুরোপুরি অধিকার দেয়া হয়। ফলে, ইসলাম এক বড় সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। পার্সী, খ্রীস্টান, ইহুদী ও নাস্তিকরা দিকে দিকে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। মুসলিম জয় যাত্রার প্রথম অঙ্কে এদের গায়ে ইসলামী অসির যে যখম লেগেছিল, এখন তারা মসীরূপ অসি দিয়ে সেই প্রতিশোধ নিতে উদ্যত হলো। তারা স্বাধীন ও বেপরোয়া সমালোচনার তীরে ইসলামী আকায়েদকে ক্ষত-বিক্ষত করতে লাগলো। ফলে দুর্বলমনা মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত নড়বড়ে হয়ে উঠলো।

সে সময় শাসন ক্ষমতা বলে খুব সহজেই এসব বিরূপ সমালোচনার দ্বার রুদ্ধ করে দেয়া যেতো। কিন্তু মহানুভবতার বশবর্তী হয়ে মুসলমানরা কলমের জওয়াব তলোয়ারে দেয়া পছন্দ করেনি। ওলামা সমাজ ঐকান্তিক আগ্রহ ও পরিশ্রম সহকারে দর্শন শিক্ষা করেন এবং বিরোধিগণ ইসলামের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যে সব হাতিয়ার

অবলম্বন করে, তা দিয়েই তাদের আক্রমণ প্রতিহত করেন। সেসব প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলশ্রুতিই আজ 'ইলমে কালাম' নামে পরিচিত।

আব্বাসীদের আমলে ইসলাম সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। আজ তার চাইতেও বড় সঙ্কটের আশঙ্কা বিদ্যমান। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ঘরে ঘরে স্থান লাভ করেছে। স্বেচ্ছাচারিতা আজ এ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে, পূর্বে ন্যায্য কথা বলাও এত সহজ ছিল না, আজ অন্যায় কথা বলা যতটুকু সহজ। ধর্মীয় ভাবধারায় ভূমিকম্পের ন্যায় আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। আধুনিক শিক্ষিত লোকেরা আজ আগাগোড়া পাশ্চাত্য ভাবধারায় প্রভাবান্বিত। প্রবীণ ওলামা সমাজ যদি কখনো নির্জনতার বাতায়ন থেকে মুখ বের করেন, তাঁরা দেখতে পান যে, ধর্মের দিগন্ত মেঘাচ্ছন্ন।

চারদিক থেকে রব উঠছে—একটি আধুনিক ইলমে কালাম প্রণীত হোক! এ প্রয়োজন তো সবাই সমর্থন করে। কিন্তু মতভেদ হলো এর মূলনীতি নিয়ে। আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মতে, 'আধুনিক ইলমে কালাম' আগাগোড়া নব্য নীতির উপর ভিত্তি করেই রচিত হবে। কারণ, অতীতে ইসলামের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আনীত হয়, তা ছিল স্বতন্ত্র ধরনের। আজ অভিযোগের আকৃতি-প্রকৃতি পুরোপুরি পরিবর্তিত। অতীতে ইসলামের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল গ্রীক দর্শনের সাথে। গ্রীক দর্শন আদ্যোপান্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল অনুমান ও কল্পনার উপর। কিন্তু আজ ইসলামকে মোকাবিলা করতে হচ্ছে বাস্তব অভিজ্ঞতার সাথে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। তাই এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কেবল অনুমান বা কল্পনা দিয়ে কোন লাভ হবে না।

কিন্তু আমার মতে, এ ধারণা ঠিক নয়। প্রাচীন ইলমে কালামের যে অংশকে আজ নিরর্থক বলে মনে করা হয়, তা পূর্বেও ছিল অপর্যাপ্ত। আর যে অংশটুকু তখন ফলপ্রসূ ছিল, তা আজও তদ্রূপ এবং বরাবরই তদ্রূপ থাকবে। কাল-প্রবাহ বা বিপ্লবের ফলে কোন বস্তুর বিশুদ্ধতা বা বাস্তবতা বিনষ্ট হয় না। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি দীর্ঘদিন ধরে আশা করে আসছিলাম যে, প্রাচীন নীতির অনুসরণে এমন এক বিশেষ ইলমে কালাম প্রণয়ন করবো, যা হবে বর্তমান যুগের রুচি মোতাবেক। কিন্তু পরে ভাবলাম, এ বিষয়ে হাত দেবার পূর্বেই ইলমে কালামের বিস্তারিত ইতিহাস লেখা আবশ্যক এবং এর দুটি কারণও ছিল ঃ

১। যে ইলমে কালাম প্রণয়ন করা আমার উদ্দেশ্য, তার রচনা-ভঙ্গি যা-ই হোক না কেন, তাতে একটা বস্তুর প্রতি আমাকে লক্ষ্য রাখতেই হবে। তা হলোঃ পূর্ব-পুরুষদের নির্ধারিত নীতি যেন কোথাও লংঘিত না হয়। এ রচনায় আমাকে আরো একটি বিষয়ের উল্লেখ করতে হবে। তা হলোঃ যুগে যুগে মুসলিম ইমামগণ ইলমে কালাম রচনায় কি নীতি অবলম্বন করেছিলেন? তাতে যে সব পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধিত হয়, তাই বা কোন প্রকার বা কি প্রকৃতির ছিল? এতে একটি ফয়দাও রয়েছে। এ প্রসঙ্গে মুসলমানদের প্রগতিশীলতা, স্বাধীন চিন্তাধারা, সাহসিকতা, উদারতা—এমন কতগুলো গুণ প্রতিভাত হয়ে উঠবে, যার জন্য এ যাবত কোন স্বতন্ত্র ইতিহাস রচনা করা সম্ভব হয়নি এবং যা অন্যভাবেও প্রকাশ লাভ করেনি।

২। ইতিহাস বিষয়ে ইউরোপের লোকেরা যে সব নব নব উৎকর্ষ সাধন করেছেন, তন্মধ্যে একটি হলো এই যে, তাঁরা ব্যক্তিগত ও জাতীয় ইতিহাস রচনার কাজ সম্পন্ন করেছেন। এখন তাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাস রচনায় নিয়োজিত। তাঁরা এখন যে সব বিষয়ের পেছনে লেগে রয়েছেন, তা হলো---অমুক শাস্ত্রের উৎপত্তি হলো কখন? কি কারণে ও কিভাবে এর ক্রমোন্নতি হলো? এতে এ যাবত কি কি উন্নতি এবং কি কি পরিবর্তন-পরিবর্ধন সাধিত হলো? এ ধরনের কোন ইতিহাস গ্রন্থ উর্দুতে কেন, আরবী-ফার্সীতেও দৃষ্ট হয় না। আমি আমার গ্রন্থ রচনার সূচনা থেকেই ইতিহাসকে আপন বিষয়রূপে বেছে নিয়েছি। তাই এ যাবত যা লিখেছি এবং যা প্রকাশিত হয়েছে, তা ইতিহাস ভিন্ন আর কিছুই নয়। এদিক থেকে দেখতে গেলে ইলমে কালাম ছিল আমার আওতার বাইরে। তাই আমি ভাবলাম, যদি ইলমে কালামের ইতিহাস লিখি, তবে একদিকে ইসলামী সাহিত্যের একটি বড় অভাব ঘুচবে, অন্যদিকে ইলমে কালামের এ রচনাটিও আমার আওতাভুক্ত হয়ে পড়বে এবং এমনি করে ইতিহাসের গণ্ডি অতিক্রম করে গুনাহগার হওয়া থেকেও আমি রেহাই পাবো।

## প্রাচীন ওলামা রচিত ইলমে কালামের ইতিহাস গ্রন্থ

ইলমে কালাম এবং কালামবিদগণের জীবনচরিত সম্পর্কে আরবী ভাষায় অনেক গ্রন্থ রচিত হয়। সবার আগে হিজরী চতুর্থ

শতকে মহান ঐতিহাসিক আল্লামা মরয্‌বাণী 'আখ্‌বারুল-মুতাকাল্লিমীন' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ইবনে নাদীম খুব শ্রদ্ধাসহকারে তাঁর নাম উল্লেখ করেন। এরপর আরো অনেক গ্রন্থ প্রণীত হয়। নিম্নে সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হচ্ছে ঃ

| গ্রন্থ | গ্রন্থকার |
|---|---|
| মাকালাতুল্ ইসলামীন | ইমাম আবুল হাসান আশ্‌য়ারী |
| মিলাল্ ও নিহাল্ | আবুল মুযাফ্‌ফর তাহির বিন মোহাম্মদ ইসফারায়েনী |
| মিলাল্ ও নিহাল্ | কাজী আবু বকর মোহাম্মদ বিন আত্‌তাইয়েব বাকেল্লানী মৃঃ ৪০৩ হিঃ |
| মিলাল্ ও নিহাল্ | আবুল মনসুর আব্দুল কাহির বিন তাহির বাগদাদী। মৃঃ ৪২৯ হিঃ। |
| আল্-ফুস্‌সাল-ফিল মিলাল্ অন্ নিহাল্ | আল্লামা আলী বিন্-আহমদ-বিন হাযম যাহিরী। মৃঃ ৪৫৬ হিঃ। |
| মিলাল্ ও নিহাল্ | ইমাম মোহাম্মদ বিন আব্দুল করীম শহরিস্তানী। মৃঃ ৫৪৮ হিঃ। |
| মিলাল্ ও নিহাল্ | আহমদ বিন ইয়াহইয়া মুরতযা যাইদী। |

এঁদের মধ্যে ইবনে হায্‌ম শহরিস্তানী এবং মুরতাযা যাইদীর গ্রন্থদ্বয় আমার সামনেই অধ্যয়নভুক্ত রয়েছে। ধর্মীয় বিশ্বাসে সর্বপ্রথম কিভাবে মতভেদের সৃষ্টি হলো, কিভাবে তা প্রসার লাভ করলো এবং কিভাবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হলো, ইবনে হায্‌ম ও মুরতাযা যাইদী তাঁদের গ্রন্থে এর বিস্তারিত বিবরণ দেন। তাঁরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিশ্বাসেরও আলোচনা করেন। ইবনে হায্‌ম তাঁর গ্রন্থে বিরুদ্ধবাদীদের মতবাদেরও খণ্ডন করেন। মুরতাযা যাইদীর গ্রন্থটি 'মুতাযিলা' ও 'যাইদিয়া' মতবাদের উপর লিখিত।

এ গ্রন্থমালার সব কয়টি মুস্‌লিম সম্প্রদায়সমূহের অভ্যন্তরীণ মতভেদ বর্ণনায় সীমিত। নাস্তিক ও দার্শনিকদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় 'মুতা-

কাল্লিম' (কালাম শাস্ত্রবিদ)-গণ যে ভূমিকা গ্রহণ করেন, তার উল্লেখ এসব গ্রন্থে নেই। এজন্য আমাকে আরো অনেক গ্রন্থ আলোচনা করতে হয়। তন্মধ্যে কয়েকটির নাম ঃ

| গ্রন্থ | গ্রন্থকার |
|---|---|
| তাহাফাতুল-ফালাসিফাহ | ইমাম গাযালী |
| আত্তাফ্রিকাতো-বাইনাল-ইসলামে ও য্যানাদিকাহ্ | ,, ,, |
| মিশ্কাতুল-আনওয়ার | ,, ,, |
| তাবিলাতুল্-কোরআন | ইমাম আবু মনসুর মাত্রিদী |
| আল্-মাকসাদুল-আকসা | ইমাম গাযালী |
| আল্ মায্নুনু-আলা-গাইরে আহ্লিহী | ,, ,, |
| আল্ মায্নুনু আলা আহ্লিহী | ,, ,, |
| আল্ কিস্তাসুল মুসতাকীম | ,, ,, |
| আল্-ইকতিসাদু ফিল্ ইতিকাদ্ | ,, ,, |
| মায়ারিজুল্-কুদ্স্ | ,, ,, |
| জওয়াহিরুল-কোরআন | ,, ,, |
| ইল্জামুল আওয়াম | ,, ,, |
| মুনকিয্ মিনাদ্-দালাল | ,, ,, |
| আন্-নাফখু-অত্তস্বিয়াহ্ | ,, ,, |
| মাতালিবে আলিয়াহ্ | ইমাম রাযী। এটি ইমাম রাযীর সর্বশেষ রচনা। |
| নিহাইয়াতুল উকুল | ,, ,, |
| আরবাইন্-ফী-উসুলিদ্-দীন | ,, ,, |
| মাবাহিসে-মাশরিকিয়াহ্ | ,, ,, |
| হিকমাতুল ইশরাক্ | শেখ শিহাবুদ্দীন মাক্তুল্ |
| হায়াকিলুন নূর | ,, ,, ,, |
| আল্ কালামু আলাল মুহাস্সাল | ইবনে তাইমিয়াহ্ |
| রদ্দে মানতিক্ | ,, ,, |
| শরহি মাকাসিদ | আল্লামা তাফতাযানী |
| শরহি মাওয়াকিফ্ | কাজী আয্দুদ্দীন ও সৈয়দ শরীফ |
| সাহাইফ্ | ,, ,, ,, ,, ,, |
| কিতাবুর রুহ্ | ইবনে কাইয়েম |

অধুনা ইলমে কালাম বিষয়ে মিসর, সিরিয়া ও ভারতে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে এবং এতে নতুন ইলমে কালামের অঢেল মাল-মসলাও সৃষ্টি হয়েছে। এই নতুন ইলমে কালামকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় : এক ধরনের ইলমে কালাম দেখা যায়, যাতে অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা আর প্রমাণ বই কিছুই নেই। এটা মূলত আশায়েরাপন্থী শেষ যুগীয় ওলামারই সৃষ্টি। আরেক ধরনের ইলমে কালাম রয়েছে, যাতে ইউরোপের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং তাদের ভাবধারাকে সত্যের মাপকাঠি-রূপে ধরে নেয়া হয়েছে, তৎপর কুরআন-হাদীসকে জোর জবরদস্তি করে টেনে এনে তার সাথে খাপ খাইয়ে নেয়া হয়েছে। প্রথমোক্তটি অন্ধ অনুকরণ এবং শেষোক্তটি অনুকরণধর্মী ইজতেহাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই আমি এসব গ্রন্থাবলীকে মোটেই গ্রহণযোগ্য বলে মনে করিনি।

## ইলমে কালামের ইতিহাস

### ইলমে কালামের দু'টি স্বতন্ত্র বিভাগ :

বেশ কিছু কাল থেকে ইলমে কালাম একটি মিশ্র বিষয়রূপে পরিগণিত হয়ে আসছে। মূলত তা ছিল দুটি স্বতন্ত্র ভাগে বিভক্ত এবং উভয়ের উদ্দেশ্যও ছিল পৃথক পৃথক। এক প্রকারের ইলমে কালাম কেবল মুসলিম সম্প্রদায়সমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের ফলে জন্মলাভ করে। এই ইলমে কালাম দীর্ঘকাল ধরে প্রসার লাভ করতে থাকে। এরই ফলে বড় বড় হাঙ্গামা এবং বিতর্কের লড়াই দানা বেঁধে উঠে। এতে কেবল কলমেরই আশ্রয় নেয়া হয়নি, তলোয়ারও ব্যবহৃত হয়। এ লড়াই মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় মারাত্মক আঘাত হানে।

দ্বিতীয় প্রকারের ইলমে কালাম দর্শনের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গিয়ে জন্মলাভ করে। ইমাম গাযালীর আবির্ভাবের পূর্বে ইলমে কালামের উভয় শাখা ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। তিনিই এ দু'টিকে মিশিয়ে ফেলার সূত্র আবিষ্কার করেন। পরবর্তীকালে ইমাম রাযী এই মিশ্রিত ইলমে কালামের উন্নতি বিধান করেন। শেষ যুগীয় ওলামাগণ বিষয়টিকে এত এলেমেলো করে দিলেন যে, দর্শন, কালাম, আকাইদ-নীতি সব কিছু মিলে একটি জগাখিচুড়ি সৃষ্টি হয়।

মুসলমানদের বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রথম প্রকারের ইলমে কালাম নিয়ে চর্চা বা তার ইতিহাস রচনা করা মোটেই সমীচীন নয়। আমার উদ্দেশ্য হলো দ্বিতীয় প্রকারের ইলমে কালামের ইতিহাস লেখা এবং তদনুসারে একটি আধুনিক ইলমে কালাম প্রণয়ন করা। কিন্তু এর অনেকটা নির্ভর করে প্রথমোক্ত ইলমে কালামের ইতিহাস জানার উপর। তাই তারও একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়া অপরিহার্য।

ইসলাম যতদিন আরবের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ ছিল, ততদিন আকাইদ নিয়ে কোন প্রকার পরিশ্রম, আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়নি, তর্কবিতর্কও সৃষ্টি হয়নি। তার কারণ হলো, আরবদের স্বভাব ছিল কেবল কাজ করে যাওয়া, কল্পনায় ডুবে থাকা নয়। তাই ইসলামের সূচনা থেকেই তারা নামায, রোযা, যাকাত ধর্মের সকল ব্যবহারিক দিকগুলো নিয়ে ভাবনা এবং গবেষণা শুরু করে। ধর্মীয় বিশ্বাস এবং ঈমান সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে তারা মাথা ঘামায় নি, পর্যালোচনাও করেনি। মোটামুটি আকীদাকে ঠিক রাখাই তাদের কাছে ছিল যথেষ্ট।

## ধর্মীয় বিশ্বাসে মতভেদের সূত্রপাত

### ধর্মীয় বিশ্বাসে মতভেদ সৃষ্টির প্রথম কারণ :

ইসলামের গণ্ডি যখন আরব ছেড়ে অনেকদূর প্রসারিত হলো, ইরানী, গ্রীক, কিব্‌তী এবং আরো অন্যান্য জাতি যখন মুসলিম দেশের সীমারেখায় প্রবেশ করলো, তখন থেকেই আকাইদ নিয়ে সূক্ষ্ম আলোচনা ও পর্যালোচনা শুরু হয়। কারণ টীকা-টিপ্‌পনী কাটা এবং তিলকে তাল করাই ছিল অনারবদের স্বভাব।

### দ্বিতীয় কারণ :

দ্বিতীয় কারণ ছিল এই যে, যে সব জাতি ইসলামে দীক্ষিত হয়, তারা পূর্ববর্তী ধর্মে আল্লাহ্‌র গুণাবলী, বিধি-বিধান, প্রতিদান ও শাস্তি ইত্যাদি বিষয়ে ভিন্ন ধারণা পোষণ করতো। একাধিক আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, আল্লাহ্‌র অংশীদারত্ব, মূর্তিপূজা এরূপ তাদের অনেক ধ্যান-ধারণা ছিল, যা স্পষ্টত ইসলাম বিরোধী। তারা যখন ইসলাম গ্রহণ

করলো, তখন তাদের এসব ভাবধারা মন থেকে সম্পূর্ণ ধুয়ে মুছে যায়। কিন্তু ইসলামের যে সব আকাইদে বিভিন্ন দিক রয়েছে, অর্থাৎ যাদের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করা যায় এবং তন্মধ্যে যেগুলোর সাথে তাদের পূর্ববর্তী ধর্মীয় বিশ্বাসের কিছুটা সাদৃশ্যও রয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে পুরনো ধ্যান-ধারণার দিকে ধাবিত হওয়াটা ছিল তাদের পক্ষে স্বাভাবিক ব্যাপার। বিভিন্ন ধর্মের লোক ইসলামে দীক্ষিত হয়। তাদের সাবেক ধর্মীয় বিশ্বাস ছিল পরস্পর বিরোধী। তাই ইসলামের উপর তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া না হয়ে পারেনি। ধরুন, ইহুদী ধর্মে আল্লাহ্‌কে 'শরীরী মানুষ' রূপে জ্ঞান করা হয়। আল্লাহ্‌র চোখে উঠে, চোখে যন্ত্রণাও হয়; ফেরেশতা তার সেবা করে; সে কখনো কখনো পয়গম্বরের সাথে মল্লযুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং দৈবক্রমে আঘাতও প্রাপ্ত হয় ইত্যাদি ইত্যাদি।

এরূপ ভাবধারার ধারক ও বাহক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলো। তাদের নজর কুরআনের সেসব আয়াতের উপর না পড়ে পারেনি, যাতে আল্লাহ্‌র হাত, মুখ এবং অন্যান্য কায়াবোধক বিভিন্ন শব্দ বিদ্যমান রয়েছে। এসব শব্দ দিয়ে তারা স্বভাবতই এ অর্থ করেছে যে, বস্তুত আল্লাহ্‌র হাত, পা ইত্যাদি রয়েছে।

### তৃতীয় কারণ ঃ

এ ছাড়া কতগুলো বিষয় রয়েছে বিতর্কমূলক, যাদের পরস্পর-বিরোধী অর্থ করা যায়। এসব ক্ষেত্রে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে মতদ্বৈধতা সৃষ্টি না হয়ে পারে না। যেমন 'জবর ও কদর' (মানুষের ক্ষমতা ও অক্ষমতা)-র বিষয়টি। এতে একদিকে ভাবলে মনে হয় যে, আমরা আপন কর্মের স্রষ্টা, পক্ষান্তরে এর অন্যদিকটা গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, কর্মতো দূরে থাক, আমাদের ইচ্ছা বা অনিচ্ছারও কোন অধিকার নেই। মনুষ্য প্রকৃতি বিভিন্ন ধরনের। এ বিভিন্নতাও ছিল মতদ্বৈততার একটি প্রধান কারণ।

### চতুর্থ কারণ ঃ

একজন সরলপ্রাণ, সরল স্বভাব ও পূতমনা ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ধ্যানে মগ্ন হলে তার মনে আল্লাহ্‌র যে ছবি অংকিত হয়, তা এই ঃ তিনি সারা বিশ্বের মালিক এবং রাজাধিরাজ; তাঁকে কেউ আদেশ দিতে পারে না;

কোন কাজ তাঁর জন্য অবশ্য করণীয় নয়; কেউ তাঁর আদেশ লংঘন করতে পারে না। পাপীকে ক্ষমা করা আর পুণ্যবানকে শাস্তি দেবার অধিকার একমাত্র তাঁরই রয়েছে। এ মর্ম কথা ব্যক্ত করে কোন কবি বলেনঃ

তিনি যখন দয়ার ভাণ্ডার নিয়ে এগিয়ে আসেন, তখন
আযাযিলও বলে—এতে আমারো অংশ রয়েছে। আবার
তিনি যখন রুষ্ট হন, আদেশের তরবারি উঠান,
'কাতিবীন কেরাম'ও হতবাক হয়ে পড়েন।

তিনি তাঁর অসীম শক্তির লীলা দেখালে পাথর কণাও পাহাড়ে পরিণত হয়; রাত দিনের আকার ধারণ করে; আগুনের উত্তাপ শীতল হয়ে যায়; পানির স্রোত থমকে দাঁড়ায়।

সকল সৃষ্টির মূলে রয়েছেন তিনি। যে সব বস্তুকে আমরা বাহ্যত সৃষ্টির হেতু বলে মনে করি, বস্তুত তা ঠিক নয়। মানুষ কোন কাজই স্বেচ্ছায় করতে সক্ষম নয়। সে কেবল তাই করতে সক্ষম, যা আল্লাহ্ করাতে চান।

এই ধ্যান-ধারণাগুলো ধর্মীয় বিশ্বাসের রূপ ধারণ করে এবং 'আশায়েরা' মতবাদে পরিণত হয়। এই বিষয়গুলো ইলমে কালামে নিম্ন পরিভাষায় বর্ণিত হয়ঃ

* আল্লাহ্‌র প্রত্যেকটি হুকুমকে মঙ্গলসূচক হতে হবে-তাঁর জন্য এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই।
* পৃথিবীতে কোন বস্তুই কোন বস্তুর সৃষ্টির হেতু হতে পারে না।
* বস্তুর সত্তায় কোন বৈশিষ্ট্য বা প্রভাব নেই।
* আল্লাহ্ যদি সৎকে বিনা দোষেও শাস্তি দেন, তবুও তা অন্যায় কিছু নয়।
* মানুষ স্বেচ্ছায় কোন কাজ করতে সক্ষম নয়।
* মানুষ ভাল-মন্দ যা-ই করে, তা আল্লাহ্ই করান।

**পক্ষান্তরে একজন দার্শনিক আল্লাহ্ সম্পর্কে নিম্নরূপ ধারণা পোষণ করেঃ**

* আল্লাহ্‌র প্রত্যেকটি কাজই মঙ্গলসূচক; তাঁর ক্ষুদ্রতম কাজও অমঙ্গলকর নয়।

* তিনি বিশ্ব শৃংখলা বজায় রাখার জন্য কতগুলো বাঁধাধরা নিয়ম রেখেছেন, যার কোন ব্যতিক্রম নেই।
* তিনি বস্তু সত্তায় এমন বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব রেখেছেন, যা অবিচ্ছেদ্য।
* তিনি মানুষকে ইচ্ছাধীন কাজ করার ক্ষমতা দিয়েছেন। সেজন্য প্রত্যেকেই স্ব স্ব কাজের জন্য দায়ী।
* ন্যায় বিচার করাই তাঁর স্বভাব। তিনি কখনো অবিচার করতে পারেন না।

এই ভাবধারা মুতাযিলার ধর্মীয় বিশ্বাসে পরিণত হয়।

ইমাম রাযী তাঁর 'তফসীরে কবীর' এর 'আন্‌আম' নামক সূরায় আবুল কাছেম আনসারীর মুখ দিয়ে এ গূঢ়তত্ত্ব বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'আহলে সুন্নাত-অল-জামায়াত' (আশ্‌য়ারিয়া) এর লক্ষ্য ছিল আল্লাহ্‌ তায়ালার শক্তির অসীমত্ব প্রকাশ করা। আর মুতাযিলার উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ্‌র মহিমা ও মহত্ত্ব তুলে ধরা এবং তাঁকে দোষমুক্তরূপে প্রতিষ্ঠিত করা। সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, উভয় সম্প্রদায়ই আল্লাহ্‌র মহত্ত্ব এবং পবিত্রতার সমর্থক। কেবল তফাৎ হলো একের মতবাদ ভ্রান্ত, আর অন্যের যথার্থ।

**পঞ্চম কারণ:**

ঐশী বাণীর সাথে যুক্তিবাদের কতটুকু সামঞ্জস্য আছে বা নেই, এ প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করেও আকাইদে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়। কতক মানুষ আছে, যারা প্রত্যেক ব্যাপারেই যুক্তি প্রয়োগ করতে চায়। তারা কোন কথাই বিশ্বাস করে না, যতক্ষণ না তা যুক্তিযুক্ত হয়। দ্বিতীয় প্রকারের লোক হলো, যারা আলোচনা বা সূক্ষ্ম বিচারে প্রবৃত্ত না হয়ে ধর্মপ্রাণ ও শ্রদ্ধাস্পদ লোক থেকে যা শোনে, তাই বিচার-বিশ্লেষণ না করে মেনে নেয়।

মানুষের এ দু'ধরনের প্রকৃতি স্বভাবেরই সৃষ্টি। তাই যুগে যুগে প্রকৃতি ও মনোবৃত্তির এ বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। মহামান্য সাহাবাদের জীবনী পাঠ করলে দেখতে পাবেন এরূপ অনেক ধর্মীয় মতভেদ। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) রসূলে করীমের হাদীস বর্ণনা

করে বলেন, "জীবিতদের বিলাপের কারণে মৃত ব্যক্তিদের শাস্তি দেওয়া হয়।" হযরত আইশা (রাঃ) এই হাদীস শুনে বললেন, "এটা হতেই পারে না। কারণ আল্লাহ্ স্বয়ং বলেছেন, "এক ব্যক্তির পাপের দায়ে অপর ব্যক্তির শাস্তি হ'তে পারে না।" কোন এক সাহাবী রসূলে করীমের হাদীস বর্ণনা করে বললেন, "মৃত ব্যক্তিরা শুনতে পায়।" হযরত আইশা এ হাদীস শুনে বললেন, "মৃত ব্যক্তিরা শুনতে পায় না। কারণ আল্লাহ্ স্বয়ং রসূল করীমকে সম্বোধন করে বলেনঃ "আপনি মৃতদের কিছুই শোনাতে পারবেন না।" হযরত আবু হুরাইরা রসূল করীমের অপর একটি হাদীস বর্ণনা করে বলেন, "আগুনে পাকানো খাদ্য খেলে অযু ভেঙ্গে যায়।" হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসূদ এই হাদীস শুনে বলেন, "যদি তাই হয়, তবে গরম পানি খেলেও অযুর প্রয়োজন হয়ে পড়বে।" হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস বলেন, "রসূল করীম মেরাজের সময় আল্লাহ্‌কে দেখতে পান।" হযরত আইশা প্রত্যুত্তরে বলেন, "কখনো দেখতে পাননি।"

সাহাবাদের সম্পর্কে (আল্লাহ্ মাফ করুন) এটা ধারণাও করা যায় না যে, তাঁরা রসূল করীমের বাণী অস্বীকার করতে পারেন। তাই বলতে হয়, যাঁরা উপরোক্ত হাদীসগুলো প্রত্যাখ্যান করেছেন, তাঁরা হয়তো ভেবেছেন যে, যা যুক্তিযুক্ত নয়, তা রসূল করীমের বাণীই নয়। তাঁদের মতে, বর্ণনাকারিগণ হয়তো তাঁদের বর্ণনায় ভুল করেছেন।

হযরত আইশা হযরত আবু হুরাইরা বর্ণিত অনেক হাদীসের দোষত্রুটি তুলে ধরেন। হাফেয জালালদ্দীন সুয়ুতী এ হাদীসগুলোর একটি সংকলন প্রস্তুত করেন।

### ষষ্ঠ কারণঃ

ধর্মীয় বিশ্বাসে মতভেদের আরো একটি বড় কারণ ছিল সামাজিক ক্ষেত্রে ওলামা সমাজের ভেদনীতি। মুহাদ্দিস ও ফকীহ্দের নীতি ছিল, তাঁরা স্বধর্মাবলম্বী ছাড়া অন্য কারুর সাথে মেলামেশা করতেন না। অন্যের সাথে উঠাবসা তাঁরা ভাল মনে করতেন না। দ্বিতীয় কারণ ছিল, তাঁরা হাদীসের অনুসন্ধান, আলোচনা ও পর্যালোচনায় এত ব্যস্ত থাকতেন যে, অন্য কোন দিকে লক্ষ্য করার মত অবকাশ তাঁদের ছিল না। ফলে বিধর্মীদের আওয়াজ তাঁদের কানে এসে পৌঁছতো না। তাঁরা মোটেও জানতেন না যে, ইসলামের বিরুদ্ধে

কি কি অভিযোগ আনীত হচ্ছে। তাঁদের আহ্বান ছিল কেবল আপন ভক্তদের প্রতি। ভক্তগণও তাঁদের কথা বিনা দ্বিধায় মেনে নিতো।

মুহাদ্দিসদের নিকট লোকেরা জিজ্ঞেস করতোঃ আল্লাহ্ যদি শরীরী না হন, তবে কি করে আর্‌শে আসীন হতে পারেন? উত্তরে তাঁরা বলতেনঃ এটা কিভাবে সম্ভব, তা আমাদের জানা নেই। তবে ব্যাপারটি নিয়ে প্রশ্ন করাও বেদা'ত। ভক্তগণ নীরবে এ জওয়াব মেনে নিতো। তাই মুহাদ্দিসদের এই গোলক ধাঁধাঁ দূর করার প্রয়োজন হতো না।

পক্ষান্তরে, মুতাকাল্লিমীন (ইলমে কালামবিদগণ) বিশেষতঃ মুতাযিলাবাদী ইমামগণ প্রত্যেক ধর্মের এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকের সাথে মেলামেশা করতেন এবং তাদের সাথে বিতর্কও করতেন। শিক্ষিত লোকদের উপর তাঁরা জোর জবরদস্তি অযৌক্তিক কিছু চাপিয়ে দিতেন না এবং দিলেও তা কার্যকর হতো না। তাই তাঁরা আলোচ্য বিষয়ের মূল রহস্য উদ্‌ঘাটনে ব্রতী হতেন এবং প্রশ্নকারীদের সন্দেহ দূর করার চেষ্টা করতেন।

এভাবে মুসলিম আকাইদের বিভিন্ন স্তরে যে সব পরিবর্তন-পরিবর্ধন সাধিত হয়, সেগুলো আমি বিভিন্ন মতবাদের আকারে পেশ করছি।

## 'যাহিরিয়া' ও 'মুশাব্বিহা'-দের মতেঃ

আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্পর্কে ইসলামী আকাইদে কয়েকটি পর্যায় দেখা যায়। প্রথম স্তরে রয়েছে 'যাহিরিয়া' ও 'মুশাব্বিহা' সম্প্রদায়। এঁদের মতে, আল্লাহ্ শরীরী, আপন আসনে আসীন। তাঁর হাত মুখ আছে। তিনি রসূল করীমের পবিত্র স্কন্ধে হাত রাখেন এবং রসূল করীমও তাঁর হাতের স্নিগ্ধতা অনুভব করেন।

## সাধারণ বর্ণনাকারী (আরবাবে রিওয়াইয়াত) এর মতেঃ

দ্বিতীয় পর্যায় হলো আল্লাহ্ শরীরী। তাঁর হাত, পা, মুখ ইত্যাদি আছে। তবে এসব আমাদের মত নয়। এটা হলো সাধারণ বর্ণনাকারীদের অভিমত।

তৃতীয় পর্যায় হলো আল্লাহ্ শরীরী নন। তাঁর হাত মুখ নেই। কুরআনে এ সম্পর্কে যে সব শব্দ রয়েছে, তাতে শাব্দিক ও

আভিধানিক অর্থ বুঝানো হয়নি। তাতে ভাবার্থ ও রূপকার্থ বুঝানোই উদ্দেশ্য। আল্লাহ্ শ্রবণকারী, চক্ষুষ্মান, জ্ঞাত-এসব গুণাবলী তাঁর সত্তাবহির্ভূত।

## সূক্ষ্মদর্শী আশায়েরার মতে :

চতুর্থ পর্যায় হলো আল্লাহ্র গুণাবলী তাঁর সত্তাভুক্ত নয়; বহির্ভূতও নয়।

## মুতাযিলার মতে :

পঞ্চম পর্যায়—আল্লাহ্র সত্তা একক। তিনি দ্বৈততার উর্ধ্বে। তাঁর সত্তাই সমস্ত গুণাবলীর আধার। তাঁর সত্তাই চক্ষুষ্মান, শ্রবণকারী এবং ক্ষমতাবান।

## মুসলিম দার্শনিক এবং সাধারণ সূফীদের মতে :

ষষ্ঠ পর্যায় : অস্তিত্বের অপর নাম আল্লাহ্। অর্থাৎ অস্তিত্বই তাঁর সত্তা। এই মতবাদই পরিভাষায় 'ওহ্দাতুল ওজুদ' (সর্ব-আল্লাহ্বাদ) এর নাম ধারণ করে। এখানেই দর্শন এবং সূফীবাদ একই সীমারেখায় প্রবেশ করে।

জ্ঞান বিজ্ঞান এবং ভাবধারার ক্রমোন্নতির ফলে ধর্মীয় বিশ্বাসেও পরিবর্তন পরিবর্ধন সাধিত হয়। ইসলাম এর ব্যতিক্রম নয়। বনু উমাইয়ার ক্রান্তি যুগে ইসলামী আকাইদ প্রথম পর্যায় অতিক্রম করে দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করে। আব্বাসী খলীফাদের দরবারে দার্শনিকদের ভীড় থাকতো। রাতদিন দর্শনের চর্চা হতো। ফকীহ্ এবং মুহাদ্দিসগণ বহুকাল পর্যন্ত হাদীস-কুরআনের বাহ্যিক ও শাব্দিক অর্থের উপর অনড় থাকেন। কিন্তু সাধারণ লোকের চিন্তাধারা অনেকটা এগিয়ে যায়। তারা নব পর্যায়ে উপনীত হয়। 'আল্লাহ্র হাত মুখ আছে। অথচ আমাদের মত নয়।' এরূপ ধারণায় তাদের বিশ্বাস করানো মুশকিল হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত ফকীহ্ এবং মুহাদ্দিসদের মধ্য থেকেই অন্য একটি সম্প্রদায়ের (আশ্আরিয়া) উদ্ভব হয়। এঁরা আল্লাহ্র শরীর এবং হাতমুখ অস্বীকার করেন। কিন্তু তাঁরা সেখানেও দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। কারণ আল্লাহ্র গুণাবলী (সিফাত্) নিয়েই ছিল তাদের প্রধান সমস্যা। আল্লাহ্র গুণাবলীকে যদি তাঁর সত্তাভুক্ত বলা হয়, তবে প্রতীয়মান হয় যে,

তাঁর গুণাবলী বলে স্বতন্ত্র কিছু নেই। পক্ষান্তরে, যদি সত্তা বহির্ভূত বলা হয়, তবে তাঁর সত্তা একাধিক্যের শিকারে পরিণত হয়। এই উভয় সংকট এড়ানোর জন্য তাঁরা বলতে বাধ্য হলেন যে, আল্লাহ্‌র গুণাবলী তাঁর সত্তাভুক্তও নয়, বহির্ভূতও নয়। কিন্তু এ সূক্ষ্ম সীমারেখায় দাঁড়িয়ে থাকবেন কি করে? শেষ পর্যন্ত তাঁদের মানতেই হলো যে, আল্লাহ্ এক অযৌগিক অস্তিত্ব এবং তা সমস্ত গুণাবলীর আধার।

এই আলোচনায় আমার এটা বুঝানো উদ্দেশ্য নয় যে, আকাইদের এই বিভিন্ন মতভেদ এখন সম্পূর্ণ মুছে গেছে। বিভিন্ন মতবাদে বিশ্বাসী লোক যুগে যুগে ছিল এবং বর্তমানেও রয়েছে। এখানে আমি এটাই বুঝাতে চাই যে, যত নতুন সম্প্রদায় ক্রমাগত জন্মলাভ করেছে, তাদের সবটিই প্রাচীন সম্প্রদায় সম্ভূত।

## রাজনৈতিক বিবর্তনের ফলেই আকাইদে মতদ্বৈধতার সূত্রপাত হয়

আকাইদে মতদ্বৈধতার আরো কারণ থাকলেও মূলে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রয়োজনেই এর সূত্রপাত হয়। বনু উমাইয়ার আমলে দেশে বিরাজমান ছিল কাটাকাটি আর হানাহানি। ফলে লোকের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। কিন্তু যখনই এর বহিঃপ্রকাশ ঘটতো এবং কারুর অভিযোগ শোনা যেতো, সরকারের খয়েরখা লোকেরা তাকে এই বলে স্তব্ধ করে দিতো—যা কিছু ঘটে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়ই ঘটে; আমাদের অভিযোগ করার কিছুই নেই ; আমাদের বলা উচিত —আমান্না-বিল-কাদ্‌রে খাইরিহী-ও-শার্‌রিহী— তকদীরে ভালমন্দ যা আছে, তা বিশ্বাস করলাম।

'জোর জুলুমের দেবতা' হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সময় মা'বাদ জুহানী নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। সাহাবাদের সাথেও তাঁর সাক্ষাত হয়। তিনি ছিলেন একজন সাহসী এবং ন্যায়পরায়ণ লোক। তিনি ইমাম হাসান বসরীর শিক্ষার আসরে যোগদান করতেন। একদিন তিনি ইমাম সাহেবের নিকট আরয করলেন, বনু উমাইয়াদের পক্ষ থেকে আল্লাহ্‌র বিধিবিধান নির্ধারিত—এ বলে যে ছুতানাতা পেশ করা হয়, তা কতটুকু ঠিক? ইমাম সাহেব উত্তরে বললেন, "আল্লাহর এই শত্রুগণ মিথ্যাবাদী।" মা'বাদ জুহানী প্রথম থেকেই বনু

উমাইয়াদের অন্যায় অত্যাচারে অতিষ্ঠ ছিলেন। তিনি তদবধি প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং প্রাণে মারা যান।

মা'বাদের পর গায়লান দামিশকী কর্তৃক এ ভাবধারা আরো প্রসার লাভ করে। তিনি ছিলেন হযরত ওসমানের দাস। তিনি পরোক্ষভাবে মোহাম্মদ বিন হানীফার নিকট শিক্ষালাভ করেন। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয খলিফা হলে তিনি অবাধে তাঁর কাছে একটি পত্র লেখেন এবং তাতে বনু উমাইয়াদের অবিচার-অত্যাচারের কাহিনী তুলে ধরেন। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয তাঁকে ডেকে পাঠান এবং রাজকীয় তোষাখানার নিলাম কার্যে নিযুক্ত করেন। তিনি প্রকাশ্যে পূর্ববর্তী শাসকদের সামগ্রীসমূহ নিলামে বিক্রি করতেন এবং ডেকে ডেকে বলতেন, "এই সব মালপত্র জোরজুলুমে অর্জিত হয়েছে।"

তখনো ইসলামের প্রাচীন সরলতা অনেকটা বিদ্যমান ছিল। এতদসত্ত্বেও বিলাসিতার সামগ্রী এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, সেই রাজকীয় তোষাখানায় পশমের ত্রিশ হাজার মোজা বিদ্যমান ছিল। গায়লান লোকদের কাছে প্রকাশ্যে বলতেন, "ভাইসব! জুলুমের সীমা আঁচ করুন। জনসাধারণ উপবাস করতো, আর আমাদের শাসকগণ তাঁদের তোষাখানায় ত্রিশ হাজার জোড়া মোজা মজুদ রাখতেন।" ওমর ইবনে আবদুল আযীয ১০১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। অতঃপর হিশাম ইবনে আবদুল মালেক সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি গায়লানের কার্যকলাপ স্বচক্ষে দেখেছিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করা মাত্রই তিনি গায়লানকে ডেকে পাঠান এবং বিদ্রোহের অভিযোগে তাঁর হাত পা কেটে ফেলেন। তথাপি তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়নি। শেষ পর্যন্ত তাঁকে এই অজুহাতেই প্রাণে বধ করা হয়।

এ সময় জাহাম ইবনে সাফ্ওয়ান্ জন্ম গ্রহণ করেন। তিনিও সত্যাগ্রহ আন্দোলনের দায়ে নিহত হন। কিন্তু এ রক্ত বৃথা যায়নি। ন্যায়বিচার এবং সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রসারিত এবং শক্তিশালী হয়ে উঠলো। একটি বিরাট দল সত্য এবং ন্যায়বিচারকে ইসলামের মৌলিক নীতিরূপে বরণ করে অগ্রসর হলেন। এই দলই শেষ পর্যন্ত 'মুতাযিলা' নামে অভিহিত হয়। মুতাযিলা সম্প্রদায় তাঁদের পাঁচটি মৌলনীতির মধ্যে দুটি নিয়েই যাত্রা শুরু করেন। সে দুটি হলো ন্যায় বিচার ও সত্যাদেশ।

এই সম্প্রদায় ক্রমাগত প্রসার লাভ করতে থাকে। ১২৫ হিজরীতে ওলীদ সিংহাসনে আরোহণ করলে এ সম্প্রদায়ের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে লক্ষের কোঠায় পৌঁছে। এমনকি বনু উমাইয়া বংশীয় এযীদ ইবনে ওলীদও এ মতবাদ গ্রহণ করেন। ওলীদ সিংহাসনে আরোহণ করা মাত্রই বিলাসিতায় লিপ্ত হন এবং প্রকাশ্যে মদ্যপান ও আমোদ-প্রমোদ আরম্ভ করেন। এই পরিস্থিতি দেখে এযীদ সত্যাদেশের নীতি নিয়ে বিদ্রোহের পতাকা তুলে ধরেন। হাজার হাজার মুতাযিলা তাঁকে অনুসরণ করে। ওলীদ বন্দী হয়ে নিহত হন। তাঁর মৃত্যুর পর এযীদ খলীফা হন। এ দিনই সর্ব প্রথম মুতাযিলা-মতবাদ রাজকীয় সমর্থন লাভ করে। প্রসঙ্গত একথা স্মর্তব্য যে, ওলীদের বিরুদ্ধে এযীদ যখন বিদ্রোহ করেছিলেন, সেই সময় তাঁর সমর্থকদের মধ্যে আমর ইবনে ওবাইদ নামক এক ব্যক্তি ছিলেন, যিনি পরবর্তীকালে মতাযিলা-মতবাদের একজন বিশিষ্ট ইমামরূপে পরিগণিত হন।

## বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উৎপত্তি

অঙ্কুরে প্রশাসনিক প্রয়োজনেই 'জবর ও কদর' (মানুষের অক্ষমতা ও সক্ষমতা)-এর প্রশ্নটি সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু যখন একবার কোন কারণে চিন্তাধারায় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, তা আপনা আপনিই বেড়ে চলে। বনু উমাইয়াদের যুগ অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই 'খালক-ই কুরআন' অর্থাৎ কুরআনকে চিরন্তন না বলে অভিনব এবং নশ্বর বলা, 'তানযীহ' অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে মানবিক রূপের ঊর্ধ্বে মনে করা, 'তাশবীহ' অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে মানবিক রূপের সাথে তুলনা করা, আল্লাহ্‌র গুণাবলীকে তাঁর সত্তার অন্তর্ভুক্ত বা বহির্ভূত মনে করা ইত্যাদি বিতর্কমূলক বিষয়াদি মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। যার মুখ থেকে যে কথা বের হতো, সেটাই একটা মতবাদে পরিণত হতো। এভাবে অল্প সময়ের মধ্যেই বহু সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। 'মিলাল ও নিহাল' এবং আকাইদের অন্যান্য গ্রন্থে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের পৃথক পৃথক বিবরণ এবং ধর্মীয় বিশ্বাস লিখিত রয়েছে। এখানে তার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া সম্ভব নয়।

এ সম্পর্কে যে কথাগুলো বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, তা হচ্ছে :

১। মৌলিক পার্থক্যের দিক থেকে এসব সম্প্রদায়ের সংখ্যা কত?

২। এই পার্থক্যসমূহে কতটুকু বৈপরীত্য রয়েছে এবং এসব বিভিন্ন মতবাদের সঙ্গে আসল ইসলামের সম্পর্ক কতটুকু?

## মুসলিম সম্প্রদায়ের সংখ্যা মূলতঃ অল্প

'মুহাক্কিকীন' (গবেষকগণ) সমর্থন করেছেন যে, আপাতদৃষ্টিতে মুসলিম সম্প্রদায়ের সংখ্যা অনেক বেশী বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। মূলতঃ এসব সম্প্রদায়ের সংখ্যা খুবই অল্প। প্রত্যেকটি দল থেকেই কয়েকটি উপদলের সৃষ্টি হয়েছে। 'শরহে মাওয়াকিফ' গ্রন্থানুযায়ী মুসলিম সম্প্রদায়ের সংখ্যা মুলত ৮টি—শিয়া, সুন্নী, খারিজী, মুরজিয়া, নাজারিয়া, মুতাযিলা, জব্রিয়া ও মুশাব্বিহা।

আল্লামা মাক্রিযী 'তারীখে মিস্র' নামক গ্রন্থে বলেন, মুসলিম সম্প্রদায়ের সংখ্যা আরো কম। তাঁর মতে, এর সংখ্যা হলো মাত্র পাঁচটিঃ শিয়া, সুন্নী, মুতাযিলা, খারিজী এবং মুরজিয়া।

## বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উৎপত্তির চারটি মৌলিক কারণ

আল্লামা শহরিস্তানী খুব সূক্ষ্মভাবে বিষয়টি পর্যালোচনা করেন এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উৎপত্তির ৪টি মৌলিক কারণ নির্ধারণ করেনঃ

১। আল্লাহ্র গুণাবলী আছে কি না? যদি থাকে, তবে সত্তার সাথে তার সম্পর্ক কি?

২। জব্র ও কদ্র অর্থাৎ মানুষ অক্ষম, না সক্ষম?

৩। বিশ্বাস ও কর্মের সম্পর্ক।

৪। যুক্তি এবং ঐশী বাণীর সম্পর্ক।

### প্রথম কারণ

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উৎপত্তির প্রথম মৌলিক কারণ হলো—কুরআন মজীদে আল্লাহ্ সম্পর্কে এমন সব শব্দ রয়েছে, যাতে আপাতদৃষ্টিতে তাঁর আকৃতি-প্রকৃতি প্রতীয়মান হয়। যেমন আরশের উপর তাঁর অবস্থান করা, কিয়ামতের দিন ফেরেশতাদের সম্মুখে তাঁর উপস্থিত হওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি—এসব ক্ষেত্রে মৌলিক অর্থ গ্রহণ করা হবে, না ভাবার্থ—এ প্রশ্নটি দুটি দলের সৃষ্টি করে। 'মুহাদ্দিসীন' এবং 'আশয়ারিয়া' মৌলিক অর্থ গ্রহণ করেন। এঁদের মধ্য থেকেই আবার ক্রমাগত 'মুজাস্সিমা' ও 'মুশাব্বিহা' নামক দুটি দল জন্ম লাভ করে।

এঁরা আল্লাহ্‌র হাত পা ইত্যাদি আছে বলে বিশ্বাস করেন। ভাবার্থ গ্রহণ করেন মুতাযিলা সম্প্রদায়। এঁদের দ্বিতীয় নাম—আল্লাহ্‌র স্বতন্ত্র গুণাবলী অস্বীকারকারী।

বিষয়টির আরো একটি বিশ্লেষণ আছে। তা হলো—আল্লাহ্‌র গুণাবলীকে যদি চিরন্তন বলে মেনে নেয়া হয়, তবে তাঁর একাধিক চিরন্তন অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয়। আর সেগুলোকে যদি নশ্বর এবং অভিনব বলে পরিগণিত করা হয়, তবে আল্লাহ্‌র অস্থায়িত্ব প্রমাণিত হয়।

প্রথম সমস্যাটি এড়ানোর জন্য মুতাযিলা এ মত গ্রহণ করেন যে, আল্লার স্বতন্ত্র গুণাবলী নেই। আমাদের মতানুসারে, আল্লাহ্‌র গুণাবলী দিয়ে যে সব কাজ সম্পন্ন হয়, তাঁদের নিকট তাঁর সত্তাই সেই ক্রিয়া সম্পন্ন করে। 'মুহাদ্দিসীন' মনে করেন, এটা আল্লাহ্‌র গুণাবলী অস্বীকার করারই শামিল। তাই তাঁরা আল্লাহ্‌র স্বতন্ত্র গুণাবলী স্বীকার করতে প্রস্তুত।

## দ্বিতীয় কারণ

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উৎপত্তির দ্বিতীয় কারণ হলো—মানুষের কর্মের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, কোন বস্তুই তার ক্ষমতাধীন নয়। এমনকি আমাদের ইচ্ছা-অভিপ্রায়ও আমাদের আওতাধীন নয়। কিন্তু সমস্যা হলো, আমরা যদি আপন ক্রিয়াকর্মে অক্ষম হই, তবে শাস্তি ও প্রতিদান, যা হচ্ছে ধর্মের প্রাণ, তার বুনিয়াদই উৎপাটিত হয়।

কুরআন মজীদে উভয় প্রকারের অর্থবোধক আয়াত রয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, মানুষ যা কিছু করে, তা আল্লাহ্‌ই করান। যেমন, রসূলকে সম্বোধন করে আল্লাহ্‌ বলেন, "আপনি বলুন, সব কিছু আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে।" (আল কুরআন)। আবার কোন কোন আয়াতে বোঝা যায় যে, মানুষ স্বয়ং আপন কর্মের জন্য দায়ী। যেমন' "যে বিপদ তোমার উপর আপতিত হয়, তা তোমারই কর্মফল" (আল কুরআন)।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামে দু'টি মতবাদের সৃষ্টি হয়। যাঁরা প্রত্যক্ষ পন্থা অবলম্বন করেন, তাঁরা সোজাসুজি মানুষের অক্ষমতা

মেনে নেন এবং 'জাব্‌রিয়া নামে অভিহিত হন। আর যাঁরা মানুষের ক্ষমতা বোধক আয়াত নিয়ে ইতস্তত করতেন, তারা অর্জন এবং ইচ্ছার ওপর রাখলেন। অর্থাৎ মানুষ অর্জন করে এবং আল্লাহ্ সৃষ্টি করেন। এই মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন আবুল হাসান আশয়ারী। এর পূর্বে কেউ এই মধ্য পন্থার কথা উচ্চারণ করেনি। পক্ষান্তরে, মুতাযিলা মত প্রকাশ করেন যে, মানুষ আপন ক্রিয়া কর্মে সম্পূর্ণ স্বাধীন। তবে এই ক্ষমতাটুকু আল্লাহ্‌রই দেয়া। তাই এ মতবাদ আল্লাহ্‌র ক্ষমতায় কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না।

## তৃতীয় কারণ

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উৎপত্তির তৃতীয় কারণ হলো, মানুষের 'আমল' অর্থাৎ কর্ম তার ঈমানের অন্তর্ভুক্ত কি-না—এ প্রশ্নটি। অনেক হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রসূল করীম শালীনতা এবং আরো অন্যান্য বিষয়কে ঈমানের অঙ্গরূপে গণ্য করেছেন। এজন্য 'মুহাদ্দিসীন' মনে করেছেন যে, 'আমল' ঈমানের অঙ্গ। কিন্তু 'আহলে নযর' অর্থাৎ অন্তর্বাদিগণ এ মতবাদ সমর্থন করেন নি। তাঁরা আকীদা এবং আমলের মধ্যে পার্থক্য করেন। মুহাদ্দিসীন 'আহলে নযর'দের 'মুরজিয়া'রূপে অভিহিত করেন। ইমাম আবু হানীফা ছিলেন 'আহলে নযর'দের পথিকৃ। তাই অনেক মুহাদ্দিস তাঁকে মুরজিয়া-রূপেই আখ্যায়িত করেন।

## চতুর্থ কারণ

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উৎপত্তির চতুর্থ কারণকেই মৌলিক কারণ বলা যায়। এখানেই 'আহলে যাহির' (বহির্বাদী) এবং 'আহলে নযর' (অন্তর্বাদী) এই দুই সম্প্রদায়ের ভাবধারার পরিসীমা পৃথক পৃথক হয়ে পড়ে। এই মতদ্বৈধতার প্রধান কারণ হলো ঐশী বাণী ও যুক্তির মধ্যে প্রাধান্য কার এবং ঐশীবাণী ও যুক্তি প্রয়োগের সীমারেখা কতটুকু এ বিতর্কমূলক বিষয়টি। আশ্‌য়ারিয়া ঐশী বাণীর প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। পক্ষান্তরে, মুতাযিলা এবং আরো অনেকে গুরুত্ব আরোপ করেন যুক্তিবাদের উপর।

এই কারণের ভিত্তিতে যেসব ধর্মীয় মতবাদ গড়ে উঠেছে, তার কয়েকটি অপর পৃষ্ঠায় দেওয়া হলো ঃ

**আশায়েরার মতে :**

১। কোন বস্তু মূলত ভাল বা মন্দ কিছুই নয়। শরীয়ত-বিধাতা (আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল) যে বস্তুকে ভাল বলেন, সেটাই ভাল বলে অভিহিত। আর যে বস্তুকে তাঁরা মন্দ বলে অভিহিত করেন, সেটাই মন্দ বলে পরিগণিত।

২। আল্লাহ্ অবাস্তব বস্তুর প্রতি আদেশ দিতে পারেন এবং দিয়েও থাকেন।

৩। ন্যায় বিচার করা আল্লাহ্র জন্য অবশ্য কর্তব্য নয়।

৪। আল্লাহ্ ইবাদতের প্রতিদানে শাস্তি এবং গুনাহের প্রত্যর্পণে পুরস্কারও দিতে পারেন এবং এটা তাঁর পক্ষে অন্যায় কিছুই নয়।

**মুতাযিলার মতে :**

১। প্রত্যেক বস্তু মূলেই ভাল বা মন্দ হয়ে থাকে। শরীয়ত-বিধাতা সে বস্তুকেই ভাল বলেন, যা মূলত ভাল। আবার সে বস্তুকেই মন্দ বলে অভিহিত করেন, যা বস্তুত মন্দ।

২। আল্লাহ্ কোন অবাস্তব বস্তুর প্রতি আদেশ দিতে পারেন না।

৩। অবশ্য কর্তব্য।

৪। আল্লাহ্ এরূপ কখনো করতে পারেন না। এরূপ করলে তা হবে জুলুম এবং অবিচার।

## আকাইদের মত বিরোধিতায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাড়াবাড়ি

এসব মতবিরোধ বিস্ময়কর কিছুই নয়। কেননা, এসব বিষয়ের পেছনে যে কারণসমূহ বিদ্যমান ছিল, তাতে মতবিরোধ সৃষ্টি হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এসব মত-বিরোধিতায় একদল অপর দলকে কাফেররূপে আখ্যায়িত করতেও ইতঃস্তত করেনি। যেমন, আল্লার বাণী চিরন্তন, না দৈবঘটিত—এটা ছিল অন্যতম বিতর্কমূলক বিষয়। মুতাযিলা বলেন, আল্লার বাণী তাঁর চিরন্তন গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত। তাই তাঁর বাণীও চিরন্তন। কিন্তু কুরআনের যে শব্দগুলো রসূল করীমের উপর অবতীর্ণ হয়, তা ছিল নৈমিত্তিক এবং অভিনব। পক্ষান্তরে, মুহাদ্দিসীনের অভিমত ছিল, আল্লাহ্র বাণী যে কোন অবস্থায়ই চিরন্তন। সূক্ষ্মভাবে দেখতে

গেলে উভয়ের সারমর্ম ছিল এক এবং অভিন্ন। কিন্তু উভয় দল বিষয়টিকে ঈমান এবং কুফ্‌রের মাপকাঠিরূপে দাঁড় করিয়েছেন।

ইমাম বায়হাকী তাঁর 'কিতাবুল আস্‌মা-অস্‌-সিফাত' নামক গ্রন্থে এ বিষয়টি একটি ভিন্ন শিরোনামায় বর্ণনা করেন। আমরা সে গ্রন্থ থেকে কয়েকজন মুহাদ্দিসের অভিমত নিম্নে পেশ করছি ঃ

অকী বিন-আল-জার্‌রাহ ঃ

যে ব্যক্তি কুরআনকে অশাশ্বত এবং নশ্বর বলে ধারণা করে, সে কাফের।

এযীদ বিন হারাওয়ান ঃ

যে ব্যক্তি বলে, আল্লার বাণী অশাশ্বত এবং অভিনব, আল্লার কসম, সে নাস্তিক। ইমাম শাফেয়ীর জনৈক শিষ্য বলেন ঃ

যে ব্যক্তি বলে, কুরআন অনিত্য এবং নৈমিত্তিক, সে কাফের। ইমাম বোখারী ঃ

আমি ইহুদী, খ্রীস্টান, অগ্নিপূজক সকলের ধর্মীয় গ্রন্থ দেখেছি, কিন্তু জাহ্‌মিয়ার মত এত অধিক অজ্ঞ কাফের আমি আর কখনও দেখিনি। আমি সেই ব্যক্তিকে অজ্ঞ বলে মনে করি, যে জাহমিয়াকে কাফের মনে করে না।

আবদুর রহমান বিন মাহ্‌দী ঃ

যদি আমার হাতে তলোয়ার থাকে, আর প্রকাশ্যে সেতুর উপর কাউকে বলতে শুনি—কুরআন অশাশ্বত ও অভিনব, তবে তার ঘাড় ভেঙ্গে দেবো।

কোন কোন মুহাদ্দিস, এঁদের মধ্যে ইমাম বোখারীও রয়েছেন, এ বিষয়ে কিছুটা পার্থক্য করেন। তাঁরা বলেন, কুরআন মজীদের শব্দাবলীর যে উচ্চারণ করা হয়, তা নৈমিত্তিক এবং অভিনব। কিন্তু জমহুর মুহাদ্দিসীন তাঁদেরও ভীষণ বিরোধিতা করেন। যুহ্‌লী ছিলেন ইমাম বোখারীর শিক্ষক। সহীহ্‌ বোখারীর অনেক হাদীস তাঁর নিকট থেকে গৃহীত হয়। ইমাম বোখারীকে এ মত প্রকাশ করতে শুনে তিনি বললেন, যে ব্যক্তি কুরআনের উচ্চারণকে অভিনব মনে করে, সে যেন আমার আসরে না আসে। হাফেয ইবনে হাজার এ ঘটনাটি 'শরহে বোখারী'তে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। ইবনে শাদ্‌দাদ একস্থানে লিখেছেন ঃ আমি যে কুরআন উচ্চারণ করি, তা অভিনব'—

এ লেখাটি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের সামনে পাঠ করা হলে তিনি তা কেটে দেন এবং বলেন ঃ যে কোন অবস্থায়ই কুরআন চিরন্তন এবং অবিনশ্বর। আবু তালিব একবার বলেছিলেন ঃ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল কুরআনের উচ্চারণকে অভিনব এবং নৈমিত্তিক বলে মনে করেন। একথা ইমাম আহমদ ইবনে হামবলের কর্ণগোচর হলে তিনি রাগে কম্পিত হয়ে উঠেন এবং আবু তালিবকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

এতো ছিল একদিকের হালহকিকত। অন্যদিকে ছিলেন মুতাযিলা সম্প্রদায়। তাঁরা মনে করতেন, কুরআনের শব্দ ও উচ্চারণকে চিরন্তন মনে করা 'কুফরী' কাজ। মামুনুর রশীদের মত ন্যায়বান বাদশাও কুরআনকে চিরন্তন বলার দায়ে সে সময়কার বড় বড় মুহাদ্দিসদের ভীষণ শাস্তি দেন এবং আদেশ দেন যে, এরূপ মতবাদের লোকেরা যদি তওবা না করে, তবে তাদের হত্যা করা হবে।

কেবল এ বিষয়টি নয়। এরূপ শত শত বিতর্কমূলক ব্যাপার ছিল। সব ক্ষেত্রেই উভয় দল ভীষণ বাড়াবাড়ি করেন।

ইমাম আবু ইউসুফ ছিলেন ইমাম আবু হানীফার শিষ্য। কাযী শরীক তাঁর সাক্ষ্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। কারণ তিনি নামাযকে ঈমানের অঙ্গ বলে মনে করতেন না। ইমাম আবু হানীফা 'আমল' অর্থাৎ কর্মকে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করতেন না। তাই অনেক মুহাদ্দিস তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন।

অনেকদিন পর্যন্ত এসব ভুল ধারণা প্রচলিত ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। যদিও পুরনো ধ্যান ধারণা সমূলে যায়নি, তথাপি আজ পাঁচ ছয় শ' বছর পর্যন্ত এটা সর্ব সমর্থিত মতে পরিণত হয়েছে যে, আকাইদের (ধর্মীয় বিশ্বাস) ব্যাপারে এক কেবলা অবলম্বীদের (যাতে বহু সম্প্রদায় রয়েছে) মধ্যে কেউ কাউকে কাফের-রূপে আখ্যায়িত করবে না। এমন এক সময়ও ছিল, যখন ইবনে হিব্বানের ন্যায় হাদীসের বড় ইমামকেও আকাইদের ব্যাপারে দ্বীপান্তরিত হতে হয়েছিল। একমাত্র ওজুহাত ছিল, তিনি বলেছিলেন যে, আল্লাহ সীমাবদ্ধ নন বরং সর্বত্র বিরাজমান। কিন্তু আজ বিভিন্ন বিষয়ের বড় বড় ইমামগণ সেই শব্দ দিয়েই আল্লাহর মহত্ত্ব বর্ণনা করছেন। প্রাচীন মুহাদ্দিসগণের সময় কেউ যদি বলতো—আল্লাহ সব জায়গায়

বিরাজমান, তবে তাঁকে জাহমিয়া মতাবলম্বী এবং কাফের সম মনে করা হতো। ইবনুল কাইয়েম 'ইজতিমায়ুল জুয়ুশিল ইসলামিয়া' নামক গ্রন্থে এসব মুহাদ্দিসের মতামত তাঁদের গ্রন্থাবলী থেকে উদ্ধৃত করেন। কিন্তু আজ আর সে ধারণা নেই। এখন বহুদিন থেকেই প্রায় সকল মুসলমানই আল্লাহ্‌র বিশ্বজনীন অবস্থানের মত্ পোষণ করেন।

মুহাদ্দিসীনের নিকট মুরজিয়াপন্থীরা ছিলেন একটি পথ ভ্রষ্ট সম্প্রদায়। তাঁদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য ছিল না। কিন্তু কালক্রমে আল্লামা যাহ্‌বীর ন্যায় লোককেও তাঁর মীযানুল ই'তেদাল' নামক গ্রন্থে নিম্নরূপ অভিমত প্রকাশ করতে হয়ঃ

আমার মতে, মুরজিয়া মতবাদ বড় বড় উলামারই মতবাদ। এ মতাবলম্বীদের উপর হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়।

মুহাদ্দিস খাত্‌তাবী একজন প্রখ্যাত লোক। তাঁর 'মায়ালিমুস্‌সুনান' হাদীস শাস্ত্রের এক অপূর্ব গ্রন্থ। ইমাম বায়হাকী 'কিতাবুল আসমা ওস্‌সিফাত' নামক গ্রন্থে তাঁর অনেক মতামতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বিভিন্ন মতবাদ ও মতভেদ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেনঃ

যে সব বেদাতপন্থী ঐশীবাণীর ভাবার্থ করেন এবং ভুলের শিকারে পরিণত হন, তাঁরা কাফের নন। তাঁদের স্বাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য যতক্ষণ না তাঁদের মধ্যে থেকে খারিজী এবং রাফিযীরা সাহাবাদের কাফের বলেন বা কাদ্‌রিয়াগণ আপন দলের লোক ছাড়া সকল মুসলমানকে কাফের বলেন।

ইমাম গাযালী 'ইম্‌লা-ফি-মুশ্‌কিলাতিল ইহ্‌ইয়া' নামক গ্রন্থে এবং ইমাম রাযী সূরা-এ-বাকারার প্রথম রুকুস্থ আয়াত—"ইন্নাল্লাযীনা কাফারু" এর ব্যাখ্যায় এ বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন এবং প্রমাণ করেন যে, এসব পরস্পর বিরোধী মতবাদের উপর নির্ভর করে কোন ব্যক্তিকে মুসলমান বা কাফের বলে আখ্যায়িত করা যায় না।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা তাকিউদ্দীন লিখেছেনঃ

**আশয়ারিয়া এবং মুতাযিলা উভয়ই সমগোত্রীয়। এঁরাই মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ইসলামী দর্শনবেত্তা। তবে এঁদের মধ্যে আশয়ারিয়া অধিকতর ন্যায়ের পথে রয়েছেন।**

অধিকাংশ মুতাযিলাপন্থী ছিলেন হানাফী মতাবলম্বী। এজন্যই 'তাবাকাতুল হানাফিয়া' নামক গ্রন্থে তাঁদের বিবরণ স্থান লাভ করেছে। তাতে যেভাবে মর্যাদা সহকারে হানাফী উলামার আলোচনা করা হয়, ঠিক তেমনি মুতাযিলাপন্থীদেরও সশ্রদ্ধ বিবরণ পেশ করা হয়। যেমন মুতাযিলা মতাবলম্বী হোসাইন ইবনে আলী সম্পর্কে এ মন্তব্য করা হয় যে, ফিকাহ এবং কালামে তাঁর মত দ্বিতীয় আর নেই। যমখশরী সম্পর্কে এমত প্রকাশ করা হয় যে, তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান হানাফী।

ইমাম রাযী 'সূরা-এ-আন্‌য়াম' এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ

আমার শ্রদ্ধেয় পিতা শেখ আল-কাসিম আনসারীর মন্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, আহলে-সুন্নাত ও জামা'ত'-এর লক্ষ্য হলো আল্লাহ্‌র শক্তির আধিক্য প্রকাশ করা, আর মুতাযিলার উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্‌র মহিমা বর্ণনা এবং তাঁকে নির্দোষ প্রমাণিত করা। তাই খতিয়ে দেখলে বুঝতে পারা যায় যে, তাঁরা উভয়ই আল্লাহর মহত্ত্ব এবং পবিত্রতার সমর্থক। তবে কথা হলো এই যে, এঁদের মধ্যে কেউ হয়তো ভুল করেছেন, আর কেউ হয়তো ঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

পরবর্তী মুহাদ্দিসীন পর্যন্ত যেতে হবে না। ভালরূপে অনুসন্ধান করলে পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসীনের মধ্যেও এমন অনেক লোক দেখতে পাওয়া যাবে, যাঁরা ছিলেন স্বাধীনমতাবলম্বী। অথচ তাদের অনেককেই কাদ্‌রিয়া বা মুতাযিলারূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

সওর ইবনে যাইদ, সওর ইবনে ইয়াযীদ, হাস্‌সান ইবনে আতিয়াহ, হাসান ইবনে যাক্‌ওয়ান, দাউদ ইবনে হাসীন, যাকারিয়া ইবনে ইসহাক, সালীম ইবনে উজ্‌লান, সালাম ইবনে মিসকীন, সাইফ ইবনে সুলাইমান মক্কী, শিব্‌ল ইবনে ইবাদ মক্কী, শরীক ইবনে আবদুল্লাহ, আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আমর, আবদুল্লা ইবনে আবী লবীদ, আবদুল আলা ইবনে আবদুল আলা, আবদুল ওয়ারিস ইবনে সাঈদ তন্নুরী, আত্‌তার ইবনে আবি মাইমুন, ওমর ইবনে আবি যাইদা, ইমরান ইবনে মুসলিম কাইসর, ওমাইর ইবনে হানী আদ্‌দামিশকী, আওফ্‌ আল আরাবী বসরী, মুহম্মদ ইবনে সওয়ার আল বসরী, হারাওয়ান ইবনে মুসা আল আওয়ার, হিশাম ইবনে আবদুল্লাহ্‌ দাস্তওয়ানী, ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে হামযা আলহায্‌রামী—এঁদের সবাইকে

হাফেয ইবনে হাজার 'ফাতহুলবারী' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় কাদরিদা-রূপে অভিহিত করেন।

আল্লামা যাহ্বী 'তাযকিরাতুল হুফ্ফায্' নামক চারখণ্ড বিশিষ্ট একটি হাদীস গ্রন্থ রচনা করেন। এটি সদ্য প্রকাশিত হয়েছে। এতে তিনি সে সব হাফেয-এ-হাদীসের (হাদীস কণ্ঠস্থকারী) বিবরণ লিখেছেন, যাঁরা হাদীস শাস্ত্রের স্তম্ভরূপে পরিগণিত এবং যাঁদের উপর নির্ভর করে এ শাস্ত্রের আলোচনা এবং পর্যালোচনা। এ গ্রন্থে তিনি অনেক মুতাযিলাপন্থী উলামার নাম পেশ করেন। তন্মধ্যে কয়েকজন প্রখ্যাত ব্যক্তির নাম হচ্ছেঃ আতা ইবনে ইয়াসার, সাইদ ইবনে আবি আরুবাহ, কাতাদাহ ইবনে ওসামা, হিশাম দাস্তওয়াই, সাইদ ইবনে ইবরাহীম, মুহম্মদ ইসহাক, ইমামুল মাগাযী এবং সামান। এঁদের মধ্যে আতা ইবনে ইয়াসার, কাতাদাহ, হিশাম এবং সাইদ সম্পর্কে ইমাম আহমদ হামবল এবং হাদীস শাস্ত্রের অন্যান্য ইমামগণ পরিষ্কার ভাষায় এই মন্তব্য করেছেনঃ হাদীস শাস্ত্রে তাঁদের সমকক্ষ কেউ ছিল না। তাঁরা ছিলেন তখনকার ইমাম অর্থাৎ পথ প্রদর্শক।

# প্রথম যুগ

# বুদ্ধিভিত্তিক ইলমে কালাম

এই ইলমে কালাম দর্শন শাস্ত্রের বিকল্পস্বরূপ জন্ম লাভ করে। এর ইতিহাস লেখাই আমার উদ্দেশ্য।

আকাইদে (ধর্মীয় বিশ্বাসে) কিভাবে মতদ্বৈধতার সৃষ্টি হলো, তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। বনু উমাইয়াদের সময় নাগাত ধর্মীয় বিতর্ক মুসলমানদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু আব্বাসীদের সময় এ সীমা ছাড়িয়ে যায়। এ সময় শিক্ষা খুবই প্রসার লাভ করে। অগ্নিপূজক, ইহুদী, খ্রীস্টান এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে আরবী জ্ঞানবিজ্ঞান শেখার এবং মুসলমানদের ধর্মীয় ভাবধারা ও ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে অবগতি হাসিলের সুযোগ লাভ করে। বনু উমাইয়ার সময় ধর্মীয় মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ছিল না। কিন্তু আব্বাসিগণ সেই অনুমতি প্রদান করেন। যে কেউ ইচ্ছামত মতামত প্রকাশ করতে পারতো। তাই অন্যান্য জাতিও ইসলামী আকাইদ সম্পর্কে পর্যালোচনা ও সমালোচনা করার সুযোগ পায়।

তদুপরি খলিফা মনসুর দুনিয়ার যে কোন ভাষায় রচিত জ্ঞান-গর্ভ ও ধর্মীয় গ্রন্থাবলী আরবী ভাষায় অনূদিত করেন। সেগুলো পাঠ করে শত শত মুসলমানের ধর্মীয় বিশ্বাস শিথিল হয়ে পড়ে। ঐতিহাসিক মাসউদী কাহির বিল্লার বিবরণে বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আল মুকাফ্‌ফা এবং অন্যান্য লোকেরা ফার্সী ও পহলবী ভাষা থেকে অগ্নিপূজকদের অধিনায়ক—মানী, ইবনে দাইসান, মরকিউন রচিত গ্রন্থাবলীর যে সব অনুবাদ করেন এবং সেগুলোর সমর্থনে মুসলমানদের মধ্য থেকে ইবনে আবিল আরজা, হাম্‌মাদ, ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে যিয়াদ, মুতি ইবনে ইয়াস যে সব গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাতে লোকদের মধ্যে নাস্তিকতা ও ধর্মহীনতা বিস্তার লাভ করে।

## ইলমে কালাম সৃষ্টির কারণ

প্রয়োজনের তাগিদে মুসলিম ওলামাই 'নাহ্ব' (বাক্য বিন্যাস) ব্যাকরণ, 'লুগাত' (অভিধান), তফসির (কুরআনের ব্যাখ্যা), 'বালাগত' (বাক্যালংকার বিদ্যা) এবং আরো অন্যান্য বিষয় প্রণয়ন এবং উদ্ভাবন করেন। ঠিক তেমনি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তাঁরা ইলমে কালামও একদিন আবিষ্কার করতেন। কিন্তু তাঁদের পক্ষ থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করার পূর্বেই প্রশাসনিক মহল থেকে এ শাস্ত্র প্রণয়ন করার দাবী উত্থাপিত হয়। এটা ছিল ইলমে কালামের পক্ষে একটি সৌভাগ্যের বিষয়।

### খলিফা মাহদীর আদেশে ইলমে কালাম বিষয়ক গ্রন্থ রচনা

হারুনুর রশিদের পিতা খলিফা মাহদী ১৫৮ হিজরীতে খেলাফতের কর্মভার গ্রহণ করেন। তিনি মুসলিম আলিমদের আদেশ দিলেন ঃ ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আনীত হচ্ছে, তদুত্তরে গ্রন্থাবলী রচনা করা হোক। এ সত্ত্বেও তাঁর সময়ে বিষয়টি 'ইলমে কালাম' নামে অভিহিত হয়নি। মামুনুর রশিদের আমলে মুতাযিলিগণ দর্শন শাস্ত্রে দক্ষতা অর্জন করেন এবং দার্শনিক মনোবৃত্তি নিয়ে এ বিষয়ে গ্রন্থাদি প্রণয়ন করেন। তাঁরাই বিষয়টিকে 'ইলমে কালাম' নামে অভিহিত করেন।

## ইলমে কালামরূপে নামকরণ

ইলমে কালামের নামকরণ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লিকান মোহাম্মদ আবুল হোসাইন মুতাযিলীর আলোচনায় সাম্য়ানীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, আকাইদ বিষয়ক মতভেদ সর্বপ্রথম আরম্ভ হয় আল্লার 'কালাম' (বাণী) নিয়ে। তাই ইলমে আকাইদ (ধর্মীয় বিশ্বাস তত্ত্ব)-কে ইলমে কালামরূপে অভিহিত করা হয়। কিন্তু এটা যথার্থ নয়। প্রকৃত পক্ষে, আল্লার কালাম নিয়ে প্রথমতঃ মতভেদের উদ্ভব হয়নি। বনু উমাইয়ার সময়েও এ বিষয়টি 'কালাম' রূপে অভিহিত হয়নি।

আল্লামা শহ্‌রিস্তানী 'মিলাল ও নিহাল' নামক গ্রন্থে বলেন ঃ "এ নামকরণের দু'টি কারণ হতে পারে। আকাইদ বিষয়ক যত মতানৈক্যের

সৃষ্টি হয়, তন্মধ্যে আল্লার কালাম নিয়ে যে মতানৈক্য হয়, তা ছিল সবচাইতে বেশী তীব্র এবং যুদ্ধংদেহী। হয়তো এ কারণেই ইলমে আকাইদের নামকরণ করা হয় ইলমে কালাম রূপে। দ্বিতীয়তঃ ইলমে কালাম রচিত হয় দর্শনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। দর্শনের একটি শাখার নাম ছিল 'মানতিক' (যুক্তি বিজ্ঞান)। 'মানতিক' এবং 'কালাম' একই অর্থবোধক। হয়তো এ কারণেই ইলমে আকাইদকে ইলমে কালামরূপে অভিহিত করা হয়।" এ নামকরণের এটাই যথার্থ কারণ।

## ইলমে কালামের বিরোধিতা

ইলমে কালাম সৃষ্টির প্রারম্ভেই মুহাদ্দিসীন (হাদীস পন্থী) এবং আরবাবে যাহির (বহির্বাদী) এর তীব্র বিরোধিতা শুরু করেন। ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমদ হামবল, সুফিয়ান সওরী এবং অধিকাংশ মুহাদ্দিসীন বিষয়টিকে 'হারাম' বলে বর্ণনা করেন। ইমাম গাযালী 'ইহ্ইয়াউল উলুম' নামক গ্রন্থে আকাইদের আলোচনায় বলেন ঃ

শাফেঈ, মালেক, আহমদ ইবনে হামবল, সুফিয়ান এবং পূর্ববর্তী সমস্ত হাদীসবেত্তাগণ এ বিষয়টিকে (ইলমে কালাম) হারাম বলে বর্ণনা করেন।

ইমাম শাফেঈ বলতেন, কালাম পন্থীদের কশাঘাত করা উচিত। ইমাম আহমদ হামবল বলতেন, কালামপন্থিগণ ধর্মহীন। কথিত আছে, অধিকাংশ মুসলিম ইমাম এ ধরনের অভিমত প্রকাশ করেন। পরবর্তী যুগে এ সব মতামতকে বিস্ময়ের চোখে দেখা হয়। অনেক সময় এসবকে অবিশ্বাস্য বলেও মন্তব্য করা হয়। এই মনোভাব থেকেই ইমাম রাযীকে তাঁর 'তফসিরে কবির' এবং 'মানাকিবুশ শাফেয়ী' নামক গ্রন্থে এসব পরম্পরাগত মতবাদের নতুন ব্যাখ্যা দিতে হয়, এমনকি অস্বীকারও করতে হয়।

বস্তুতঃ এই বিরোধিতা ছিল যুগের সৃষ্টি। ইসলামের প্রাথমিক যুগে অধিকাংশ ওলামা যে কোন একটি বিষয়ে অভিজ্ঞ হতেন। 'নাহ্ব' বিদ ফিক্হ্ জানতেন না। হাদীসের সাথে ফক্হ্দের (ফিক্হ্ বিদ)। বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল না। মুহাদ্দিসীন ছিলেন যুক্তি বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনবগত। ইলমে কালাম প্রণীত হলে তাতে দর্শনের অনেক পরিভাষা প্রবেশ করে। এসব পরিভাষা দেখে মুহাদ্দিসীন

মনে করতেন যে, ইলমে কালাম এবং দর্শন উভয়ই এক এবং অভিন্ন। তাঁরা পূর্ব থেকেই গ্রীক দর্শনকে খারাপ চোখে দেখতেন। তাই ইলমে কালামকেও সেই শ্রেণীতে পরিগণিত করেন। কথিত আছে যে, মুহাদ্দিসগণ বলতেন ঃ তোমরা যদি কাউকে দ্রব্য, গুণ, জড় পদার্থ ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করতে দেখ, তবে মনে করবে যে, সে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট। মুহাদ্দিস ইবনুস্ সাব্‌কীর নিম্নলিখিত ভাষ্য তাঁদের এমনোভাবের সাক্ষ্য বহন করছে ঃ

ইলমে কালাম এবং দর্শন একই বস্তু—এ ধারণা নিয়েই পূর্ববর্তী ইমামগণ তাঁদের গ্রন্থাবলীতে অনেক দর্শন জানা লোকের সমালোচনা করেন। আহমদ ইবনে সালিহ্‌কে দার্শনিক ভাবাপন্ন বলে আখ্যায়িত করা হয়। অথচ তিনি বলতেন ঃ আমি দর্শন মোটেই জানি না। আবু হাতিম রাযী সম্পর্কেও এ ধরনের মন্তব্য করা হয়। অথচ তিনি ছিলেন একজন মুতাকাল্লিম। ইমাম যাহাবীও এমনিভাবে মিযযী সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেছিলেন, তিনি 'মা'কুল' অর্থাৎ যুক্তিবিদ্যা জানেন। প্রকৃতপক্ষে, যাহাবী এবং মিয্‌যীর মধ্যে কেউ যুক্তিবিদ্যার একটি অক্ষরও জানতেন না।

সবচাইতে বড় কথা হলো—ইলমে কালামের জন্য দর্শন এবং পদার্থ বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভের প্রয়োজন ছিল। অথচ মুহাদ্দিসীন ছিলেন দর্শন পাঠের ঘোর বিরোধী।

## বিরোধিতার কারণ

মুহাদ্দিসগণের দর্শনের প্রতি বিরোধিতার সবচাইতে বড় কারণ ছিল এই যে, কালাম পন্থিগণ তাঁদের রচনায় ইসলাম বিরোধীদের মতামত উল্লেখ করে প্রত্যুত্তর দিতেন। মুহাদ্দিসীন ইসলাম বিরোধীদের এই নাস্তিকতামূলক মতামতের উদ্ধৃতিকেও অবৈধ বলে মনে করতেন। ইমাম আহমদ হাম্বলের সময় জারাস্ মোহাসিবী একজন বিখ্যাত আল্লাহ্‌ভক্ত মুহাদ্দিস ছিলেন। মুহাদ্দিসীনও ছিলেন তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। হযরত জুনাইদ বাগদাদী তাঁরই মুরিদ ছিলেন। তিনি শিয়া এবং মুতাযিলীদের বিরুদ্ধে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন বলেই ইমাম আহমদ হাম্বল তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং তাঁর সাথে মেলামেশা ত্যাগ করেন।

বিরোধিতার আরও একটি বড় কারণ ছিল এই যে, যাঁরা ইলমে কালাম চর্চা করতেন, তাঁদের আকীদা মুহাদ্দিসীন-এর আকীদা থেকে

কিছু না কিছু স্বতন্ত্র হওয়া ছিল স্বাভাবিক। নীচে যে হাদীসগুলো দেয়া হলো, কালাম পন্ডিগণ সে ধরনের হাদীসগুলোকে হয়তো অশুদ্ধ মনে করতেন, নয়তো সেগুলোর সঙ্গত ব্যাখ্যা প্রদান করতেন ঃ

(১) হযরত আদম এবং মুসা (আঃ) এর মধ্যে বিতর্ক হয়। (২) আকাশ ফেরেশতাদের ভারে কম্পিত হয়ে উঠে। (৩) আল্লাহ্ কেয়ামতের দিন আপন উরু যখন দোজখের মধ্যে রাখবেন, তখনই তার সান্ত্বনা হবে।

মুহাদ্দিসীন উপরোক্ত হাদীসগুলোকে পূর্ব থেকেই শুদ্ধ বলে বিশ্বাস করতেন। সুতরাং সেগুলোকে অস্বীকার করা বা ভাবার্থে গ্রহণ করাকে তাঁরা রসুলের বাণীর অবমাননা বলে আখ্যায়িত করেন। একদিন হারুনুর রশিদের দরবারে একজন মুহাদ্দিস আদম (আঃ) এবং মুসা (আঃ)-এর হাদীসটি বর্ণনা করেন। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠলেন ঃ হযরত আদম এবং মুসা কি করে একত্রিত হলেন? হারুনুর রশিদ ছিলেন মুহাদ্দিসীনদের মতাবলম্বী। তিনি এ প্রশ্নে ক্ষিপ্ত হয়ে সে ব্যক্তির হত্যার আদেশ দেন। আল্লামা সুয়ূতী 'তারিখুল খোলাফা' নামক গ্রন্থে ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন।

ইলমে কালামের প্রতি 'মুহাদ্দিসীন' এবং 'আরবারে যাহির' যে ভাবে বিরোধিতা করেন, তাতে এ শাস্ত্রটি সম্পূর্ণরূপে মুছে যেতে পারতো। কিন্তু তা হয়নি। কারণ দু'একজন ছাড়া সমস্ত আব্বাসী খলিফা এবং তাঁদের সভাসদেরা এর প্রতি সক্রিয় সমর্থন জ্ঞাপন করেন। এ রাজকীয় সহায়তার ফলে তা বরাবর উন্নতি লাভ করতে থাকে। কেবল আব্বাসীরাই নয়, দায়লমীরাও এর পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এতদসত্ত্বেও বিষয়টি জনপ্রিয়তা লাভে সক্ষম হয়নি।

## ইলমে কালামের প্রতিষ্ঠাতা

শেষ পর্যন্ত ইমাম গাযালী এবং রাযী যখন ইলমে কালামের উন্নতি বিধানের দায়িত্ব আপন স্কন্ধে তুলে নিলেন, তখনই তা জনপ্রিয় হয়ে উঠে। মোট কথা, খলিফা মাহদীর সময় ইলমে কালামের সৃষ্টি হয় এবং যতটুকু জানি, আবুল হোযাইল আল্লাফই এ বিষয়ে সর্বপ্রথম গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর পুরো নাম—মোহাম্মদ ইবনে হোযাইল ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে মাক্হুল। তিনি ১৩১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ

করেন এবং ২৩৫ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। আল্লামা ইবনে খাল্লিকান তাঁর সম্পর্কে বলেন ঃ

তিনি ছিলেন বাগ্মী ও সুতার্কিক। তিনি পাল্টা জওয়াব প্রদানে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। তিনি কালাম বিষয়ক ছোট বড় ৬০টি গ্রন্থ রচনা করেন। এগুলোর মধ্যে তিনি অনেক সূক্ষ্ম বিষয়েও আলোচনা করেন। তাঁর লিখিত গ্রন্থাবলী বহুদিন থেকে দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু অগ্নি-পূজক ও নাস্তিকদের সাথে তিনি যে সব বিতর্ক করেন এবং যে সব বক্তৃতা প্রদান করেন, সেগুলোর কিছু কিছুটা 'শরহে মিলাল-ও-নিহাল' নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে।

## আবুল হোযাইল আল্লাফ

আবু হোযাইলের বিতর্ক আজকালকার ন্যায় শুধুমাত্র বাকপটুতা বা বাগ্মিতা ছিল না। তাঁর বিতর্কের ফলে অনেক নাস্তিক এবং ধর্মবিরোধী আপন ধর্মীয় বিশ্বাস প্রত্যাখ্যান করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন।

ইবনে খাল্লিকান লিখেছেন ঃ

একবার অনেক অগ্নিপূজক আবুল হোযাইলের সাথে বিতর্ক করতে আসেন। তিনি সবাইকে স্তব্ধ করে দেন। তন্মধ্যে একজনের নাম ছিল মাইলাস। তিনি সেখানেই ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর নাম অনুসারেই আবুল হোযাইল তাঁর এক গ্রন্থকে 'মাইলাস' নামে অভিহিত করেন। 'শরহে মিলাল-ও-নিহাল নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, তিন হাজার ব্যক্তি তাঁর হাতে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন।

মামুনুর রশিদের সভায় যত ইলমে কালামবিদ ছিলেন, তন্মধ্যে আবুল হোযাইল এবং নায্যাম ছিলেন সর্বাধিনায়ক। সরকারের পক্ষ থেকে আবুল হোযাইল বার্ষিক ৬০ হাজার দিরহাম পেতেন। কিন্তু তিনি সমস্ত অর্থ বিদ্যোৎসাহীদের জন্য খরচ করে ফেলতেন। তিনি কেবল যুক্তিবিদ্যায়ই নয়, আরবী সাহিত্যেও সুদক্ষ ছিলেন। সুমামা ইবনে আশরাস ছিলেন মামুনুর রশিদের সভাসদদের মধ্যে একজন বিখ্যাত বিজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি একবার মামুনের দরবারে আবুল হোযাইলের প্রতি অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন।

কথোপকথনের সময় আবুল হোযাইল যখন সুমামার প্রতি সম্বোধন করতেন; তখন শুধু নাম ধরেই তাঁকে ডাকতেন। অথচ

তিনি ছিলেন একজন মর্যাদাসম্পন্ন লোক। স্বয়ং মামুনও নামের স্থলে পদবী ধরেই তাঁকে সম্বোধন করতেন। এভাবে নাম ধরে ডাকায় সুমামা অবশ্য সাময়িকভাবে দুঃখিত হন। কিন্তু তিনি নিজেই বর্ণনা করেন যে, আবুল হোযাইল কোন একটি বিষয় প্রমাণ করতে গিয়ে যখন আরবদের সাত শ' শ্লোক কণ্ঠস্থ শোনালেন, তখন আমি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠলাম, "আপনি আমাকে নাম ধরে ডাকুন বা পদবী ধরেই ডাকুন—সবই আপনাকে সাজে।" আবুল হোযাইলের কোন কোন বিতর্কের বিষয় এখানে উল্লেখযোগ্য।

একদিন কোন এক ব্যক্তি আবুল হোযাইলের নিকট এসে বললেন, কুরআন মজিদ সম্পর্কে আমার অন্তরে কতগুলো সন্দেহ রয়েছে, যা কিছুতেই দূরীভূত হচ্ছে না। সেগুলো হলো—কুরআনের বিভিন্ন আয়াত পরস্পর বিরোধী বলে মনে হয়। আবার কোন কোন আয়াতে ব্যাকরণের দিক থেকে ভুলত্রুটি দেখা যায়।" আবুল হোযাইল বললেন, প্রত্যেক আয়াতের উপর ভিন্ন ভিন্নভাবে আলোচনা করবো, নাকি মোটামুটিভাবে এমন উত্তর দেবো, যাতে আপনার সমস্ত সন্দেহ দূরীভূত হয়। অভিযোগকারী শেষোক্ত পন্থা গ্রহণ করলেন। আবুল হোযাইল বললেন, এটাতো সকলেই সমর্থন করছে যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) ছিলেন আরবের একজন সম্মানিত এবং সম্ভ্রান্ত বংশের লোক। তাঁর বাকপটুতা এবং ভাষাশৈলীর উপর কারুর কোন আপত্তি ছিল না। এতেও সন্দেহ নেই যে, আরবগণ রসূল করীমকে মিথ্যাবাদীরূপে আখ্যায়িত করেছিল এবং তাঁর সমালোচনায় কোন প্রকার ত্রুটি করেনি। এমতাবস্থায় আপনি নিজেই ভেবে দেখুন, আরবগণ রসূল করীমকে নানা অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে। কিন্তু কেউ তো একথা বলেনি যে, তাঁর ভাষাশৈলী ছিল অশুদ্ধ বা তাঁর কথা ছিল পরস্পর বিরোধী। সেসময় যখন লোকেরা এরূপ অভিযোগ করেনি, তাহলে আজ সে অভিযোগ করার অধিকার কার আছে?

'শরহে মওয়াকিফ' এবং অন্যান্য গ্রন্থেও কুরআন মজীদের বিরুদ্ধে আনীত এসব অভিযোগের উল্লেখ রয়েছে। তবে তাতে এটাও বলা হয়েছে যে, আবুল হোযাইলের দেয়া জওয়াবগুলো যথেষ্ট নয়। শাহ ওলী উল্লাহ্ সাহেব 'ফওযুল কবির' নামক গ্রন্থে লিখেছেন,

"কুরআন মজীদ কাসাই বা ফার্‌রার (দুজন আরবী ব্যাকরণ বিদ) নির্ধারিত নিয়মাবলীর অধীন নয়।" আবুল হোযাইলের উত্তরের প্রতি ইঙ্গিত করেই তিনি এ উক্তি করেন।

সে সময় সালিহ্‌ ইবনে কুদ্দুস নামে একজন বিখ্যাত অগ্নি-পূজক ছিলেন। তিনি অভিমত প্রকাশ করেন যে, আলো এবং অন্ধকার পরস্পর বিরোধী উপাদান। এ দুটির সংমিশ্রণেই বিশ্বের সৃষ্টি হয়। এ নিয়ে আবুল হোযাইল এবং সালিহ ইবনে কুদ্দুসের মধ্যে বিতর্ক হয়। আবুল হোযাইল জিজ্ঞেস করলেন, এই সংমিশ্রণে সৃষ্ট বস্তুটি সেই উপাদান দুটি থেকে স্বতন্ত্র একটা কিছু, না তাদেরই যৌগিক। সালিহ্‌ দ্বিতীয় দিক নিলেন। আবুল হোযাইল জিজ্ঞেস করলেন, পরস্পর বিরোধী দুটি বস্তু কি করে মিলিত হতে পারে? এর জন্য প্রয়োজন তৃতীয় সত্তার অর্থাৎ সংমিশ্রণকারীর এবং সেই অপরিহার্য সত্তাই আল্লাহ্‌।

একবার সালিহ্‌ বিতর্কে পরাস্ত হন। আবুল হোযাইল জিজ্ঞেস করলেন, এখন ইচ্ছা কি? সালিহ্‌ বললেন, আমি আল্লাহ্‌র কাছে 'ইস্‌তেখারা' করে অর্থাৎ স্বপ্নযোগে তাঁকে জিজ্ঞেস করে আমার অভিপ্রেত কর্মপন্থা নিরূপণ করে নিয়েছি এবং আমি এ বিশ্বাসে উপনীত হয়েছি যে, আল্লাহ্‌ দু'জন। আবুল হোযাইল বললেন, ইস্‌তেখারা তো করলেন, তবে বলুন, তা কোন আল্লাহ্‌র নিকট? যে আল্লাহ্‌র নিকট করলেন, তিনি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী আল্লাহ্‌র তরফ থেকে কিভাবে মতামত জ্ঞাপন করলেন? আবুল হোযাইল এবং সালিহ সম্পর্কে ইবনে খাল্লিকান আরো একটি মজার গল্প উল্লেখ করেছেন। সেটার উদ্ধৃতি এখানে দিলাম না।

## হিশাম ইবনুল হাকাম

এ সময় হিশাম ইবনুল হাকাম কুফী নামক একজন প্রখ্যাত 'মুতাকাল্লিম' (কালামপন্থী) ছিলেন। তিনি ছিলেন ইয়াহ্‌ইয়া বারমাকীর জ্ঞানচর্চা বিভাগের শিরোমনি। বুদ্ধিজাত জ্ঞান-বিজ্ঞান তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। বিতর্কে আবুল হোযাইল যদি কখনো কারুর নিকট নতি স্বীকার করতেন, তবে তাঁর নিকটেই করতেন। মাস্‌উদী তাঁর গ্রন্থে সে সব বিতর্কেরও বিবরণ পেশ করেন, যাতে ইয়াহ্‌ইয়া বারমাকী আবুল হোযাইলের উপর জয়লাভ করেন। ইবনে

নাদিম কিতাবুল 'ফিহরিস্ত' নামক গ্রন্থ তাঁর অনেক রচনার কথা উল্লেখ করেন। তন্মধ্যে 'আররদ্দু আলয্‌যানাদিকা,' 'আররদ্দু আলা আস্‌হাবিল ইস্‌নাইন,' 'আররদ্দু আলা আসহাবিত্‌ তাবায়ে (বস্তু বাদী-দের রদ),' 'কিতাবুল্‌ আলা আরাসতুতাসালিস্‌ ফিত্‌তাওহীদ' অন্যতম। এখন গ্রন্থগুলো দুষ্প্রাপ্য। তবে নামগুলো দেখেই অনুমিত হয় যে, এসব কত গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে লিখিত।

## ইলমে কালামের প্রতি ইয়াহ্‌ইয়া বারমাকীর অনুরাগ

কেবল খলিফা মাহদীই নন, শাহী দরবারের অন্যান্য প্রধানেরাও ইলমে কালামের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করেন। ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে খালেদ বারমাকী ছিলেন আব্বাসী শাসনের প্রাণধন, খলিফা মাহদীর প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর শাসনতরীর কাণ্ডারী। তিনি ইলমে কালাম আলোচনার জন্য শাহী দরবারে একটি সমিতি গঠন করেন। ঐতিহাসিক মাস্‌উদী সে সম্পর্কে বলেন ঃ

ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে খালেদ ছিলেন একজন তার্কিক এবং চিন্তাবিদ। তিনি একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। সমিতির সভায় প্রত্যেক ধর্মের যুক্তিবাদিগণ যোগদান করতেন।

এই সমিতির সেক্রেটারী ছিলেন হিশাম ইবনুল হাকাম। তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত বিজ্ঞ লোক। সভায় প্রত্যেক ধর্মের লোক যোগদান করতেন এবং প্রত্যেক বিষয়ের উপর আলোচনা করা হতো। ঐতিহাসিক মাস্‌উদী এ সমিতির-আয়োজিত একটি সভার বিবরণ পেশ করেন। তাতে ইলমে কালামের বিখ্যাত ১৩ জন বিদ্বান উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে তিনি আলী ইবনে হাসিম, আবু মালিক হায্‌রামী, আবুল হোযাইল এবং নায্‌যামের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। মাস্‌উদীর ভাষ্য অনুসারে এ সভার বিষয়বস্তুর মধ্যে সৃষ্টি ও অভি-ব্যক্তি, চিরন্তনতা ও নশ্বরতা, প্রমাণিতকরণ ও অস্বীকারকরণ গতি ও গতিহীনতা, সংমিশ্রণ ও পৃথকীকরণ, অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব, কোন বস্তুর টানা বা উত্তোলন করা, মৌলিকত্ব ও অমৌলিকত্ব, বৈধকরণ ও লিপিবদ্ধকরণ, পরিসংখ্যান ও মূল্যায়ন, যুদ্ধ, ইমামত ছিল অন্যতম।

## ইবনে খালদুনের ভ্রম

আল্লামা ইবনে খালদুন তাঁর ইতিহাসের ভূমিকায় ইলমে কালামের বর্ণনায় লিখেছেন, "ইমাম গাযালীর পূর্বে ইলমে কালামে দর্শনের কোন আমেজ ছিল না। তিনিই সর্বপ্রথম দার্শনিক পদ্ধতি অবলম্বন করে ইলমে কালাম পুনর্গঠন করেন।" এটা ঐতিহাসিক ইবনে খালদুনের মারাত্মক ভ্রম। পরবর্তী অনেক আলোচনায় তাঁর এ ভ্রম প্রতিপন্ন হবে। ইয়াহ্ইয়া ইবনে খালেদ কর্তৃক আহূত ইলমে কালামের সভায় যেসব বিষয় আলোচিত হয়েছে বলে মাস্‌উদী উল্লেখ করেছেন, সেগুলোর চাইতে অধিকতর দার্শনিক বিষয় আর কি হতে পারে?

খলিফা মাহদীর পর হিজরী ১৬৯ সালে হাদী শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন এবং মাত্র এক বছর তিন মাস শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এরপর মহামতি খলিফা হারুনুর রশিদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর যুগকে সমৃদ্ধি ও উন্নতির যুগ বলে পরিগণিত করা হয়। যে দরবারে জা'ফর বারমাকী, কাযী আবু ইউসুফ, ইমাম মুহম্মদ, আবু নওয়াস, ইসহাক মুসিলী এবং কাসাইর ন্যায় মহৎ লোক আসীন থাকতেন, তার অধিনায়ক কতবড় মর্যাদার অধিকারী ছিলেন, তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু তাঁর যুগে ইলমে কালামের কোন উন্নতি হয়নি। সে সময় কালামপন্থী আলিমদের কয়েদখানায় বন্দী করা হয় এবং আদেশ জারি করা হয় যে, কেউ যেন ইলমে কালাম সম্পর্কে কিছু লিখতে না পায়। কিন্তু তখন এমন কতগুলো কারণ দাঁড়ায়, যাতে বাধ্য হয়ে হারুনুর রশিদকে ইলমে কালামের কদর করতেই হয়। লোকদের ইলমে কালাম থেকে যখন প্রতিহত করা হলো এবং এ খবর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়লো, তখন সিন্ধুর রাজা সুযোগ বুঝে হারুনুর রশিদের নিকট এ মর্মে এক পত্র দিলেন, "মুসলমানেরা তলোয়ারের বলেই ইসলাম প্রচার করেছে। যদি যুক্তিবলে ইসলামকে সত্য বলে প্রমাণিত করা চলে, তবে আপনি কোন একজন আলিমকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। তিনি আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারলে আমি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হবো।"

হারুনুর রশীদ একজন ফকিহ (ফিক্‌হবিদ)-কে পাঠালেন। রাজার সভাসদদের মধ্যে একজনকে বিতর্কের জন্যে স্থির করা হলো।

তিনি ফকিহকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার আল্লাহ্ ক্ষমতাশীল, না অক্ষম? ফকিহ উত্তরে বললেন, ক্ষমতাশীল। রাজার পক্ষের লোকটি বললেন, আপনার আল্লাহ্ তাঁর মত অন্য একজন সৃষ্টি করতে পারেন কি? যদি না পারেন, তবে তাঁর শক্তিই বা রইল কোথায়? ফকিহ তদুত্তরে বললেন, এ ধরনের প্রশ্ন ইলমে কালামের সাথে সম্পৃক্ত। আর আমরা ইলমে কালামকে খারাপ বলে মনে করি। সিন্ধুর রাজা হারুনুর রশিদের নিকট লিখলেন, "আমি প্রথমে সন্দিহান হয়ে লিখেছিলাম। এখন নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারলাম যে, যুক্তি দিয়ে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না।"

হারুনুর রশিদ আদেশ দিলেন, মুতাকাল্লিমদের (কালামপন্থী) ডাকানো হোক এবং তাঁদের সামনে ব্যাপারটা পেশ করা হোক। মুতাকাল্লিমগণ দরবারে এলে তম্মধ্যে একজন বালক সেই সন্দেহ নিরসন করে বললো, এটা এমন ধরনের একটি প্রশ্ন, যেমন কেউ বললোঃ আল্লাহ্ কি এমন শক্তিমান যে তিনি স্বয়ং অজ্ঞ বা অক্ষম হতে পারেন? আল্লাহ্ এমন সব বস্তুই সৃষ্টি করতে পারেন, যা নশ্বর এবং অচিরন্তন। হারুনুর রশিদ আদেশ দিলেন, এই বালককেই বিতর্কের জন্য রাজার কাছে পাঠানো হোক। সভাসদগণ বললেন, এর চাইতেও অধিকতর জটিল বিষয় উপস্থিত হতে পারে এবং এ বালক সেগুলোর উত্তর দানে সক্ষম নাও হতে পারে। শেষ পর্যন্ত প্রখ্যাত মুতাকাল্লিম মুযাম্মার ইবনে ইবাদকে এ কাজে নিযুক্ত করা হলো।

## মামুনুর রশিদের যুগ

হারুনের পর মামুনের যুগ এলো। তাঁর জ্ঞান-সেবার বিবরণ দিতে হলে একটি বড় গ্রন্থের প্রয়োজন। আবার ইলমে কালামের সমৃদ্ধির জন্য তিনি যে সব কাজ করেছেন, তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়ার জন্য আরো একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থের প্রয়োজন। ঐতিহাসিক মাস্উদী, কাহের বিল্লার জীবনীতে একজন ইতিহাসবিদ সভাসদের ভাষ্য উদ্ধৃত করে মামুন সম্পর্কে বলেন ঃ

মামুনুর রশিদ মুতাকাল্লিমদের সাহচর্য অবলম্বন করেন এবং আবুল হোযাইল, আবু ইসহাক এবং নায্যামের ন্যায় তার্কিকদের

সভাসদরূপে গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন তাঁর মতাবলম্বী, আবার কেউ কেউ ছিলেন তাঁর মত বিরোধী। মামুনুর রশিদ দূর দূর থেকে ফকিহ্ এবং সাহিত্যিকদের ডেকে এনে তাঁর সভায় স্থান দেন এবং তাঁদেরকে বৃত্তিও প্রদান করেন। এতে লোকদের মধ্যে তর্ক-বিতর্কের অনুরাগ জন্মে এবং যুক্তিবিজ্ঞানও প্রসার লাভ করে। প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ মতবাদের সমর্থনে গ্রন্থ রচনা করেন।

জ্ঞানমূলক বিতর্কের জন্য মামুন সপ্তাহের একটি দিন নির্ধারিত করেন। সে সম্পর্কে বিবরণ দিতে গিয়ে ঐতিহাসিক মাস্‌উদী বলেন ঃ

মঙ্গলবার প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোক খলিফার দরবারে এসে সমবেত হতেন। তাঁদের জন্য একটি কক্ষ ফরশ দিয়ে বিশেষভাবে সাজানো হতো। প্রথমে খাওয়া দাওয়ার জন্য দস্তরখান বিছানো হতো। আহার শেষে প্রত্যেকেই ওযু করতেন। অতঃপর নানা ধরনের খোশবু এসে উপস্থিত হতো। সকলেই পোশাক-পরিচ্ছদ সুগন্ধময় করে নিতেন এবং সুরভি নিয়ে বিতর্ক আরম্ভ করতেন। বিতর্ক কক্ষে শাসক ও শাসিতের মধ্যে কোন ব্যবধানই থাকতো না। সকলেই স্বাধীনচিত্তে আলাপ আলোচনা করতেন। দ্বিপ্রহরের পর সভা ভেঙ্গে যেতো।

## একটি ধর্মীয় সম্মিলন

ইলমে কালামের প্রতি হারুনুর রশিদের হস্তক্ষেপের ফলে ইসলাম-বিরোধিগণ প্রচার করেছিল যে, ইসলাম যুক্তিতে নয়, বরং তলোয়ারের জোরেই প্রসার লাভ করতে পারে। এ সন্দেহ নিরসন করার জন্য মামুনুর রশিদ একটি মহৎ বিতর্ক সভার আয়োজন করেন এবং তাতে প্রত্যেক অঞ্চল, দেশ এবং ধর্মের লোককে আমন্ত্রিত করেন। অগ্নিপূজকদের অধিনায়ক ইয়াযদাঁ বখ্‌ত মারব থেকে আমন্ত্রিত হয়ে আসলেন। মামুন তাঁকে খেলাফত-ভবনের নিকট বিশেষ একটি কক্ষে স্থান দেন।

আবুল হোযাইল মুসলমানদের প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। তিনি বিতর্কে জয়লাভ করেন। ইয়াযদাঁ বখ্‌ত বিতর্কে পরাজিত হলে মামুন জোশে উদ্দীপিত হয়ে বলে উঠলেন, ইয়াযদা বখ্‌ত! আপনি

মুসলমান হোন। উত্তরে তিনি বললেন, আপনারা তো কাউকেও জোর পূর্বক মসলমান করেন না এবং আমিও মুসলমান হতে চাই না। মামুন বললেন ঃ হাঁ, এটা ঠিক কথা।

## নাযযাম

আবুল হোযাইলের পর তাঁর শিষ্য ইব্রাহিম ইবনে সাইয়্যার নাযযাম ইলমে কালামের বিশেষ উন্নতি বিধান করেন। তিনি ছিলেন মামুনুর রশিদের শিক্ষক এবং বিশিষ্ট সভাসদ। শহরিস্তানী 'মিলাল-ও-নিহাল' নামক গ্রন্হে তাঁর দর্শনজ্ঞান সম্পর্কে বলেন, "তিনি অনেক দর্শন গ্রন্হ পাঠ করেন এবং মুতাযিলা পন্হী ইলমে কালামকে দর্শনের সাথে গুলিয়ে ফেলেন।"

ইউরোপের প্রখ্যাত গবেষকদের ধারণা হলো-যে সব পদার্থকে লোকেরা দ্রব্য বলে মনে করে, সেগুলো দ্রব্য নয়, বরং কতগুলো গুণের যৌগিক। আবার যেগুলোকে লোকেরা গুণ বলে ধারণা করে, সেগুলো মূলতঃ দ্রব্য। যেমন, সুগন্ধ বা আলোকে সাধারণতঃ গুণ বলে অভিহিত করা হয়। কিন্তু বাস্তবে এসবও দ্রব্য। সুগন্ধ হলো —ফুল থেকে নির্গত কতগুলো বিশেষ পরিমাণের পরমাণুর যৌগিক। বস্তুত নাযযামই উভয় ধারণার স্রষ্টা। তিনিই সর্বপ্রথম ধারণা[১] দুটি পেশ করেন। শহরিস্তানী 'মিলাল-ও-নিহাল' নামক গ্রন্হে নাযযামের বিশেষ বিশেষ নীতি এবং বিষয়বস্তুর উল্লেখ করেন। তন্মধ্যে তাঁর সপ্তম নীতির বর্ণনা দিতে গিয়ে শহ্রিস্তানী বলেন ঃ

জড় পদার্থ কতগুলো গুণের যৌগিক। হিশাম ইবুল হাকামের ন্যায় তিনিও এমত পোষণ করেন যে রং, স্বাদ, সুগন্ধ—এ সবই পদার্থ।

---

১. ধারণা দুটি আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী বলে মনে হয়। কিন্তু আল্লামা তাফ্তাযানী 'শরহে মাকাসিদ' নামক গন্হের ২৯৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, নাযযামের মতে, পদার্থমাত্রই রং, গন্ধ ইত্যাদির যৌগিক। এ হিসেবে নাযযামের অভিমত হলো, "পদার্থ কতগুলো গুণের যৌগিক"। এর মানে হলো—পদার্থ সে সব বস্তু নিয়েই গঠিত, যেগুলোকে লোকেরা গুণ বলে মনে করে থাকে। বস্তুত তা গুণ নয়।

নাযযাম অবিভাজ্য পরমাণুরও অস্বীকার করেন। এ বিষয়ে তাঁর যুক্তি তর্ক দর্শনের প্রত্যেকটি গ্রন্হে স্থান লাভ করেছে।

## একটি বিস্ময়কর ব্যাপার

এখানে একটি বিস্ময়কর ব্যাপারের উল্লেখ না করে পারছি না। তাহলো এই যে, নায্যামকে তাঁর সূক্ষবুদ্ধির পুরস্কার স্বরূপ 'কাফের' খেতাবেই আখ্যায়িত করা হয়। আল্লামা সাম্য়ানী 'কিতাবুল আন্সাব' নামক গ্রন্হে লিখেছেন, "কাদরিয়া (মুতাযিলা) সম্প্রদায়ের মধ্যে নায্যামের ন্যায় বিভিন্ন দিক থেকে এত বড় কাফের অতীতে আর দেখা যায়নি। তিনি অগ্নিপূজক, প্রকৃতিবাদী এবং দার্শনিকদের সাহচর্যে যৌবন অতিবাহিত করেন। তিনি অবিভাজ্য পরমাণুর বিষয়টি ধর্মহীন দার্শনিকদের নিকট থেকেই গ্রহণ করেন। আর ন্যায়পরায়ণ সত্তা জুলুম করতে সক্ষম নয়—এ বিষয়টি শিক্ষা করেন অগ্নিপূজকদের নিকট। এছাড়া রং, স্বাদ, গন্ধ, আওয়াজ—এসবও পদার্থ—এ শিক্ষাটি প্রাপ্ত হন হিশামিয়া সম্প্রদায়ের নিকট। এমনিভাবে তিনি ইসলামকে অগ্নিপূজক এবং দার্শনিকদের ধর্মের সাথে গুলিয়ে জগাখিচুড়ি করে ফেলেছেন।" এটা শুধু সাম্যানীর ধারণা নয়। হাদীস বর্ণনাকারীদের নিয়ে যে সব জীবনচরিত গ্রন্থ লিখিত হয়েছে এবং তাতে সাধারণত যেখানেই নাযযামের উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানেই তাঁকে এ ধরনের অজুহাতে ধর্মহীন বা নাস্তিকরূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

দর্শনে নায্যাম কত বেশী দক্ষতা অর্জন করেছিলেন, তা একটি ঘটনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়। একদিন তিনি জা'ফর বারমাকীর নিকট বলেছিলেন, আমি অ্যারিস্টটলের একটি গ্রন্থের কোন কোন বিষয় ভুল প্রতিপন্ন করেছি। এর উত্তরে জা'ফর বলেছিলেন, আপনি কী লিখবেন? আপনি তো এ গ্রন্থ পড়তেও পারেন না। প্রত্যুত্তরে নায্যাম বললেন, আপনি কি চান যে, আমি অ্যারিস্টটলের গ্রন্থটি আগাগোড়া মুখস্থ শুনিয়ে দেই? এ কথা বলেই তিনি অ্যারিস্টটলের রচনা পড়ে শুনাতে আরম্ভ করলেন এবং সাথে সাথে তাঁর ভুলের প্রতিও অংগুলি নির্দেশ করতে থাকেন।

**জাহিয বলতেন :** "লোকের এরূপ বিশ্বাস আছে যে, প্রতি হাজার বছরে এমন একজন লোক জন্মগ্রহণ করে, যার সঙ্গে পৃথিবীর কারুর

তুলনা হয় না। এটা যদি সত্য হয়, তবে বলতে হয় যে, নায্‌যামও ছিলেন এমন একজন ব্যক্তি।"

ধর্মীয় বিষয়ে গবেষণা করার উদ্দেশ্যে নায্‌যাম অন্যান্য ধর্মের ঐশী গ্রন্থ সমূহেও বিরাট দক্ষতা অর্জন করেন। তওরিত, ইনজিল, যবুর ছিল তাঁর নখাগ্রে। এগুলোর ব্যাখ্যাও তিনি ভাল করে জানতেন।

নায্‌যাম জাহিযের ন্যায় একজন অতুলনীয় জ্ঞানী এবং একান্ত অনুগত শিষ্যের সৃষ্টি করেন। এতেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব এবং উচ্চ মর্যাদা খুব সহজে অনুমিত হয়।

## ওয়াসিক বিল্লাহ্‌

মামুনের পর মুসতা'সিম শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন অশিক্ষিত। তাঁর মন মেজাজ ছিল একজন সৈনিকের ন্যায়। কিন্তু এরপর হিজরী ২২৭ সালে তাঁর পুত্র ওয়াসিক বিল্লাহ্‌ সিংহাসনে আরোহণ করলে মামুনের জ্ঞানচর্চা আবার সজীব হয়ে উঠে। ঐতিহাসিক মাস্‌উদী তাঁর জীবনচরিত বর্ণনায় বলেন ঃ

খলিফা ওয়াসিক বিল্লাহ্‌ চিন্তাভাবনা করতে ভালবাসতেন। তিনি অনুকরণ মোটেই পছন্দ করতেন না। আধুনিক ও প্রাচীন দার্শনিক এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের ভাবধারা জানবার তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। তাঁর সভায় পদার্থ বিজ্ঞান এবং অধিবিদ্যার বিশেষ চর্চা হতো।

মুতাকাল্লিম এবং ফকিহ্‌দের বিতর্কের জন্য ওয়াসিক বিল্লাহ একটি সমিতি গঠন করেন। তাতে প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে সূক্ষ্ম আলোচনা করা হতো। ঐতিহাসিক মাস্‌উদী এসব সম্মিলনের জ্ঞানগর্ভ আলোচনার সারাংশ 'আখবারুয্‌ যামান' এবং অন্যান্য গ্রন্থে বিধৃত করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজকাল সে সব গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য। উপরোক্ত ইতিহাসবিদ তাঁর 'মুরুজুয্‌ যাহাব' নামক গ্রন্থে শুধু এতটুকু লিখেছেন ঃ

তাঁর দরবারে মুতাকাল্লিম ও ফকিহ্‌দের অনুধ্যানের জন্য যে সব সভা আহূত হতো, তাতে যুক্তিভিত্তিক জ্ঞানবিজ্ঞান এবং প্রচলিত মতবাদের মৌলিক ও সূক্ষ্ম বিষয়গুলো আলোচিত হতো। আমি আমার পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে সে সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

মাহদী, মামুন এবং ওয়াসিকের রাজকীয় উৎসাহ উদ্দীপনায়, তদুপরি বারমাকীদের এবং অন্যান্য ওজির-আমিরদের সক্রিয় স্বীকৃতির

ফলে ইলমে কালাম এত দৃঢ়তা লাভ করে যে, এর উপর থেকে সরকারের ছত্রছায়া উঠে যাবার পরেও তা বহুদিন পর্যন্ত উন্নতি করতে থাকে এবং তদবিষয়ক গ্রন্থাবলী ও রচনাবলী সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। মাহদী থেকে আরম্ভ করে ওয়াসিক পর্যন্ত যত কালাম-পন্থী ওলামা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁদের ইতিহাস লিখতে হলে একটি স্বতন্ত্র পুস্তকের প্রয়োজন। তন্মধ্যে জাহিয, মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইসকাফী (মৃঃ ২২৩ হিঃ), জা'ফর ইবনে আল-বাশার, আলী ইবনে রুম্মানী, জা'ফর ইবনে হার্‌ব সায়রাফী (মৃঃ ২৩৬ হিঃ), হাসান ইবনে আবদুল্লাহ্, আবু মূসা আল-ফার্‌রার (মৃঃ ২২৬ হিঃ) নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

## নওবখ্‌ত ও তাঁর বংশ পরিচয়

ইলমে কালামের ক্রমবিকাশের আলোচনায় নওবঘতের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন। ফযল ইবনে নওবঘত ছিলেন হারুনুর রশিদ প্রতিষ্ঠিত 'খাযানাতুল হুকামা'-এর প্রধান। তিনি ফার্সী গ্রন্থের আরবী অনুবাদ করতেন। 'খাযানাতুল হুকামা' নামক প্রতিষ্ঠানে পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান গ্রন্থের অনুবাদ করা হতো। নওবঘতের পৌত্র ইসমাইল একজন বড় আলিম এবং ইলমে-কালামবিদ ছিলেন। তাঁর অধিনায়কত্বে বিশেষ ধরনের সভা আহূত হতো। তাতে মুতাকাল্লিমগণ সমবেত হয়ে ইলমে কালাম বিষয়ে পর্যালোচনা করতেন। ইলমে কালাম বিষয়ে তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। ইবনে নাদিম তাঁর নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলোর নাম উল্লেখ করেন:

কিতাবু ইবতালিল্ কিয়াস, নাকযু কিতাবে আবাসিল্ হিকমাতে আলার রাবিন্দী, নাকযুত তাজ, কিতাবু তাসবিতির রিসালাহ্।

ইসমাঈলের ভাগ্নে হাসান ইবনে মূসা এ বংশের সবচাইতে প্রখ্যাত ব্যক্তি ছিলেম। ইবনে নাদিম তাঁর সম্পর্কে বলেন, তিনি মুতাকাল্লিমও ছিলেন, দার্শনিকও ছিলেন। তাঁর আদেশে এবং তত্ত্বাবধানে গ্রীক দর্শনের অনেক গ্রন্থ অনূদিত হয়। বিখ্যাত অনুবাদক আবু ওসমান দামিশ্‌কী, ইসহাক, সাবিত ইবনে কুর্‌রাহ তাঁর নিত্য সহচর ছিলেন। তাঁর একটি গ্রন্থের আলোচনা পরে করা হবে।

ইলমে কালাম ক্রমবিকাশের বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে চতুর্থ শতকে উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হয়।

## চতুর্থ শতকের মুতাকাল্লিমীন

এ যাবত অবশ্য ইলমে কালাম নিয়ে বহু গ্রন্থই রচনা করা হয়। কিন্তু কুরআন মজীদে যা কিছু বর্ণিত আছে, তা যে যুক্তি-সম্মত এবং বুদ্ধিভিত্তিক—এ মর্মে ইলমে কালামের নীতির আলোকে কোন তফসির রচিত হয়নি। এই প্রয়োজন এ শতকের কয়েকজন বিখ্যাত আলিম পূর্ণ করেন। তাঁরা হচ্ছেনঃ আবু মুসলিম ইসফাহানী, আবু বকর আসুম, আবুল কাসিম বলখী এবং কাফ্ফাল্ কবির।

আবু মুসলিমের আসল নাম মোহাম্মদ ইবনে বাহার ইসফাহানী। আল্লামা যাহাবী তাঁর নাম মোহাম্মদ ইবনে আলী ইব্নে মাহরিযদ লিখেছেন। ইবনে নাদিম তাঁকে বিখ্যাত বলিগদের (বাক্ বিশেষজ্ঞ) নামের তালিকায় শামিল করেন এবং বলেনঃ তিনি ছিলেন একজন লেখক, বাক্ বিশেষজ্ঞ এবং আধুনিক মুতাকাল্লিম। তাঁর রচিত তফসিরের নাম 'জামিউত্ তাবিল্ লে-মোহকামিত্ তানযিল।' 'কাশ্ফুয্যুনুন' রচয়িতার মতে, তফসিরটি ১৩ খণ্ডে বিভক্ত। আবু মুসলিম হিজরী ৩২২ সালে ওফাত প্রাপ্ত হন। এ তফসিরের রচয়িতা একজন মুতাযিলী হওয়া সত্ত্বেও ইমাম রাযী তাঁর প্রশংসা করে বলেনঃ আবু মুসলিম তাঁর তফসিরে যে যুক্তি প্রয়োগ করেন, তা খুবই সুন্দর। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ব্যাপারগুলোও তাঁর নজর এড়াতে পারেনি।

অনেক বিষয়ে আবু মুসলিম ছিলেন অদ্বিতীয়। কুরআন মজীদের কোন কোন আয়াত 'নাসিখ' (বিলোপ-সাধক) ও কোন কোন আয়াত মনসুখ (রহিত)—এ মতবাদ তিনি পুরোপুরি অস্বীকার করেন। যে সব আয়াত সাধারণ ওলামার নিকট মনসুখ বলে গণ্য, সেগুলোর তফসির বর্ণনায় ইমাম রাযী আবু মুসলিমের মত্ অনুসরণ করেন এবং তাঁর দেয়া রহিত হওয়ার কারণও উদ্বৃত করেন। রাযীর বর্ণনাপদ্ধতি দেখে মনে হয় যে, তিনি আবু মুসলিমের সাথে পুরোপুরি একমত ছিলেন।

আবুল কাসিম বলখীর পুরো নাম—আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে মাহমুদ কা'বী। ইবনুল খাল্লিকান তাঁর নাম 'প্রখ্যাত আলেম' বলে উল্লেখ করেন এবং তাঁর কৃতিত্বের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেনঃ

"তিনি ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুতাকাল্লিম।" ইমাম রাযী তাঁর তফসিরে বলখীর অনেক অভিমত উদ্ধৃত করেন।

'কাশ্‌ফুয্‌যুনুন্‌' নামক গ্রন্থে লিখিত আছেঃ বলখীর তফসির ১২ খণ্ডবিশিষ্ট। এর পূর্বে এত বড় তফসির আর কখনো লিখিত হয়নি। তিনি হিজরী ৩০৯ সালে ওফাত প্রাপ্ত হন।

এ তফসিরটি ছাড়াও তাঁর আরো অনেক গ্রন্থ আছে। যেমন, উয়ূনুল্‌ মাসাইল, মাকালাতু আহ্‌লে কিতাব। দার্শনিকদের সাথে তিনি প্রায়ই বিতর্কে লিপ্ত হতেন এবং তাঁদের পরাস্ত করতেন। খোরাসানের বহুলোক তাঁর যুক্তিবলে প্রভাবিত হন এবং সঠিক পথ অবলম্বন করেন।

আবু বকর আসুমের প্রকৃত নাম আবদুর রহমান ইবনে কাইসান। তাঁর বেশী বিবরণ জানা নেই। 'কাশ্‌ফুয্‌যুনুন' নামক গ্রন্থে তাঁর তফসিরের উল্লেখ আছে। ইমাম রাযী তাঁর তফসির থেকে অনেক কিছু উদ্ধৃত করেন।

কাফ্‌ফাল ছিলেন একজন বড় এবং বিখ্যাত আলেম। তাঁর পুরো নাম মোহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে ইসমাঈল। তিনি তফসির, হাদীস, ফিক্‌হ্‌ এবং সাহিত্যের 'ইমাম' (পথপ্রদর্শক) বলে গণ্য ছিলেন। মুহাদ্দিসগণ তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন। আল্লামা ইবুনস্‌ সাবকী 'তাবাকাত-এ-কুব্‌রা' নামক গ্রন্থে লিখেন, "মৌলিক নীতি বর্ণনায় ও বিশ্লেষণে তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। তিনি ছিলেন তফসির, হাদীস ও ইলমে কালামের একজন ইমাম।" আল্লামা ইবনুস্‌ সাব্‌কী তাঁর প্রশংসায় অনেক মুহাদ্দিসের ভাষ্য উদ্ধৃত করেন। কাফ্‌ফাল ছিলেন ইমাম আবুল হাসান আশয়ারীর সমসাময়িক। তাঁর নিকট আবুল হাসান আশ্‌য়ারী ফিক্‌হ্‌ অধ্যয়ন করেন। হিজরী ৩৬৫ সালে তিনি ইনতেকাল করেন।

একটি মজার ব্যাপার হলো এই যে, কাফ্‌ফাল বুদ্ধিভিত্তিক নীতি অবলম্বনে তফসির রচনা করেন। এজন্য লোকেরা তাঁকে মুতাযিলী বলে ধারণা করতেন। অথচ সমস্ত শাফেঈপন্থী তাঁকে সেযুগের ইমাম বলে গণ্য করতেন। এজন্য ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে যে, তিনি প্রথমে ছিলেন মুতাযিলী। অতঃপর আশায়েরাবাদ অবলম্বন করেন। এ মর্মে ইবনে আসাকিরেরও একটি অভিমত আছে বলে কথিত আছে।

আবু সাহাল সা'লুকীর নিকট এক ব্যক্তি কাফ্‌ফালের তফসির সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে তিনি বললেনঃ তা পবিত্রও বটে, অপবিত্রও বটে। অপবিত্রতার কারণ হলো—তাতে মুতাযিল্লাবাদের প্রতি সমর্থন রয়েছে।

## পঞ্চম শতকে ইলমে কালাম

পঞ্চম শতকে বিভিন্ন কারণ বশতঃ ইল্‌মে কালামের পতন শুরু হয়। তা সত্ত্বেও এ সময় কতক উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মুতাকাল্লিমের আবির্ভাব ঘটে। তন্মধ্যে আবুল হোসাইন মোহাম্মদ ইবনে আলী আল-বস্‌রী, আবু ইসহাক ইস্‌ফারাইনী, কাযী আবদুল জাব্বার মুতাযিলী ছিলেন বিশেষ প্রখ্যাত। ইবনে খাল্লিকান বলেন, ইমাম রাযীর 'আল মাহসুল' নামক গ্রন্থটি আবুল হোসাইন বস্‌রী রচিত 'মু'তামাদ' নামক গ্রন্থেরই সারমর্ম। এতে সহজেই অনুমিত হয় যে, তিনি কত বড় মর্যাদার লোক ছিলেন। ইবনে খাল্লিকান তাঁর সম্পর্কে বলেন ঃ

"তাঁর যুক্তি খুবই সুন্দর। তিনি ছিলেন সে সময়ের ইমাম। লোকেরা তাঁর রচনায় খুবই উপকৃত হয়।" তাঁর আরো গ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে 'তাসাফ্‌ফুহুল আদিল্লাহ' দুখণ্ড বিশিষ্ট। 'গুরুরুল আদিল্লাহ্' একটি বৃহদাকার গ্রন্থ। আবুল হোসাইন হিজরী ৪২৬ সালে পরলোক-গমন করেন। হানাফী মতাবলম্বী প্রখ্যাত ফকিহ্ কাযী যমিরী তাঁর জানাযার নামায পড়ান।

আবু ইসহাক ইসফারাইনীর মূল নাম—ইব্রাহিম ইবনে মোহাম্মদ। শাফেঈ মতাবলম্বীদের মধ্যে কেউ তাঁর সমকক্ষ ছিল না। মুহাদ্দিসগণও তাঁকে তদানীন্তন ইমাম বলে গণ্য করতেন। হিজরী ৪১৮ সালে তিনি ওফাত প্রাপ্ত হন। তিনি নিছক ইলমে কালাম বিষয়ে যে গ্রন্থটি রচনা করেন তা' পাঁচ খণ্ডবিশিষ্ট। এর নাম 'জামিউল হুলা ফি উসূলুদ্দীন অর-রদ্দু আলাল মুলহিদীন।'

ইলমে কালামের ইতিহাস এ শতকে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। এ যাবত ফকিহ্ এবং মুহাদ্দিসগণ ছিলেন ইলমে কালামের প্রতি সম্পূর্ণ বিমুখ। অনেকেই এ বিষয়কে পথ ভ্রান্তির কারণ বলে মনে করতেন। যাঁরা ততটা চরমপন্থী ছিলেন না, তাঁরা অন্ততঃ এত-

টুকু মনে করতেন যে, এ বিষয়টি অপ্রয়োজনীয় ও নিরর্থক। এ সময়ে প্রাচ্যদেশসমূহে ইলমে কালাম সম্পর্কে এই একই মনোভাব ছিল। কিন্তু স্পেন সৌভাগ্যের অধিকারী হয়। সেখানে হাদীস এবং কালাম একই সভায় পাশাপাশি স্থান লাভ করে।

আল্লামা ইবনে হায্‌ম যাহিরী হিজরী ৩৮৪ সালে কর্ডোভায় জন্মগ্রহন করেন। তিনি সুলতান মুনসুর মোহাম্মদ ইবনে আবি আমরের দরবারে ওজির পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ছিলেন ফিক্‌হ্ এবং হাদীসের ইমাম। সাধারণ মুহাদ্দিসীন তাঁর মর্যাদা ও মহত্ত্বের স্বীকৃতি দেন। মুহাদ্দিস যাহাবী 'তাবাকাতুল্ হোফ্‌ফায্' নামক গ্রন্থে তাঁর কার্যাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং তাঁকে হাদীসের ইমাম বলে অভিহিত করেন। মুসলিম জাহানে যাঁরা অসাধারণ প্রতিভাশালী বলে পরিগণিত, আল্লামা ইবনে হায্‌ম্ তন্মধ্যে একজন। তাঁর রচনাবলীর সংখ্যা চারশতের কাছাকাছি। এগুলো আশি হাজার পৃষ্ঠা জুড়ে রয়েছে। তাঁর একটি বৃহদাকার গ্রন্থের নাম— 'ইসাল'। এতে তিনি ফিক্‌হ্ শাস্ত্রের সমস্ত বিষয় বর্ণনা করেন। প্রত্যেক বিষয়ে সাহাবী, তাবেয়ী, মুজতাহিদ ও হাদীসের ইমামদের মতামত উদ্ধৃত করেন এবং প্রত্যেকের যুক্তিও বর্ণনা করেন। আবার মত-বিরোধমূলক বিষয়ে নিজস্ব মতামতও ব্যক্ত করেন। 'মুহাল্লা' এ ধরনের দ্বিতীয় গ্রন্থ। এতে তিনি মুজতাহিদের ভূমিকা পালন করেন। তিনি কারুর অনুকরণ করতেন না। তাঁর রচনাবলীতে এ বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট।

## স্পেনে ইলমে কালাম

স্পেনে যুক্তিবিদ্যা ও দর্শন অধ্যয়ন করা ছিল একটি অপরাধ। তাঁরা 'দর্শন' শব্দটিকেও অন্য শব্দে প্রকাশ করতেন। কিন্তু আল্লামা ইবনে হায্‌ম জনমতের মোটেই পরোয়া করেন নি। তিনি মোহাম্মদ ইবনে হাসান কিনানীর নিকট এসব বিদ্যা শিক্ষা করেন এবং দক্ষতাও অর্জন করেন। তিনি মানতিক (যুক্তিবিদ্যা) বিষয়ে 'তাকরিব' নামক একটি গ্রন্থ লিখে পূর্ববর্তী পরিভাষাগুলো বদলে দেন এবং প্রত্যেকটি বিষয়ের উদাহরণ ফিক্‌হ শাস্ত্রের বিষয়বস্তু থেকে উদ্ধৃত করেন।

ইবনে হায্‌ম ইলমে কালাম বিষয়ে দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। একটিতে তিনি তওরিত এবং ইনজিলের ভাষাকে কিভাবে বিকৃত

করা হয়, তা' তুলে ধরেন। ইবনে খাল্লিকান দাবী করেন, এ বিষয়ে এটাই সর্বপ্রথম গ্রন্থ। দ্বিতীয় রচনার নাম—'আলফসলু ফিল মিলালে-ওল-আহ্ওয়ায়ে-অন-নিহাল'। এতে প্রকৃতিবাদী, দার্শনিক, অগ্নিপূজক, খ্রীস্টান এবং ইহুদীদের ধর্মীয় বিশ্বাস বর্ণনা করেন এবং তাদের মতামত খণ্ডনও করেন। এ গ্রন্থে সমস্ত মুসলিম সম্প্র-দায়ের আকাইদ বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয় এবং সেগুলোর সমালোচনাও করা হয়। এ গ্রন্থটির প্রথম ভাগ মিসরে প্রকাশিত হয়েছে এবং বাকিটুকু এখন মুদ্রিত হচ্ছে।

আল্লামা ইবনে হায্ম কারুর অনুসারী ছিলেন না। তিনি নির্ভীক এবং স্বাধীনভাবে মুজতাহিদদের সমালোচনা করতেন। তাই ফকিহ্গণ তাঁর শত্রুতে পরিণত হন। তাঁরা আওয়াজ তুললেন যে, কেউ যেন তাঁর সাথে মেলামেশা না করে। এতেও তাঁরা সন্তুষ্ট হননি। তাঁরা তাঁকে দ্বীপান্তরিত করিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন। এই হতভাগ্য লোকটি 'লায়লা' নামক মরুভূমিতে ভবঘুরে হয়ে হিজরী ৪৫৬ সালের ৮ই শাবান প্রাণত্যাগ করেন। এটা ইবনে খাল্লিকানের অভিমত। আমাদের মতে, মানতিক এবং কালামের প্রতি ঝুঁকে পড়াই ছিল ইবনে হায্মের সবচাইতে বড় অপরাধ।

স্পেনে ইবনে রুশ্দের পূর্বে ইবনে হায্ম ছাড়া আর কোন বিখ্যাত ব্যক্তি ইলমে কালামের প্রতি লক্ষ্য করেননি। এর কারণ ইবনে হায্ম তাঁর এক পুস্তিকায় বর্ণনা করেন। এ পুস্তিকাটি স্পেনের গৌরব বর্ণনায় লিখিত। এতে তিনি বলেন : আমাদের দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায় নেই। আকাইদ বিষয়েও আলাপ-আলোচনা হয় না। তাই এখানে অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় ইলমে কালামের কোন উন্নতি হয় নি। তা সত্ত্বেও খলিল ইবনে ইসহাক, ইয়াহ্ইয়া ইবনুস সামানিয়া, মুসা ইবনে হাদির, আহমদ ইবনে হাদিরের ন্যায় মুতাযিলীরা এ বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন। আমি নিজেও অভিনব ধারণা নিয়ে সে সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থ প্রণয়ন করেছি।

## ইলমে কালামের পতন

ইলমে কালামের প্রথম পর্বের ভাটা এখানেই আরম্ভ হয়। ক্রমাগত এর সম্পূর্ণ পতন ঘটে। প্রকৃতপক্ষে চতুর্থ শতকের শেষভাগে অর্থাৎ

আব্বাসীদের শাসন ক্ষমতায় ভাঙ্গন ধরার সাথে সাথেই ইল্‌মে কালামের পতন শুরু হয়। হুকুমতের ছত্র ছায়ায় বিষয়টি জন্ম লাভ করে এবং তারই সহায়তায় উন্নতির ধাপগুলো অতিক্রম করে। জনসাধারণ প্রথম থেকেই বিষয়টিকে খারাপ চোখে দেখতো। কিন্তু সরকারের সহায়তা ছিল বলে তারা কোন ব্যাঘাত জন্মাতে পারেনি। আব্বাসী শাসকরা একদিকে ছিলেন বাদশা, অন্যদিকে ছিলেন খলিফা। অর্থাৎ তাঁরা ধর্মপ্রধানও ছিলেন। জুমায় তাঁরাই ছিলেন খতিব এবং তাঁরাই ছিলেন ইমাম। দু'ঈদে তাঁরাই নামায পড়াতেন। ফিক্‌হ্‌ (শরীয়তের আইন) বিষয়ে তাঁরা নিজেরাই ইজতেহাদ (মত প্রয়োগ) করতেন। এজন্য তাঁদেরকে ফকিহ্‌দের (ফিক্‌হ্‌বিদ) সামনে কখনো নতি স্বীকার করতে হয়নি।

চতুর্থ শতকে আব্বাসী খলিফাদের শাসন ক্ষমতায় ফাটল ধরে। হুকুমতের চাবিকাঠি দায়লমী ও তুর্কীদের হাতে চলে যেতে আরম্ভ করে। তুর্কীরা আপন ক্ষমতা বলে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েন। কিন্তু তাঁদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রবল থাকলেও অন্যদিকে দুর্বল ছিল তাঁদের মন মস্তিষ্ক। ধর্মীয় জ্ঞান বিজ্ঞানে তাঁরা ছিলেন শূন্য পর্যায়ে। এ জন্য প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তাঁদের যে ধর্মীয় অধিকার ও কর্তৃত্ব ছিল, তা তাঁদের হস্তচ্যুত হয়। তাঁরা ইমামতও করতে পারতেন না, খোতবা পাঠেও সক্ষম ছিলেন না। ধর্মীয় বিষয়ে কোন অভিমত বা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারতেন না। তাই ধর্মীয় প্রশাসনের ভার ফকিহদের হাতে চলে যায়। এই বাদশাদের অজ্ঞতার সীমা দেখুন: কুরআন সৃষ্ট, না চিরন্তন—এ বিষয়টি নিয়ে যখন বিতর্কের উদ্ভব হলো, তখন মামুনুর রশিদকে সমস্ত আলিমদের বিতর্কে আমন্ত্রিত করতে হয় এবং এতটুকু বলতে হয় যে, কেউ যদি তাঁকে বুঝিয়ে দিতে পারেন, তবে তিনি তাঁর ধারণা প্রত্যাহার করতে প্রস্তুত। মাহমুদ গজনবী যখন সত্য নিরুপণের জন্য হানাফী এবং শাফেঈ ওলামার মধ্যে বিতর্কের আয়োজন করলেন, তখন তাঁদের মধ্যস্থতা করার একজন আরবী জানা খ্রীস্টানকেই ডেকে আনতে হয়।

মোটকথা, তুর্কীদের ক্ষমতা বিস্তারের সাথে সাথে ইলমে কালাম দুর্বল হয়ে পড়ে। চিন্তার স্বাধীনতা পুরোপুরি বিলুপ্ত হয় এবং বুদ্ধিমত্তার আলো সম্পূর্ণরূপে নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে।

# দ্বিতীয় যুগ

## আশায়েরা

প্রথম স্তরের ইলমে কালাম ছিল ঐশী বাণী এবং পরস্পরাগত ধর্মমত্ভিত্তিক। কিন্তু ইমাম গাযালীর সময় তা বুদ্ধিভিত্তিক হয়ে দাঁড়ায়। আমার উদ্দেশ্য ছিল ইমাম গাযালীর যুগ থেকে বুদ্ধিভিত্তিক ইলমে কালাম প্রণয়ন করা। কিন্তু দেখলাম, ইমাম গাযালী ইলমে কালামে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, তার বুনিয়াদ রচিত হয়েছে ইমাম আবুল হাসান আশয়ারীর হাতে। তাই আমি আশয়ারীর যুগ থেকেই আরম্ভ করছি।

ইমাম আশয়ারীর নাম আলী ইবনে ইসমাঈল। হিজরী ২৭০ সালে তিনি বসরায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩৩০ সালে বাগদাদে পরলোকগমন করেন। তিনি প্রথমে মুতাযিলাপন্থী আবদুল ওহাব জুব্বাইর নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। একদিন স্বপ্নযোগে তিনি একটি আদেশ প্রাপ্ত হন। তদনুসারে তিনি বসরার জামে মসজিদে ঘোষণা করলেনঃ আজ থেকে আমি মুতাযিলা মতবাদ বর্জন করলাম। অতঃপর তিনি বাগদাদে শিক্ষা লাভ করে হাদীস ও ফিকায় দক্ষতা অর্জন করেন এবং মুতাযিলাবাদের বিরুদ্ধে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। শাফেঈপন্থিগণ তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন। শত শত নয়, হাজার হাজার ওলামা তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে বিখ্যাত কয়েকজন শিষ্যের নাম হলো আবু সাহাল সালয়ূকী, আবু বকর কাফ্ফাল, আবু যাইদ মারওয়াযী, যাহির ইবনে আহমদ, হাফিজ আবু বকর জুরজানী, শেখ আবু মোহাম্মদ তাবারী, আবু আবদুল্লাহ তায়ী, আবুল হাসান বাহিলী। এঁদের খ্যাতি অবশ্য কম ছিল না। কিন্তু এঁদের শিষ্য আবু বকর বাকিল্লানী, আবু ইসহাক ইসফারায়েনী, আবু বকর ইবনে ফুরাক এবং শিষ্যের শিষ্য ইমামুল

হারামাইন প্রমুখ আরো বেশী খ্যাতি অর্জন করেন। এঁদের শ্রেষ্ঠত্ব এবং প্রভাবের দরুন ইমাম আশয়ারীর রচনাবলী সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। এঁদের প্রণীত ইলমে কালাম বিশ্বজনীন ইলমে কালামে পরিণত হয়।

ইমাম আশয়ারী-পূর্ব যুগে ইলমে কালামে দর্শনের আমেজ ছিল না। আল্লামা বাকিল্লানী এতে কয়েকটি নতুন দার্শনিক বিষয় প্রবর্তন করেন। যেমন, অবিভাজ্য পরমাণুর মতবাদ বাস্তব সত্য, শূন্যাকাশের অস্তিত্ব অসম্ভব কিছু নয়; একটি পরমূর্ত পদার্থ অপর একটি পরমূর্ত পদার্থের সাহায্যে অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না; পরমূর্ত পদার্থ দু'বার অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। বাকিল্লানীর পর ইমামুল হারামাইন (ইমাম গাযালীর শিক্ষক) ইলমে কালাম বিষয়ে একটি বৃহদাকার গ্রন্থ রচনা করেন। অতঃপর তিনি তাঁর সারমর্ম নিয়ে 'ইরশাদ' নামে অপর একটি সারগ্রন্থ প্রস্তুত করেন। ইমামুল হারামাইন ছিলেন সে সময়কার 'শাইখুল ইসলাম' অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের বিশেষজ্ঞ। ইরাক থেকে আরব পর্যন্ত সব জায়গায় তাঁর ফতোয়া সমর্থন লাভ করে। তাঁর রচনাবলী ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে।

এ যাবত মুহাদ্দিস ও ফকীহ্দের মধ্যে যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনের মোটেই রেওয়াজ ছিল না। এজন্য ইলমে কালাম শুধু মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত বেদাতপন্থীদের (মুবতাদে) মতবাদ খণ্ডনেই ব্যবহৃত হতো। বিধর্মীদের চিন্তাধারা খণ্ডনে যা কিছু লেখা হতো, তা প্রমাণসম্মত করার জন্য কেবল ঐশীবাণীভিত্তিক পরম্পরাগত যুক্তি প্রয়োগ করা হতো। ইমাম গাযালী 'আল মুনকিয্-মিনাদ্-দালাল্' নামক গ্রন্থে বলেন:

অতঃপর আমি ইলমে কালাম দেখতে আরম্ভ করলাম; তা শিখলাম এবং বুঝলাম। গবেষকদের (মুহাক্কিকীন) গ্রন্থাবলীও পাঠ করলাম এবং নিজেও যা রচনা করার ছিল, করলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভেবে দেখলাম, এই ইলমে কালাম আমার উদ্দেশ্যের জন্য যথেষ্ট নয়। কারণ এই ইলমে কালামের একমাত্র লক্ষ্য হলো 'আহলে সুন্নাত্ জামাতের' আকিদাকে বেদাতপন্থীদের হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা করা। এই ইলমে কালাম সে সব লোকের সাথে লড়ার

জন্য যথেষ্ট নয়, যারা স্বতঃসিদ্ধ সত্য (বাদহিয়াত) ছাড়া অন্য কোন বস্তুতে বিশ্বাসী নয়।

যাক, ইলমে কালামের বিরাট গ্রন্থ-সম্পদ প্রস্তুত হলো। ইমাম আবুল হাসান আশয়ারী এর প্রতিষ্ঠাতারূপে আখ্যায়িত হন। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে 'মাকালাতুলইসলামীইন' আমি নিজেই দেখেছি। ইবনুল-কাইয়েম 'ইজ্‌তিমাউল্‌-জুয়ুশিল-ইসলামিয়া' নামক গ্রন্থে কিতাবুল ইবানাহ্‌ ইত্যাদি গ্রন্থের ভাষা হুবহু উদ্ধৃত করেন। এসব গ্রন্থে আহলে সুন্নাত জমাতের' যে আকিদা ফুটে উঠে, ইমাম গাযালী তাঁর 'ইহ্‌ইয়াউল উলুম' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় তা 'কাওয়াইদুল আকাইদ' (ধর্মীয় বিশ্বাস নীতি) শিরোনামায় সন্নিবিষ্ট করেন। ইমাম গাযালীর পর ইমাম রাযী এসব বিষয়ের উপর পরিষ্কাররূপে আলোকপাত করেন। এর পর সকলেই তাঁর অনুসরণ করেন।

ইলমে কালামের বড় বড় বিষয় এবং আশয়ারীদের মতে, যে সব নীতি আহলে সুন্নাত এবং মুতাযিলীদের মধ্যে ব্যবধানের সৃষ্টি করে, সেগুলো ইমাম গাযালী, রাযী ও আবুল হাসান আশয়ারীর ভাষায় বর্ণনা করছি ঃ

১. আল্লাহ্ মানুষকে তার শক্তি বহির্ভূত কাজের প্রতিও আদেশ দিতে পারেন। এটা তাঁর জন্য বৈধ। মুতাযিলিগণ এ মতের বিরোধী।

২. কোন গুণাহ্ ছাড়াই আল্লাহ মানুষকে শাস্তি দিতে পারেন বা পুণ্য ছাড়াই প্রতিদান দিতে পারেন—এ অধিকার তাঁর রয়েছে। মুতাযিলাপন্থী এ মতের বিরোধী।

৩. আল্লাহ্ আপন বান্দাদের প্রতি যা ইচ্ছা, তাই করতে পারেন। যা করা মানুষের জন্য অভিপ্রেত, তা করা আল্লাহ্‌র পক্ষে অবশ্য কর্তব্য নয়।

৪. শরীয়তের মাধ্যমে আল্লাহ্‌কে চেনা অবশ্য কর্তব্য ; বুদ্ধির মাধ্যমে নয়। মুতাযিলী এ মতের বিরোধী।

৫. মিযান অর্থাৎ দাড়ি পাল্লা সত্য। আল্লাহ্ তায়ালা বান্দাদের আমলনামায় লিখিত পাপ পুণ্যের ওজন করবেন।

এ সব আকাইদ ইমাম গাযালী তাঁর 'ইহইয়াউল উলুম' গ্রন্থে বর্ণনা করেন এবং উল্লেখিত ভাষাতেই বর্ণনা করেন।

'নুবুওয়াতে সন্দেহ'—এ শিরোনামায় ইমাম রাযী তাঁর 'মাতালিবে আলিয়া' নামক গ্রন্থে বলেন ঃ

৬. আমাদের সহযোগিগণ (আশায়েরা) বলেন, কুরআনের আয়াতে এটা প্রতীয়মান হয় যে, ধর্ম এবং দুনিয়ার সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখা আল্লাহর জন্য অবশ্য কর্তব্য নয়।

৭. জীবন সঞ্চারের জন্য শরীরের প্রয়োজন নেই। যেমন, আগুনকেও আল্লাহ বুদ্ধি, জীবন এবং বাক শক্তি প্রদান করতে পারেন। মুতাযিলী এ মতের বিরোধী।

৮. এমনও সম্ভব হতে পারে, আমাদের সামনে উঁচু পাহাড় রয়েছে এবং প্রকট আওয়াজও সেদিক থেকে আসছে, অথচ আমরা কেউ দেখছি না এবং শুনছিও না। আবার এমনও সম্ভব যে, একজন অন্ধ প্রাচ্যে উপবিষ্ট রয়েছে এবং পশ্চিমা দেশে সে একটি মশা দেখতে পাচ্ছে। সংক্ষিপ্ত কথা হলো, ইমাম আশ্য়ারী প্রকৃতি এবং ইন্দ্রিয়ের ধরাবাঁধা নিয়ম ও ক্ষমতা মেনে নিতে অস্বীকার করেন।

**তফসীর-এ কবীর-এর হারুত-মারুতের কিস্‌সায় আছে ঃ**

৯. আহলে সুন্নাতের মতে, একজন যাদুকর বাতাসে উড়তে পারে। সে মানুষকে গাধায় এবং গাধাকে মানুষে পরিণত করতে পারে।

১০. মানুষের কর্মে তার নিজস্ব ক্ষমতার কোন ভূমিকা নেই।

১১. কাফেরের 'কুফর' এবং গুণাহগারের 'গুনাহ' আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারেই সংঘটিত হয়।

যে কোন আকাইদ গ্রন্থে এই আকিদাগুলোর উল্লেখ রয়েছে।

এ আকিদাগুলো আশায়েরার মধ্যে সীমাবদ্ধ। এ ছাড়া তাদের আরো অনেক বিশেষ বিশেষ আকিদা রয়েছে। ইমাম গাযালী 'ইহইয়াউল উলুম' গ্রন্থের প্রারম্ভে একবার সেগুলো সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেন। পরে বিস্তারিত বিবরণ দেন।

আমি এখানে 'ইহইয়াউল উলুম' থেকে সেগুলোর উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ

# প্রথম স্তম্ভ

## আল্লাহর সত্তা

আল্লাহর সত্তা সম্বন্ধীয় দশটি মৌলিক নীতি : (১) আল্লাহ বিদ্যমান (২) একক (৩) চিরন্তন (৪) মূর্ত নন (৫) শরীরী নন (৬) পরমূর্ত নন (৭) সর্বদিকের উর্ধ্বে (৮) পাত্রের উর্ধ্বে (৯) দর্শনীয় (১০) চিরস্থায়ী।

# দ্বিতীয় স্তম্ভ

## আল্লাহ্র গুণাবলী

গুণাবলী সম্পর্কীয় দশটি মৌলিক নীতি : (১) আল্লাহ জীবিত (২) জ্ঞাত (৩) ক্ষমতাশীল (৪) ইচ্ছার অধিকারী (৫) শ্রবণকারী (৬) চক্ষুষ্মান (৭) বাক্‌শীল (৮) অবিনশ্বর (৯) তাঁর বাণী চিরন্তন (১০) জ্ঞানী ও ইচ্ছাময়।

# তৃতীয় স্তম্ভ

## আল্লাহ্র কর্ম

এ সম্পর্কীয় দশটি মৌলিক নীতি :

(১) আল্লাহ মানুষের সমস্ত কর্মের স্রষ্টা। (২) মানুষের কর্ম-ফল নিজেদেরই অর্জিত। (৩) আল্লাহর ইচ্ছানুসারে মানুষ সব কর্ম সম্পন্ন করে। (৪) যে কোন সৃষ্টি আল্লাহর দয়ার উপর নির্ভরশীল। (৫) মানুষকে তার শক্তি বহির্ভূত কর্মের প্রতি আদেশ করা আল্লাহর পক্ষে বৈধ। (৬) নিষ্পাপকে শাস্তি দেয়া আল্লাহর পক্ষে বৈধ। (৭) সৃষ্টিকুলের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখা আল্লাহর জন্য জরুরী নয় (৮) কেবল সে আদেশই অবশ্য করণীয়, যা শরীয়তের পক্ষ থেকে তদরূপ বলে সাব্যস্ত। (৯) নবীদের প্রেরণ আল্লাহর জন্য অসম্ভব কিছু নয়। (১০) মোহাম্মদ রসূলুল্লার নুবুওয়াত মুজিযা প্রতিষ্ঠিত।

## চতুর্থ স্তম্ভ
## ওহীভিত্তিক প্রমাণে বিশ্বাস্য বিষয়

এ সম্পর্কীয় দশটি মৌলিক নীতি ঃ

(১) কিয়ামত (২) মুন্‌কির নকীর (৩) কবরের শাস্তি (৪) রোজকিয়ামতের দাড়িপাল্লা (৫) পুলসিরাত (৬) বেহেশ্‌ত্‌-দোযখের অস্তিত্ব (৭) ইমামত সম্বন্ধীয় নির্দেশ (৮) খেলাফতের ক্রমানুসারে সাহাবীদের শ্রেষ্ঠত্ব (৯) ইমামতের শর্তাবলী (১০) নির্ধরিত ইমামের অনুপস্থিতিতে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সুলতানের নির্দেশ।

ইমাম আশয়ারী এমন কতগুলো বিশেষ আকিদা প্রবর্তন করেন, যা 'সুন্নাতবাদ'কে মুতাযিলাবাদ থেকে স্বতন্ত্র করে দেয়। এ আকিদা-গুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ, এসবকে নিয়েই ইলমে কালামের এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হয়। ইমাম আশয়ারীর পূর্বে মুতাকাল্লিমদের দুটি সম্প্রদায় ছিল ঃ ওহীবাদী (আরবাব-ই-নক্‌ল) এবং বুদ্ধিবাদী (আরবাব–ই-আক্‌ল)। ইমাম আশয়ারী মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন। তিনি যে সব আকিদা অবলম্বন করেন, তা ছিল বুদ্ধি এবং ওহীভিত্তিক মতবাদের এক সুসমঞ্জস রূপ। তিনি ওহীভিত্তিক চিন্তাধারার মধ্য দিয়ে তাঁর বিশেষ মতবাদে কি ভাবে উত্তীর্ণ হলেন, তা দু'একটি উদাহরণের মাধ্যমে বুঝাতে চেষ্টা করছি।

১. ওহীবাদিগণ আল্লাহ্‌র সাক্ষাতলাভে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু দার্শনিক ও মুতাযিলিগণ তা অস্বীকার করেন। ওহীবাদিগণ কেবল আল্লাহ্‌র সাক্ষাত লাভেই বিশ্বাসী ছিলেন না, তাঁরা এটাও মনে করতেন যে, আল্লাহ তাঁর আরশে আসীন রয়েছেন। তিনি কোন একটি দিক জুড়ে রয়েছেন। তাঁর প্রতি ইঙ্গিতও করা যায়। ইমাম আশয়ারী দার্শনিক এবং মুতাযিলীদের মতবাদ সমর্থন না করে ওহীবাদীদের আকিদাই অবলম্বন করেন। কিন্তু আল্লাহ কোন একটি স্থান জুড়ে রয়েছেন এবং তাঁর প্রতি ইঙ্গিতও করা যায়—এসবের প্রতি তিনি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারলেন না। কারণ, বুদ্ধিভিত্তিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত হওয়ার ফলে তিনি এতটুকু অনুধাবন করতে সক্ষম হন যে, আল্লাহ কোন নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত নন এবং তাঁর প্রতি ইঙ্গিত করাও সম্ভব নয়। কেননা, এসব হলো নশ্বরতার বৈশিষ্ট্য। অথচ আল্লাহ নশ্বর নন।

এ মতবাদ অবলম্বনের ফলে ইমাম আশয়ারীর জন্য অন্য একটি সমস্যার উদ্ভব হয়। তা হলো, আল্লাহ্ যদি কোন বিশেষ স্থান জুড়ে না থাকেন, তবে তিনি দর্শনযোগ্যও হতে পারেন না। কারণ, যা স্থান অধিকার করে না, তা দেখাও যায় না। বাধ্য হয়ে ইমাম আশয়ারীকে মানতে হলো যে, কোন বস্তুর দৃষ্টিগোচর হবার জন্য তার কোন স্থানে অবস্থান করা বা ইঙ্গিতযোগ্য হবার প্রয়োজন নেই। ধীরে ধীরে ইমাম আশয়ারীকে বিতর্ক বিদ্যার সমস্ত নীতি বিসর্জন করতে হলো।

'শরহে মাওয়াকিফ্' গ্রন্থে আছে ঃ

আশায়েরার মতে, কোন বস্তু সমক্ষে না থাকলেও তা গোচরীভূত হতে পারে।

তৃতীয় সমস্যা এই দাঁড়ালো যে, আল্লাহ যদি দর্শনীয় হন, তবে সর্বক্ষণ তাঁর গোচরীভূত হওয়া উচিত। কারণ, তাঁর বিদ্যমানতাই যদি দর্শনের জন্য যথেষ্ট হয়, তবে কিয়ামত পর্যন্ত কেনইবা এর জন্য অপেক্ষা করতে হবে? তাই বাধ্য হয়ে ইমাম আশয়ারীকে এটাও বলতে হলো যে, কোন বস্তুর গোচরীভূত হবার সমস্ত শর্ত পাওয়া গেলেও তার অদৃশ্য হবার সম্ভাবনা থাকে।

'শরহে মাওয়াকিফ' গ্রন্থে আছে ঃ

আটটি শর্ত পুরোপুরি পাওয়া গেলেও আমরা এটা বলতে পারি না যে, সে বস্তু গোচরীভূত হবেই।

(২) ওহীবাদিগণ সাধারণ্যে মুজিযার সমর্থক ছিলেন। তাঁরা হেতুবাদ তো অস্বীকার করতেন না, তবে বলতেন, মুজিযার বেলায় আল্লাহ 'কার্য-কারণ, সম্বন্ধ শিথিল করে দেন। ইমাম আশয়ারী এতটুকু নিশ্চয়ই জানতেন যে, কারণ যা হয়, কার্য তার বিপরীত হতে পারেনা। তাই তিনি 'কার্যকারণ, সম্বন্ধকেই অস্বীকার করলেন। মোট কথা, এভাবে ধীরে ধীরে উপরোক্ত সমস্ত আকাইদের সৃষ্টি হয়। ইমাম গাযালীর পূর্বেই ইলমে কালামের কাঠামো পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে যায়।

এ ছিল আশায়েরাবাদী ইলমে কালামের প্রথম পর্যায়। দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হয় ইমাম গাযালীর পরশ লেগে। তিনি ইলমে কালামের রূপরেখাই বদলে দেন।

## ইমাম গাযালীর বৈশিষ্ট্য :

আমি ইমাম গাযালীর স্বতন্ত্র জীবনচরিত রচনা করেছি। তাতে তাঁর প্রণীত ইলমে কালাম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় সংক্ষেপে বলছি :

১. ইমাম সাহেবই সর্বপ্রথম দর্শনের ভ্রম সংশোধনে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন।

২. এ যাবত ফকীহ্ এবং মুহাদ্দিসগণ যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনকে অবজ্ঞার চোখে দেখতেন। এজন্য প্রথম থেকেই এ বিষয়টি পাঠ্য-তালিকাভুক্ত ছিল না। ইমাম সাহেব ঘোষণা করলেন, যুক্তিবিদ্যা শিক্ষা করা 'ফরযে কেফায়া'। দর্শন সম্পর্কে তিনি পরিষ্কার ভাষায় বললেন, গুটিকতক বিষয় ব্যতীত এতে ধর্মবিরোধী কিছুই নেই।

৩. ইমাম সাহেবের বদৌলতেই দর্শন জনপ্রিয়তা লাভ করে। দর্শন এবং ধর্মশিক্ষা পাশাপাশি চলতে আরম্ভ করে। এ শিক্ষা-পদ্ধতিই ইমাম রাযী, শাইখুল ইশরাক, আল্লামা আমুদী, আবদুল করীম শহরিস্তানীর মত লোক সৃষ্টি করে। এঁরা ছিলেন বুদ্ধিভিত্তিক এবং ওহীভিত্তিক এই দ্বিমুখী জ্ঞানের শিরোমণি।

৪. ইমাম সাহেব প্রথমত আশায়েরাবাদের সহায়তা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এ পন্থা অবশ্য সর্বসাধারণের জন্য ভাল। কিন্তু তা গূঢ়তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এতে সত্যিকার সান্ত্বনাও লাভ করা যায় না।

৫. এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই ইমাম সাহেব আশ্'য়ারীপন্থা ডিঙ্গিয়ে আকাইদ বিষয়ে স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা দেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি যে সব গ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে কয়েকটি এই : জাওয়াহিরুল্ কুরআন, মুনকিয্ মিনাদ্-দালাল্, মাযনূন—ই-সগির ও কবির, মায়ারিজুল কুদ্স্, মিশকাতুল আনওয়ার।

৬. ইমাম সাহেবের মতে, শরীয়তের গূঢ় তত্ত্ব সর্বসাধারণের নিকট প্রকাশ করা উচিত নয়। এজন্য তিনি তাঁর সে সব গ্রন্থই সর্ব সাধারণ্যে প্রচার করেন, যা আশায়েরার ধর্মীয় বিশ্বাস মোতাবেক ছিল। কিন্তু যে সব গ্রন্থ তিনি আপন রুচি মাফিক রচনা করেন, সে সম্পর্কে তিনি তাগিদ করেন যে, সেগুলো যেন সাধারণ্যে প্রচার করা না হয়।

৭. ফলে ইমাম সাহেবকে সাধারণত আশায়েরাবাদী বলেই পরিগণিত করা হয়। তাঁর স্বাতন্ত্র্য ধর্মী রচনাবলী ভাল করে প্রচারিত হয়নি বলেই প্রাচীন ইলমে কালাম বিশেষ কোন পরিবর্তন সাধিত হয়নি। একমাত্র পরিবর্তন হলো এই যে, তাঁর প্রভাবে ইলমে কালামে দর্শন স্থান লাভ করে।

৮. ইমাম গাযালীর পর আল্লামা মোহাম্মদ ইবনে আবদুল করীম এই পন্থা অবলম্বন করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তাই জাতি তাঁকে 'আফযল' (বড় জ্ঞানী) খেতাবে ভূষিত করেন।

## শহ্‌রিস্তানী

আল্লামা মোহাম্মদ শহ্‌রিস্তানী হিজরী ৪৭৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আহমদ ইবনে খাওয়াফীর নিকট ফিক্‌হ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ফিক্‌হ্‌ নীতি (উসুল-এ-ফিকাহ্‌) শিক্ষা করেন বিখ্যাত সূফী আবুল কাসিম কুশায়রীর নিকট। ইলমে কালামে দক্ষতা অর্জন করেন আবুল কাসিম আনসারীর শিষ্যত্বে। হিজরী ৫১০ সালে তিনি বাগদাদে গমন করেন এবং সেখানে তিন বছর কাল অবস্থান করেন। সেখানে তাঁর প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করা হয়। তাঁর ওয়ায-নসিহতে কেবল বিশিষ্ট লোকেরাই নয়, জনসাধারণও প্রভাবান্বিত হয়।

আল্লামা মোহাম্মদ শহরিস্তানী হাদীস বিদ্যায়ও দক্ষতা অর্জন করেন। বিখ্যাত মুহাদ্দিস সাময়ানী তাঁরই শিষ্য। ইলমে কালাম বিষয়ে শহ্‌রিস্তানীর কয়েকটি গ্রন্থ রয়েছে। যেমন, 'নিহাইয়াতুল্‌ ইকদাম-ফি-ইলমিল্‌-কালাম,' 'আলমানা হিজু-অল-বায়ান,' কিতাবুল-মুযারায়াহ্‌,' 'তালখিসুল-আকসাম-লি-মাযাহিবিল্‌-আনাম। কিন্তু যে গ্রন্থটি সবচাইতে বেশী খ্যাতি অর্জন করে, তা হলো—'মিলাল-ও-নিহাল'। গ্রন্থটি দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে বিভিন্ন মুসলিম সম্প্রদায় সৃষ্টির কারণ এবং তাদের ক্রমোন্নতির ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হয়। এর সঙ্গে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং ধর্মীয় বিষয়াদি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। দ্বিতীয় ভাগে অন্যান্য সকল ধর্মের ইতিহাস লিখেন এবং বিশেষ করে গ্রীক দার্শনিকদের ইতিবৃত্ত বিশদ-ভাবে তুলে ধরেন। তিনি এ গ্রন্থে গ্রীক দার্শনিকদের বিবরণ বিস্তারিত-ভাবে পেশ করেন। তিনি প্রত্যেক গ্রীক দার্শনিকের দর্শন এত সুচারু-

রূপে এবং নিখুঁতভাবে আলোচনা করেন যে, সে সম্পর্কে ভাবলে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। ইউরোপবাসী গ্রন্থটিকে বিশেষ সম্মানের চোখে দেখে। গ্রন্থটি ফরাসী ভাষায় অনূদিত হয় এবং মূল আরবী ভাষ্য সহকারে মুদ্রিত হয়।

আল্লামা মোহাম্মদ শহরিস্তানী যদিও একজন ধর্মপ্রচারক, মুহাদ্দিস এবং ফকীহ্ ছিলেন, কিন্তু দর্শনে তাঁর খ্যাতি ছিল সমধিক। তাই তিনিও অভিযোগের হামলা থেকে রেহাই পাননি। আল্লামা সাময়ানী 'তাবাকাতুশ্ শাফিইয়াহ্' নামক গ্রন্থে বলেন, তাঁকে নাস্তিক বলেও ধারণা করা হতো।

কাফী নামক গ্রন্থের রচয়িতা বলেন, যদি তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাসে গড়বড় না থাকতো এবং তিনি ধর্মহীনতার দিকে ঝুকে না পড়তেন, তবে ইসলামের ইমাম বলে পরিবিদিত হতেন।

মুহাদ্দিস ইবনে সাব্‌কী শহরিস্তানী সম্পর্কে লোকদের এই ধারণাকে বিস্ময়ের চোখে দেখেন। কেননা তাঁর রচনাবলীতে এ ধারণার সমর্থন মেলে না। ইবনে সাবকীর মতে, কেউ হয়তো আল্লামা সাময়ানীর গ্রন্থে এ কথাগুলো পরে সংযুক্ত করে দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটি তাই।

## ইমাম রাযী

শহরিস্তানীর পর ইলমে কালামের মুকুট ইমাম ফখরুদ্দীন রাযীর শিরে বিরাজ করে। ইমাম সাহেবের নাম মোহাম্মদ ইবনে ওমর। হিজরী ৫৪৪ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ছোট বেলায় পিতার নিকট শিক্ষা লাভ করেন। কামাল সাম্‌য়ানীর নিকট ফিক্‌হ্ অধ্যয়ন করেন। ফিক্‌হ্ হাসিলের পর যুক্তিবিদ্যার দিকে ঝুঁকে পড়েন। সে যুগে মাজদুদ্দীন জীলি যুক্তিবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি ইমাম রাযীর জন্মভূমি রায় নামক স্থানে অবস্থানরত ছিলেন। ইমাম রাযী তাঁর নিকট যুক্তিবিদ্যা পড়তে আরম্ভ করেন। কিন্তু কিছুদিন পর মাজদুদ্দীনকে শিক্ষকতা করার জন্য মারাগায় আমন্ত্রণ করা হয়। ইমাম সাহেবও তাঁর সাথে গমন করেন এবং বেশ কিছুকাল তাঁর নিকট দর্শন এবং ইলমে কালাম শিক্ষা করেন। রায় শহরে শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি খাওয়ারাযম গমন করেন। আকাইদ বিষয়ে

সেখানকার ওলামার সাথে তাঁর বিতর্ক হয়। ফলে, লোকেরা তাঁর বিরোধী হয়ে উঠে। তিনি খাওয়ারাযম ত্যাগ করতে বাধ্য হন। খাওয়ারাযম ত্যাগ করে তিনি মা-ওরাউন্‌নাহার নামক স্থানে উপনীত হন। সেখানেও তাঁর এই দশা ঘটে। বাধ্য হয়ে তিনি স্বদেশে ফিরে আসেন। এখানে একজন অর্থশালী ব্যবসায়ীর সাথে ইমাম সাহেবের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠে। তিনি ইমাম সাহেবের ছেলেদের সাথে আপন মেয়েদের বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ করেন। কিছুদিন পর সেই ব্যবসায়ী মারা যান। তাঁর পুত্র সন্তান ছিল না বলে সমস্ত ধন সম্পদ ইমাম রাযীর করায়ত্ত হয়।

ইমাম সাহেব ছিলেন রিক্ত হস্ত। কিন্তু হঠাৎ তিনি এত সঙ্গতিসম্পন্ন হয়ে উঠলেন যে, ভারত বিজয়ী শিহাবুদ্দীন গোরীও তাঁর নিকট থেকে ধারস্বরূপ মোটা অংক গ্রহণ করেন। ঋণ পরিশোধের সময় গোরী অতিরিক্ত অর্থ দিয়ে ইমাম রাযীকে প্রসন্ন করেন। আর্থিক উন্নতির সাথে সাথে ইমাম রাযীর জ্ঞান গৌরবও বৃদ্ধি পায়। সে সময়কার বাদশাগণ তাঁর সকাশে গমন করা গৌরবের বস্তু বলে মনে করতেন। মোহাম্মদ ইবনে তাকাশ্ খাওয়ারাযম শাহ ছিলেন সে সময়কার সবচাইতে বড় শাসনকর্তা। তিনি খোরাসান, মা-ওরাউননাহার, কাশগড় এবং ইরাকের অধিকাংশ জয় করেন। তিনি প্রায় সময় ইমাম রাযীর দরবারে হাযির হতেন।

একবার তিনি হেরাত গমন করেন। সেখানকার শাসনকর্তা হোসাইন খুর্‌রামিন তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্য বেরিয়ে আসেন এবং গভীর শ্রদ্ধা সহকারে তাঁকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যান। অতঃপর এক মহতী সভার আয়োজন করা হয়। তাতে সমস্ত ওলামা, ওমারা এবং অন্যান্য লোকজন উপস্থিত ছিলেন। ইমাম সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তাঁর ডানে-বামে দাঁড়ানো ছিল তলোয়ার উঁচানো সারি সারি তুর্কী তরুণ। তারা ইমাম সাহেবের খরিদা গোলাম ছিল। তারা সব সময় ইমাম সাহেবের পাশেই থাকতো।

আসর যখন পুরোদমে জমলো, তখন হেরাতের শাসনকর্তা হোসাইন শাহ আবির্ভূত হন এবং ইমাম সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। ইমাম সাহেব তাঁকে আপন পাশে বসালেন। একটু পর শিহাবুদ্দীন গোরীর ভাগনে সুলতান মাহমুদও এসে উপস্থিত হন। ইমাম

সাহেব তাঁকে অপর পাশে স্থান দিলেন। লোকজন জমায়েত হলে ইমাম সাহেব আত্মার মাহাত্ম্য সম্পর্কে একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ দেন। দৈবক্রমে তাঁর ভাষণদানকালে একটি কবুতর ঠিক ইমাম সাহেবের সামনে এসে পতিত হয়। কবুতরটির উপর একটি বাজ হামলা করেছিল। বাজপাখিটি লোকের ভিড় দেখে অন্য দিকে পালিয়ে গেল এবং কবুতরটি প্রাণে রক্ষা পেল। সভায় শরফুদ্দীন নামক একজন কবিও উপস্থিত ছিলেন। তিনি ইমাম সাহেবের প্রতি লক্ষ্য করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিম্নের চরণ দু'টি আবৃত্তি করলেন। চরণ দু'টি ছিল সময়োপযোগী :

কবুতরকে কে শেখালো যে এটা আপনার আস্তানা নয় বরং হরম শরীফ্! আপনি হলেন ভীত সন্ত্রস্তের আশ্রয়!

ইমাম সাহেব স্বতঃস্ফূর্ত চরণ দু'টি শুনে খুবই আনন্দিত হন। তিনি কবিকে পাশে এনে বসালেন এবং সভাশেষে পোশাক পরিচ্ছদ এবং অনেক অর্থ দিয়ে পুরস্কৃত করেন।

ইমাম সাহেব প্রায়ই হেরাতের রাজপ্রাসাদে অবস্থান করতেন। রাজপ্রাসাদের ইমারতটি হরেক রকম সাজ সরঞ্জামে সজ্জিত থাকতো। খাওয়ারযম শাহ্ তাঁকে এ ভবনটি দান করেন।

এ ছিল তাঁর সামাজিক মান মর্যাদা। একজন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীরূপেও তিনি ছিলেন গভীর শ্রদ্ধার অধিকারী। দূর দূরান্ত থেকে বিভিন্ন মুসলিম দেশের বহু লোক তাঁর কাছে আসতো এবং জ্ঞানবিজ্ঞান-বিষয়ক বহু সমস্যা সমাধান করে নিতো। তিনি যখন সোয়ার হতেন, তখন দুই শতাধিক আলিম ও ভক্ত তাঁর সোয়ারীর আশেপাশে থাকতেন।

ইমাম সাহেবের শারীরিক গঠন: মাঝারি গড়ন, দোহারা শরীর, প্রশস্ত বক্ষ, ঘন দাঁড়ি, কণ্ঠস্বর উচ্চ ও হৃদয়গ্রাহী এবং প্রতাপ-মণ্ডিত চেহারা।

৬০৬ সালের শওয়াল মাসে রোজ রবিবার তিনি ইন্তেকাল করেন।

তিনি কেবল তফসীর, উসূল, ও ফিক্‌হ শাস্ত্রেরই নয়, দর্শন এবং যুক্তিবিদ্যারও ইমাম ছিলেন।

তাঁর মৃত্যুর পর এ যাবত কেউ তাঁর সমকক্ষ পয়দা হয়নি। তিনি দর্শনের জটিল বিষয়াদিকে এত সহজভাবে তুলে ধরেছেন যে, তা প্ল্যাটো এবং অ্যারিস্টটলকেও হার মানিয়ে দিয়েছে। এ বিষয়ে প্রাচীন কোন আলিমও তাঁর সমকক্ষ হওয়ার দাবী করতে পারেন না।

আমার পক্ষে তাঁর জ্ঞান-বিজ্ঞানে দক্ষতার পূর্ণ বিবরণ দেয়া সম্ভব নয়। শুধু তাঁর ইলমে কালাম সম্বন্ধীয় কৃতিত্ব বর্ণনা করেই আমি ক্ষান্ত করছি।

## ইলমে কালামে ইমাম রাযীর কৃতিত্ব

১. ইলমে কালামে তাঁর সবচাইতে বড় কৃতিত্ব হলো দর্শনের ভ্রম খণ্ডন। তিনি দর্শনের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উত্থাপন করেন এবং তীক্ষ্ণ মেধার চোখা তীরে দর্শন-দেহকে ক্ষত-বিক্ষত করেন। প্রবল ভাবাবেগ এবং বিরোধিতার উচ্ছ্বাসে তিনি এটাও পার্থক্য করতে পারেন নি যে, দর্শনে কোন্ বিষয়টি প্রয়োজনীয়, আর কোন্টি অপ্রয়োজনীয়। দর্শনে এমন শত শত বিষয় রয়েছে, যা বাস্তব সত্য এবং যা ধর্ম বিরোধীও নয়। এমন সব বিষয়ও ইমাম রাযীর হাত থেকে রেহাই পায়নি। দর্শনে এমন কতগুলো ব্যাপার আছে, যেমন আল্লাহ্র অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করা, আল্লাহ্র একত্ববাদ প্রমাণ করা—এ সবের প্রতি অভিযোগ আনাই সম্ভব ছিল না। তা সত্ত্বেও ইমাম রাযী হস্তক্ষেপ না করে ছাড়লেন না। তিনি বললেন, বিষয়গুলো বাস্তব সত্য হলেও এ সম্পর্কে দার্শনিকদের যে সব প্রমাণ রয়েছে, তা শুদ্ধ নয়। এসব ক্ষেত্রে মুহাক্কিক্ তুসী, বাকের দামাদ প্রমুখ দর্শনের পক্ষই সমর্থন করেন। ইমাম সাহেব সারা বিশ্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে কিভাবে সফলকাম হতে পারেন? তথাপি বলতে হয় যে, তিনি দর্শনের উপর অভিযোগের যে পাথর-বৃষ্টি বর্ষণ করেন, তা এর ভিতরকে নড়বড়ে করে দেয়। ইমাম সাহেব এবং মুহাক্কিক তুসীর মধ্যকার বিরোধ নিরসনের জন্য আল্লামা কুতবুদ্দীন রাযী একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থে তিনি ইমাম রাযী উত্থাপিত বহু অভিযোগের উত্তর দিতে পারেন নি।

২. ইমাম সাহেব সর্বপ্রথম দর্শন পদ্ধতি অবলম্বন করে ইলমে কালাম রচনা করেন। তিনি দর্শনের শত শত বিষয়কে ইলমে কালামে

সন্নিবিষ্ট করেন। পরবর্তী যুগের লোকেরা ইলমে কালামকে ক্রমাগত পূর্ণাঙ্গ দর্শনে পরিণত করে।

৩. ইমাম সাহেব ইলমে কালাম সম্পর্কে যে সব গ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে কয়েকটি হলো এইঃ মাতালিবে আলিয়া, নিহাইয়াতুল্-উকুল্, আরবাঈন-ফি-উসুলিদ্দীন, মুহাস্সাল, আল বায়ান-অল-বুরহান, মাবাহিসু ইমাদিয়াহ্, তাহ্যিবুদ্ দালাইল, তাসিসুত্ তাকদিস, ইরশাদুর নায্যার-ইলা-লাতাইফিল আস্সার, আজওয়াবাতুল মাসাইলিল্ বুখারিয়াহ্, তাহসিলুল হক, যুবদাহ্, লাওয়ামিউল-বাইয়েনাত-ফি-শরহে আসমাইল্লাহে অস্ সিফাত্, কিতাবুল কাযা অল-কদর, তা'জিযুল ফালাসিফাহ্, ইসমাতুল্ আম্বিয়া, কিতাবুল খালকে-অল-বায়াস্, খামসিনা-ফি-উসুলিদ্দীন।

এগুলোর মধ্যে প্রথম তিনটি আমি পড়েছি। তিনি যেসব গ্রন্থে দর্শনের ভ্রম প্রতিপাদন করেন, যেমন শর্হে-ইশারাত, মাবাহিসে মাশ্রিকিয়াহ—সেগুলোকে এক হিসেবে ইলমে কালামের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

৪. ইমাম সাহেবের ইলমে কালাম কায়েম ছিল আশায়েরা আকাইদের উপর ভিত্তি করে। তিনি এত জোরেশোরে ইলমে কালাম সমর্থন করেন যে, আশয়ারীদের যে সব বিষয় ব্যাখ্যার (তাবীল) অপেক্ষা রাখতো, সেগুলোতেও তিনি ব্যাখ্যার আশ্রয় নেন নি। বরং প্রচুর যুক্তি দিয়ে সেগুলোর যথার্থতা প্রমাণ করেন। যেমন, আশায়েরা এ মত্ পোষণ করেন যে, মানুষ আপন কর্মে সক্রিয় ক্ষমতার অধিকারী নয়। তথাপি তাঁরা অদৃষ্টবাদ ও অক্ষমতাবাদ থেকে রেহাই পাবার জন্য মানুষের অর্জন ক্ষমতার অধিকার স্বীকার করে নেন। কিন্তু ইমাম রাযী এই অর্জন অধিকারও বর্জন করেন। তিনি পরিষ্কার ভাষায় মানুষের অক্ষমতার অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি 'তফসীর-এ-কবীর' এর বিভিন্ন স্থানে যুক্তি দিয়ে তাঁর দাবী প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন। তিনি যুক্তি দিয়ে আরো প্রমাণ করতে চান যে, আল্লাহ্র প্রত্যেকটি কাজ মঙ্গলময় ও কল্যাণকর হওয়া জরুরী নয়; ভাল-মন্দ বুদ্ধিনির্ভর নয়; জীবনের জন্য দেহ শর্ত নয়; কোন বস্তুর দৃষ্টিগোচর হওয়ার জন্য রং, দেহ এবং পাত্রের প্রয়োজন নেই; কোন বস্তুই মূলত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নয়; কার্যকারণের

মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক থাকা জরুরী নয় ইত্যাদি। তিনি এসব বিষয়ে পর্যাপ্ত যুক্তি প্রমাণ পেশ করেন এবং এ-গুলোকে মুতাযিলা-বাদ ও সুন্নীবাদের মধ্যে পার্থক্যের মানদণ্ড রূপে গ্রহণ করেন। কালামের উপর লিখিত তাঁর সমস্ত গ্রন্থ এবং তাঁর 'তফসীর-এ-কবীর' এ ধরনের আলোচনায় পরিপূর্ণ।

প্রকৃত কথা হলো, এ ধারণাগুলো এত প্রচলন লাভ করেছিল যে, সেগুলো অস্বীকার করে কারুর পক্ষে জীবনে বেঁচে থাকাও মুশকিল ছিল। এ বিষয়গুলোর প্রতি ইঙ্গিত করেই ইমাম গাযালী 'ইল্‌জামুল আওয়াম' নামক গ্রন্থে বলেন ঃ

"কেবল সে সমস্ত বিষয় লোকের ধর্মীয় বিশ্বাসে (ই'তেকাদ) পরিণত হয়, যেগুলো ইলমে কালামের যুক্তিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, অথবা বড় বড় ওলামার মতবাদ বলে প্রচলিত ছিল, অথবা যে সব ভাবধারাকে অস্বীকার করা সমাজে গর্হিত কাজ বলে মনে করা হতো, অথবা যে ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করলে জনগণ অবজ্ঞার চোখে দেখতো।"

৫. ইমাম সাহেব সত্য বর্ণনার জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেন।

যারা শরীয়তের গূঢ়তত্ত্ব নিয়ে চর্চা করতো, যুক্তিবাদ এবং ওহী-বাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতো, ইমাম রাযী তাদের 'হুকামা-এ-ইসলাম' নামে অভিহিত করেন। যেমন তিনি তফসীরের একস্থানে বলেন ঃ

'হুকামা-এ-ইসলাম এই আয়াতে প্রমাণ করেন।

অন্য এক স্থানে বলেন ঃ

এটা দ্বিতীয় বিষয় এবং তা হলো 'হুকামা-এ-ইসলাম' এর অভিমত।

অপর এক স্থানে লিখেন ঃ

এবং সেটা হলো 'হুকামা-এ–ইসলামের' একটি দল।

ইমাম রাযী এই সম্প্রদায়ের নাম শ্রদ্ধা সহকারে উচ্চারণ করেন। তিনি তাঁদের মতামতের সমালোচনা করেন নি বরং প্রায় জায়গায় ইঙ্গিতে এবং কোন কোন জায়গায় পরিষ্কার ভাষায় তাঁদের প্রশংসা করেন।

'হুকামা-এ-ইসলামের' উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি যে সকল বিষয় বর্ণনা করেন, তা হচ্ছে বস্তুত ইমাম সাহেবের প্রকৃত অভিমত এবং সেগুলোই ইলমে কালামের প্রাণ। যেমন, কুরআন মজীদের আয়াত—"লাহু-মুয়াক্কিবাতুমমিন্-বাইনে-ইয়াদাইহি" (তার পাশেই রয়েছে আমলনামা লেখক ফেরেশতা) এর ব্যাখ্যায় ইমাম রাযী স্বয়ং প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, 'আমলনামায়' রেকর্ড রাখার এবং তা পরিমাপ করার অর্থ কি? এবং এতে লাভই বা কি? এর উত্তরে তিনি লিখেন:

এ বিষয়ে দুটি ভিন্ন মত্ রয়েছে: মুতাকাল্লিমদের অভিমত হলো—সত্যি সত্যি আমলনামা ওজন করা হবে। এতে কিয়ামতের দিন সবাই বুঝতে পারবে যে, অমুক ব্যক্তির আমল (কর্ম) ভাল, আর অমুকের খারাপ।

হুকামা-এ-ইসলামের মতে, মানুষ ভালমন্দ যাই করে, তা তার অন্তরে এক বিশেষ প্রতিফলন সৃষ্টি করে। যতই সে কাজের পুনরা-বৃত্তি করা হয়, ততই প্রতিফলনের ছাপ আরো গভীর হয়ে দাঁড়ায়। এমনি করে তার অন্তরে ভাল বা মন্দ করার এক সুষ্ঠু ক্ষমতা গজায়। এটাকেই বলা হয় আমলের পরিলিখন। প্রত্যেকটি কাজই কিছু না কিছু ক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তাই প্রত্যেকটি কাজ যেন এক একটি ছাপ বা পরিলিখন। (তাফসীর-এ-কবীর: সূরা-এ-রাআদ)

### দ্বিতীয় উদাহরণ:

'রসূলগণ তাদের বলেছিলেন, আমরা তোমাদের মত মানুষ বই কিছুই নই" (সূরা-এ-ইব্রাহিম)। কুরআন মজীদের এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাযী বলেন, আহলে সুন্নাত ও জামাতের মত্ হলো নুবুওয়াত একটি পদ, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন, তাকেই তা দিয়ে থাকেন। পয়গাম্বর হওয়ার জন্য এটা শর্ত নয় যে, তাকে বিশেষ ঐশী ক্ষমতার অধিকারী এবং অন্য সকল মানুষ থেকে স্বতন্ত্র হতে হবে।

পক্ষান্তরে, হুকামা-এ-ইসলামের অভিমত বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম রাযী বলেন, মানুষ বিশেষ আধ্যাত্মিক ও ঐশীগুণের অধিকারী না হলে সে পয়গাম্বর হতে পারে না। তিনি যে শব্দগুলো দিয়ে হুকামা-এ-ইসলামের অভিমত বর্ণনা আরম্ভ করেন, তা হলো: "আমাদের মনে রাখা উচিত, এখানে একটি সুক্ষ্ম ও উৎকৃষ্ট বিষয় আলোচিত হচ্ছে। সেটা হলো হুকামা-এ-ইসলাম··· ···।"

### তৃতীয় উদাহরণ ঃ

"তাঁর (আল্লাহর) নিকট রয়েছে সমস্ত অদৃশ্যমান বস্তুর চাবি কাঠি। তিনি ছাড়া সে সম্পর্কে আর কেউ জানে না" (সূরা ; আনয়াম) এ আয়াতে সাধারণ ব্যাখ্যাকারদের অভিমত বর্ণনা করার পর ইমাম রাযী বলেন, এই আয়াতের ব্যাখ্যায় 'হুকামা' অদ্ভুত সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন।

### চতুর্থ উদাহরণ ঃ

"হে আমাদের প্রভু! তুমি তোমার রসূলদের কাছে যে ওয়াদা করেছ, তা আমাদের পূর্ণ করে দাও এবং কিয়ামতের দিন আমাদের অপদস্থ করো না" (সূরা ঃ আল ইমরান)—এ আয়াতের তফসীরে ইমাম রাযী বলেন ঃ

কিয়ামতের দিন পথভ্রান্তি এবং কুকর্মের দরুন মানুষ যে লজ্জা বরণ করবে, মুসলিম হুকামা তাকেই আধ্যাত্মিক শাস্তিরূপে অভিহিত করেন এবং বলেন, আধ্যাত্মিক শাস্তি শারীরিক শাস্তি থেকে অধিকতর কঠিন।

কোন কোন স্থানে ইমাম রাযী 'মুসলিম হুকামা'দের চিন্তাবাদী (আরবীতে নযর) এবং বুদ্ধিবাদী (আরবীতে মা'কুলাত) নামে অভিহিত করেন। যেমন, "যখন আপনার প্রভু বনু আদমের পিঠ থেকে সন্তানাদি নির্গত করেন" (সূরা ঃ আ'রাফ)—এই আয়াতের তফসীরে ইমাম রাযী বলেন ঃ

তফসীরবিদদের মধ্যে এ আয়াতের ব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। রিওয়াইয়াতপন্থীরা বলেন, "আল্লাহ্ যখন আদম সৃষ্টি করে তার পিঠে হাত বুলালেন, তখন পিপড়ার মত লক্ষ লক্ষ প্রাণ বেরিয়ে পড়ে। আল্লাহ্ তাদের নিকট থেকে আপন খোদায়িত্বের স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন। অতঃপর আবার তাদের হযরত আদমের পিঠে অনুপ্রবেশ করান।" ইমাম রাযী এই ব্যাখ্যার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, প্রাচীন তফসীরবিদ, যেমন সাঈদ ইবনুল্ মুসাইয়াব, সাঈদ ইবনে যুবাইর প্রমুখও এ মত্ পোষণ করেন।

অতঃপর ইমাম রাযী বলেন, "চিন্তাবাদী ও বুদ্ধিবাদীদের মতে, উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা হলো এই যে, মানুষের প্রকৃতিকে আল্লাহ্

এমনভাবে সৃষ্টি করেন, তা যেন আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছে। তবে এ সাক্ষ্য মৌখিক নয়, ভাব ভঙ্গিতে।" ইমাম রাযী এ ব্যাখ্যার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, এ অভিমতের বিরুদ্ধে কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না।

মোটকথা, তিনি এ পদ্ধতিতে আকাইদের অধিকাংশ বিষয়ে এমন সব ব্যাখ্যা প্রদান করেন, যা দর্শন এবং বুদ্ধিবাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৬. ইলমে কালাম বিষয়ে তাঁর সবচাইতে বড় অবদান হলো কুরআন মজীদের তফসীর প্রণয়ন। ইমাম সাহেবের পূর্বে যত তফসীর রচিত হয়, সেগুলো যুক্তিসম্মত উপায়ে লিখিত হয়নি। অন্য কথায়, কুরআন মজীদের যে সব বিষয় নিয়ে বিরোধিগণ বরাবর প্রশ্ন তুলতো, সেগুলোর যুক্তিসঙ্গত উত্তর এ যাবত কেউ দেয়নি। কেবল ওহীবাদ ও পরম্পরাগত মতবাদ-ভিত্তিক জওয়াব দিয়েই ক্ষান্ত করা হয়। মুতাযিলিগণ অবশ্য পূর্বেই এ ধরনের বিভিন্ন তফসীর লিখেছিলেন, কিন্তু তাঁরা লোকের কাছে এত অপ্রিয় ছিলেন যে, কেউ তাঁদের যুক্তিসঙ্গত কথায় কর্ণপাত করেনি। আশায়েরাবাদীদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইমাম রাযীই এ পদ্ধতি অবলম্বনে তফসীর রচনা করেন এবং এমন এক উচ্চমানসম্পন্ন তফসীর রচনা করেন, যার চাইতে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আজও রচিত হয়নি। যদিও তিনি গভীর জ্ঞান এবং তীক্ষ্ণ লেখনী ধারার আবর্তে সর্বত্র খাঁটি ও মেকীর মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন নি এবং কোথাও কোথাও এমন সব ভাসা ভাসা ও অগভীর কথাও লিখেছেন, যা তাঁর পক্ষে সমীচীন ছিল না। তথাপি এটা স্বীকার করতেই হবে যে, তিনি এসব নিষ্প্রয়োজন বিষয়াদির পাশাপাশি এমন শত শত সূক্ষ্ম এবং বিতর্কমূলক সমস্যার সমাধান করেন, যার নাম নিশানাও অন্য কোন গ্রন্থে খুঁজে পাওয়া যায় না।

ইমাম রাযী তাঁর এই তফসীরে ইলমে কালাম বিষয়ে লিখিত গ্রন্থাবলী সম্পর্কে স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ মতামত প্রকাশ করেন। তিনি এর বিভিন্ন স্থানে হুকামা-এ ইসলামের মতামত বর্ণনা করেন। হুকামার অনেক চিন্তাধারা আশায়েরা বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁদের প্রশংসা করেন এবং তাঁদের বক্তব্যের সত্যতা স্বীকার করেন। বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় হলো এই যে, তিনি তাঁর ঘোর বিরোধী মুতাযিলীদের তফসীরসমূহ থেকেও সাহায্য গ্রহণ করেন। তিনি

অনেক স্থানে কোন প্রকার সমালোচনা না করেই তাঁদের মতামতের উদ্ধৃতি দেন এবং কোন কোন স্থানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁদের প্রশংসাও করেন।

তিনি বললেন, "হে আল্লাহ্! আমাকে এর একটি নিদর্শন দেখতে দিন!" সূরায়ে আল ইমরানের এ আয়াতের তফসীরে ইমাম রাযী আবু মুসলিম ইস্পাহানীর ব্যাখ্যার উদ্ধৃতি দেন এবং তাঁর প্রশংসায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিম্ন কথাগুলো উচ্চারণ করেন, যদিও তাঁর এ ব্যাখ্যা ছিল সাধারণ তফসীরকারদের মতবিরোধী।

তফসীর রচনায় আবু মুসলিমের আলোচনা খুবই সুন্দর। তিনি পাতালে প্রবেশ করে অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়ের গূঢ়তত্ত্ব উদ্ঘাটন করেন।

অথচ আবু মুসলিম ছিলেন একজন বিখ্যাত মুতাযিলী এবং তাঁর তফসীরটি ছিল সম্পূর্ণরূপে যুক্তিবাদের ভিত্তিতে লিখিত। এ তফসীরে ইমাম রাযীর যে কাজটি অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রশংসার যোগ্য, তা হলো কুরআন মজীদের কিস্সা সম্পর্কিত অনেক ভ্রান্ত ধারণার নিরসন। কুরআন শরীফে বনি ইস্রাঈল এবং পূর্ববর্তী অনেক জাতির নবীদের সংক্ষিপ্ত কিস্সা রয়েছে। এসব কিস্সাকে কেন্দ্র করে ইহুদীদের মধ্যে অনেক কল্পনাপ্রসূত এবং বিবেকবর্জিত গল্প গুজব প্রচলিত ছিল। তারা যখন ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলো, তখন এসব ভিত্তিহীন গল্প গুজবকেও কুরআনের তফসীরে জুড়ে দিলো। এ গল্পগুলো ছিল চিত্তহরা ও মনমুগ্ধকর। এগুলো ধর্ম প্রচারক এবং ধর্মোপদেশকদের সভায় লোকের মনে যাদুমন্ত্রের ন্যায় কাজ করতো। তাই এগুলো খুব শিগ্গির জনপ্রিয়তা লাভ করে। ফলে তফসীরসমূহ এসব গল্প গুজবে ভরে যায়। হাদীসবিদ ও তফসীর বিশারদ আবুজাফ'র মোহাম্মদ ইবনে জারীর তাবারীর তফসীর সম্পর্কে সমস্ত মুহাদ্দিস ও ফকীহ এক বাক্যে এ মন্তব্য করেছিলেন যে, ইসলামের ইতিহাসে এর চাইতে উত্তম তফসীর আর লিখিত হয়নি। অথচ এ তফসীরটিও এ ধরনের কিস্সা কাহিনী থেকে মুক্ত নয়। বাবেলে যোহরা নাম্নী একজন ব্যভিচারিণী স্ত্রীলোক ছিল। 'ইসমে আযম' (আল্লাহর প্রধান নাম) এর বলে তার আকাশে গমন করা এবং সেখানে গিয়ে নক্ষত্রে পরিণত

হওয়া—এ ভিত্তিহীন গল্পটিও তাঁর তফসীরে স্থান লাভ করেছে এবং সনদ সহকারেই করেছে।

এরূপ আরো অনেক প্রচলিত ভিত্তিহীন ধারণা তফসীরসমূহে সন্নিবিষ্ট করা হয়। যেমন হযরত ইউসুফের পাপকার্যে উদ্যত হওয়া, শয়তান কর্তৃক হযরত আইউবকে পরাভূত করা এবং তাঁর ধনসম্পদ ও বংশকে ধ্বংস করা; শয়তানের প্ররোচনায় হযরত আদম (আঃ) কর্তৃক তাঁর পুত্রের নাম আব্দুল হারেস (হারেস শয়তানের নাম) রাখা, হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) তিনবার মিথ্যা কথা বলা, সিকান্দর বাদশার সেই স্থানে উপনীত হওয়া, যেখানে সূর্য পানির ঝরনায় অস্তমিত হয়; হযরত দাউদের উইরিয়ার স্ত্রীর উপর আসক্ত হওয়া—এরূপ ভিত্তিহীন ধারণাগুলো তফসীরে প্রবেশ করে এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের অঙ্গরূপে পরিণত হয়। এগুলোই ইসলাম বিরোধীদেরকে ইসলামের উপর হামলা করার সবচাইতে বেশী সুযোগ দেয়।

সর্বপ্রথম মুতাযিলীরাই এসব পরম্পরাগত ধর্মীয় বিশ্বাসকে অস্বীকার করেন। কিন্তু মুতাযিলার এসব ধারণাকে অবিশ্বাস করার মানে ছিল লোকদেরকে সেগুলো গ্রহণ করতে আরো উৎসাহিত করা। কারণ তাদের প্রতি মানুষের ধারণা ভাল ছিল না। ইমাম রাযীর যুগ পর্যন্ত এসব অলীক গল্প গুজব সর্বসম্মতরূপে চলে আসছিল। তিনিই সাহসিকতার সাথে এসব নিরর্থক কিস্সা কাহিনী অস্বীকার করেন এবং বলিষ্ঠ যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেন যে, এসব কাহিনী সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। হযরত ইব্রাহীম সংক্রান্ত কিস্সা সম্পর্কে তিনি তাঁর তফসীরে লিখেন ঃ "এক ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হযরত ইব্রাহীমের তিনবার মিথ্যা কথা বলার ঘটনাতো হাদীসেই রয়েছে। তা কি করে অস্বীকার করা যায়?" আমি উত্তরে বললাম, হাদীস বর্ণনাকারীকে যদি সত্যবাদী বলে গণ্য করেন, তবে হযরত ইব্রাহীম মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হন। আর যদি হযরত ইব্রাহীমকে সত্যবাদী বলে মনে করেন, তবে বর্ণনাকারিগণ মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হন। এখন আপনার এখতিয়ার, এঁদের মধ্যে যাঁকে ইচ্ছা, সত্যবাদী বলুন, আর যাঁকে ইচ্ছা, মিথ্যাবাদী মনে করুন।"

ইমাম সাহেব এ তফসীরে যুক্তিবাদের আলোকে আকাইদের আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধান করেন। এ গ্রন্থের অন্যান্য অংশে সমুচিত জায়গায় এগুলো নিয়ে আরো কিছু আলোচনা করবো।

ইমাম সাহেব যুক্তিবাদের তুলনায় ওহীভিত্তিক মতবাদের উপরই বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন এবং মুতাযিলী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের ভাবধারা খণ্ডনে স্বতন্ত্র গ্রন্থাবলীও রচনা করেছেন। তা সত্ত্বেও ফকীহ্ এবং মুহাদ্দিসগণ তাঁর সম্পর্কে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করেনঃ

আল্লামা যাহাবী 'মিযান' নামক গ্রন্থে বলেনঃ

ফখরুদ্দীন ইবনে খতীব বহু গ্রন্থ-রচয়িতা। তেজস্বিতা ও যুক্তি-বিদ্যায় তিনি ছিলেন একজন শীর্ষস্থানীয় লোক। কিন্তু হাদীসে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অজ্ঞ। যে সমস্ত বিষয় ধর্মের স্তম্ভ, তাতে তিনি এমন সব সন্দেহের অবতারণা করেন, যা বিস্ময়কর। আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি আমাদের অন্তরে ঈমান কায়েম রাখুন!

হাফিয ইবনে হাজার 'লিসানুল মীযান' নামক গ্রন্থে ইবনুর রবীবের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেনঃ

তাঁর সম্পর্কে অভিযোগ করা হয় যে, তিনি গুরুতর সন্দেহের সৃষ্টি করেন। কিন্তু সেগুলো নিরসন করতে সক্ষম নন। এজন্যই কোন কোন পাশ্চাত্য মনীষী বলেছেন, তাঁর প্রশ্নগুলো নগদ, কিন্তু উত্তরগুলো বাকী।

আবার 'একসীর-ফি-উসূলিত্ তাফসীর' এর উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেনঃ

সিরাজুদ্দীন মাগরিবী 'মাখায' নামক একটি দ্বিখণ্ডবিশিষ্ট গ্রন্থ রচনা করেন। এতে তিনি ইমাম রাযীর তফসীরের ত্রুটি-বিচ্যুতি তুলে ধরেন। ইমাম রাযীর প্রতি ঘোরতর অভিযোগ করে তিনি বলেনঃ

ইমাম রাযী বিরোধীদের অভিযোগ জোরেশোরে বর্ণনা করেন, কিন্তু আহলে সুন্নাতের তরফ থেকে যে উত্তর দেন, তা খুবই দুর্বল। এজন্য কোন কোন লোক তাঁর প্রতি কুধারণা পোষণ করে।

হাফিয ইবনে হাজার সিরাজুদ্দীন মাগরিবীর উপরোক্ত মন্তব্য পেশ করার পর তুফীর নিম্নলিখিত মন্তব্যটি উদ্ধৃত করেনঃ

"ইমাম ফখরুদ্দীন রাযীর প্রতি যে কুধারণা পোষণ করা হয়, তা ঠিক নয়। কারণ তার উদ্দেশ্য যদি অন্য কিছু হতো, তবে কার ভয়ে তিনি তা প্রকাশ করলেন না ?'

কিন্তু তুফী জানতেন না যে, ইমাম সাহেব সত্যিই এ বিপদের শিকারে পরিণত হয়েছিলেন। হাফিয ইবনে হাজার এই গ্রন্থেই লিখেছেনঃ লোকেরা তাঁর ধরপাকড়ের সিদ্ধান্ত নিলে তিনি উধাও হয়ে যান।

ইমাম সাহেবের প্রতি কুধর্মিতার অভিযোগ প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে মতবাদ তুলে ধরা হয়, সেগুলো হাফিয ইবনে হাজার এই গ্রন্থে তাঁর যে সব ইবনে খলীলের উদ্ধৃতি দিয়ে নিম্নরূপ বর্ণনা করেন ঃ

ইমাম রাযীর মতে, জাব্‌রিয়া মতবাদই যথার্থ। পরমূর্ত পদার্থের অস্তিত্ব বজায় থাকে। দার্শনিকদের ন্যায় তিনিও বলেন, কেবল সম্বন্ধ ও সম্পর্কের নামই আল্লাহ্‌র গুণাবলী। স্বতন্ত্র গুণাবলী বলে কোন কিছুই নেই। ইমাম রাযী আরো বলতেন, পৃথিবীকে যে ব্যক্তি নশ্বর বলে দাবী করে, তার বিরুদ্ধে আমার শত প্রশ্ন রয়েছে।

ইমাম রাযীর পর, বরং তাঁর যুগেই ইসলামের অবনতির বহু কারণ দেখা দেয়। তাতারীদের অভিযান ছিল প্রধানতম কারণ। এরূপ সময় ইমাম রাযীর বিরাট প্রতিভার সামনে আর কোন মনীষীর নাম ফুটে উঠা ছিল মুশকিল। তথাপি বলতে হয়, ইসলামের জ্ঞানদেহে তখনো জীবনের কিছুটা স্পন্দন বাকি ছিল। তাই ইমাম রাযী ছাড়াও এ যুগে এমন কতক লোক জন্মগ্রহণ করেন, যাঁদের নাম ইলমে কালামের ইতিহাস থেকে বাদ দেয়া যায় না। তন্মধ্যে সবচাইতে বিখ্যাত হলেন—আল্লামা সাইফুদ্দীন আমুদী।

## আল্লামা আমুদী

তাঁর পুরো নাম—আবুল হাসান আলী সাইফুদ্দীন আমুদী। তিনি ৫৫১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬৩১ হিজরীতে ওফাত প্রাপ্ত হন। ফিক্‌হ্‌, উসূল-এ-ফিক্‌হ্‌ ইত্যাদি বাগদাদে অধ্যয়ন করেন। দর্শনে দক্ষতা অর্জন করেন সিরিয়ায়। সেখান থেকে তিনি মিসর গমন করেন এবং কাররাফা মাদ্রাসায় সহকারী অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হন। দিন দিনই তাঁর খ্যাতি বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই খ্যাতিই তাঁর জন্য মারাত্মক বিপদ হয়ে দাঁড়ায়। ইবনে খাল্লিকান বর্ণনা করেন,

তাঁর এই জনপ্রিয়তা ফকীহ্‌দের দুশমনে পরিণত করে। তাঁরা একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করে তাঁর বিরুদ্ধে ধর্মহীনতা, নাস্তিকতা ও দর্শন-পূজার অভিযোগ আনয়ন করেন। এ বিজ্ঞাপনে সমস্ত ফকীহ্‌ দস্তখত করেন। মজার ব্যাপার হলো, এটি স্বয়ং আল্লামা আমুদীর সামনে পাঠানো হয় এবং তাঁকেও এতে সই করতে বলা হয়। তিনি এতে নীচের চরণ দুটি লিখে দিলেন ঃ

তারা এ জোয়ানের (স্বয়ং) মর্যাদা লাভে সক্ষম নয় বলে ঈর্ষান্বিত।

জাতি আজ তার শত্রু, মারমুখী।

আল্লামা আমুদী মিসর থেকে সিরিয়ায় পালিয়ে গেলেন এবং হামাতে বসবাস আরম্ভ করেন। অতঃপর দামেশকে এসে মাদ্রাসায়ে আযিযিয়ায় শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন। কিন্তু সময়টি তার পক্ষে অনুকূল ছিল না। কিছুদিন পর তাঁকে বরখাস্ত করা হয়। শেষ পর্যন্ত ঘরেই বসে রইলেন এবং সে অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন।

তাঁর রচনা অনেক। দর্শন বিষয়ক রচনায় অনেক স্থানেই তিনি অ্যারিস্টটলের মতবাদ রদ করেন। কিন্তু ইমাম রাযীর ন্যায় তিনি এলোপাতাড়ি সমালোচনা করেন নি, বরং যে বিষয়গুলো সত্যি আপত্তিকর, সেগুলোরই প্রতিবাদ করেন। ইলমে কালামে তিনি ছিলেন আশায়েরাবাদী। তথাপি কোন কোন স্থানে তিনি স্বাধীনভাবে তাঁদের সমালোচনা করেন।

ইলমে কালাম বিষয়ক বিখ্যাত রচনাবলী ঃ দাকাইকুল-হকাইক্‌, রুমুযুল-কুনুয, আব্‌কারুল্‌-আফকার।

আল্লামা আমুদীর পর তাঁর সমকক্ষ উল্লেখযোগ্য লোক আর জন্ম-গ্রহণ করেনি। কাযী আযুদ, আল্লামা তাফ্‌তাযানী প্রমুখ অবশ্য বড় বড় গ্রন্থ লিখেছেন। সেগুলোর কিছু অংশ নিযামিয়ায় পাঠ্যতালিকাভুক্তও রয়েছে এবং সেগুলোকে আমাদের ওলামার গৌরব চিহ্ন বলেও পরিগণিত করা হয়। তা সত্ত্বেও এটা না বলে পারা যায় না যে, এ গ্রন্থগুলো ইমাম রাযী এবং আল্লামা আমুদীর অনুকরণ ছাড়া কিছুই নয়। এছাড়া সে সব গ্রন্থে নিছক দার্শনিক বিষয় এত বেশী পরিমাণে স্থান লাভ করেছে যে, দর্শন গ্রন্থ ও কালাম গ্রন্থের মধ্যে

কোন পার্থক্য আছে বলেই মনে হয় না। আল্লামা ইবনুল খালদুন তাঁর ইতিহাসের ভূমিকায় সত্যিই লিখেছেন ঃ

শেষ যুগীয় ওলামা একই ক্ষেত্রে দর্শন ও কালাম উভয় পদ্ধতি অবলম্বন করে জগাখিচুড়ি করে ফেলেছেন। এখন দর্শন এবং কালাম এত সংমিশ্রিত হয়ে পড়েছে যে, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করাই মুশকিল। বিদ্যার্থিগণ এসব গ্রন্থে ইলমে কালাম শিখতে পারে না।

## আশায়েরাবাদের প্রসার এবং তার স্থায়িত্বের কারণ

আশায়েরাপন্থী ইলমে কালাম যে দ্রুত গতিতে উন্নতি লাভ করছিল, তাতে মনে হচ্ছিল যে, এর গোড়ার দিকের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো শুধরে যাবে এবং তা পূর্ণতার চরম সীমায় উপনীত হবে। কিন্তু তাতারী লুটেরাদের অগ্রাভিযান সমস্ত আশা আকাংক্ষাকে নস্যাৎ করে দেয়। এই আকস্মিক বিঘ্নের ফলে আশায়েরাবাদী ইলমে কালামের মৌলিক জ্ঞান সাধনার কাজ কিছুটা থমকে দাঁড়ালেও এর প্রচার কার্য মোটেও ব্যাহত হয়নি। বিভিন্ন কারণে এমন এক পরিবেশের সৃষ্টি হলো, যার ফলে ধীরে ধীরে সারা মুসলিম দুনিয়ায় আশায়েরা মতবাদ ছড়িয়ে পড়ে। মাকরিযী 'তারিখে মিসির' নামক গ্রন্থে এই বিস্তৃতি ও উন্নতির কারণ বর্ণনা করেন। আমি হুবহু তা পেশ করলাম। তবে মাঝে মাঝে সমার্থবোধক এবং অপ্রয়োজনীয় কিছু কিছু শব্দ বাদ দেয়া হলো ঃ

সুলতান সালাহুদ্দীন যখন বাদশাহ হলেন, তখন তিনি এবং তাঁর দরবারের কাযী আবদুল মালিক ছিলেন এই (আশয়ারী) মতাবলম্বী। সালাহুদ্দীন ছোট বেলায় সেই আকাইদ সঙ্কলনটি আয়ত্ত করেন, যা কুতুবুদ্দীন তাঁর জন্য প্রণয়ন করেছিলেন। সালাহুদ্দীনের ছেলেরাও এ সঙ্কলনটি মুখস্থ করে নেয়। এ কারণেই সালাহুদ্দীন এবং তাঁর বংশধরেরা আশায়েরাবাদ প্রচারে দৃঢ় প্রতীজ্ঞ হন এবং সকলকে তা গ্রহণে বাধ্য করেন। বনি আইউব এবং তাঁর তুর্কী দাসদের শাসনামলেও আশায়েরাবাদের প্রতি রাজকীয় সহায়তা বিদ্যমান ছিল। দৈবক্রমে মোহাম্মদ ইবনে তুমরাতও আশায়েরাবাদ গ্রহণ করেন। তিনি ইমাম গাযালী থেকে এ মতবাদ শিক্ষা করেন। তিনি ছিলেন 'মুওয়াহিদ্দীন' শাসনের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি আশয়ারী

মতবাদ জোরেশোরে প্রচার করেন। তাঁর শাসনামলে সেই সব লোকদের হত্যা বৈধ বলে মনে করা হতো, যারা তাঁর আকীদার বিরোধিতা করতো। এ অজুহাতে তিনি এত লোক হত্যা করেছেন যে, নিহতদের সংখ্যা আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না। এসব কারণেই আশায়েরা মতবাদ সারা মুসলিম জাহানে ছড়িয়ে পড়ে।

অন্য এক স্থানে ঐতিহাসিক মাক্রিযী ইমাম আশ্য়ারীর আকাইদ উদ্ধৃত করে বলেন :

এগুলো হলো আশ্য়ারী আকাইদের কয়েকটি নীতি। আজ সারা মুসলিম বিশ্বে এ আকাইদ প্রচলিত। যে ব্যক্তি এ মতবাদের বিরোধী, তাকে হত্যা করা হয়।

# এক নজরে আশ্‌য়ারিয়া ইলমে কালাম

## আশয়ারিয়া ইলমে কালামে তিন ধরনের বিষয় রয়েছেঃ

১. খাঁটি দার্শনিক বিষয়,

২. মুতাকাল্লিমদের নিরূপিত ধর্মবিরোধী দার্শনিক বিষয়,

৩. খাঁটি ইসলামী বিষয়।

প্রথম প্রকারের বিষয়াদির সাথে ইলমে কালামের কোন সম্পর্ক নেই। দ্বিতীয় প্রকার বিষয়গুলোও বস্তুত ইলমে কালাম থেকে স্বতন্ত্র। কারণ যে সব দার্শনিক বিষয় ধর্মবিরোধী, প্রকৃতপক্ষে সেগুলোর সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। এখন বাকী থাকে শুধু ইসলামী বিষয়াদি।

এ বিষয়াদির মধ্যে যেগুলো কেবল আশায়েরা মতবাদের সাথে সম্পৃক্ত এবং যেগুলোর কথা পূর্বেও বলেছি, তা প্রমাণিত করার জন্য ইমাম গাযালী ও ইমাম রাযী যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বিষয়গুলো ছিল এমনি ধরনের, যত চেষ্টাই তাদের প্রতিষ্ঠায় করা হতো, সবই বৃথা যেতো। আপনারা নিজেরাই বিচার করুন! এ ধরনের কথা যেমন—আল্লাহ্ মানুষকে তাঁর ক্ষমতা-বহির্ভূত কাজের জন্যেও দায়ী করতে পারেন; হায়াতের জন্য দেহ শর্ত নয়; যাদুবলে মানুষ গাধা হতে পারে—এসব বিষয় কিভাবে প্রমাণ করা সম্ভব?

এ ছাড়া বাকী বিষয়ে মোটামুটি সব সম্প্রদায়ই একমত। যেমন আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, তওহীদ, নুবুওয়াত, কুরআন মজীদ আল্লাহ্‌র কালাম, পরকাল—এসব বিষয়কে আশায়েরা বুদ্ধিভিত্তিক যুক্তি দিয়ে প্রমাণিত করেছেন। তন্মধ্যে বড় বড় কয়েকটি যুক্তি সবিস্তারে বর্ণনা করছি।

## আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব

আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রমাণ হলো—বিশ্ব নশ্বর এবং নশ্বর পদার্থের অস্তিত্ব হেতু সাপেক্ষ। তাই বিশ্বও হেতু সাপেক্ষ। এই হেতুকেই আমরা আল্লাহ্‌ বলে থাকি। এ যুক্তির দ্বিতীয়াংশ প্রণিধানের জন্য কোন প্রমাণের প্রয়োজন নেই। প্রথমাংশ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিভিন্ন প্রমাণ প্রযোজ্য।

তন্মধ্যে একটি হলো, বিশ্বে যা কিছু বিদ্যমান, তা হয়তো স্বমূর্ত (জওহর), নয়তো পরমূর্ত (আরয)। পরমূর্ত পদার্থ যে নশ্বর, এতে কারুর সন্দেহ নেই। স্বমূর্ত পদার্থ মূলতঃ নশ্বর। কারণ, কোন স্বমূর্ত পদার্থ পরমূর্ত পদার্থ ছাড়া স্বরূপ লাভ করতে পারে না। আমরা জানি, পরমূর্ত পদার্থ নশ্বর। তাই স্বমূর্ত পদার্থও নশ্বর। কিন্তু স্বমূর্ত বস্তুকে যদি অবিনশ্বর ধরে নেয়া হয়, তবে পরমূর্ত বস্তুও অবিনশ্বর হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, পরমূর্ত বস্তু ছাড়া স্বমূর্ত বস্তু মূর্তি লাভ করতে পারে না।

দ্বিতীয় প্রমাণ হলো, সকল জড়বস্তু হয় গতিসম্পন্ন হবে, নয় তো গতিহীন। গতি এবং গতিহীনতা উভয়ই নশ্বর। তাই সকল জড়-বস্তুও নশ্বর। গতির মানে হলো এক অবস্থা বা এক স্থান থেকে অন্য অবস্থা বা অন্য স্থানে পরিবর্তিত বা অপসারিত হওয়া; এটাই নশ্বরতা বা নৈমিত্তিকতা। গতিহীনতা এইজন্য নশ্বর যে, যা নশ্বর নয়, তা অবশ্যই চিরন্তন। আর যে বস্তু চিরন্তন, তা কখনও বিলুপ্ত হয় না। এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, গতিহীন বস্তু কখনও বিলুপ্ত হতে পারে না। অথচ এটা বাস্তব সত্যের বিপরীত।

আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের তৃতীয় প্রমাণ হলো—প্রত্যেক জড় বস্তুর স্বরূপ এক। এ সত্ত্বেও তাদের পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যের নিয়ন্তা নিশ্চয়ই একজন রয়েছেন। তিনিই আল্লাহ্‌। যেমন আগুন আর পানি মৌলিক স্বরূপের দিক থেকে উভয়ই এক। এ হিসেবে আগুনের ন্যায় পানিও জ্বালাতে পারতো। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না, বরং উভয়ের গুণও পৃথক পৃথক এবং কাজও স্বতন্ত্র। তাই বলতে হয় এসব গুণের নির্ধারক একজন অবশ্যই রয়েছেন এবং তিনিই আল্লাহ্‌।

বিভিন্ন গ্রন্থে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য আরো অনেক যুক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু উল্লিখিত যুক্তিগুলোই প্রধান।

## আল্লাহ্‌র একত্ববাদ

আল্লাহ্ একক। কারণ, যদি দু'জন হয় এবং খোদাইত্বের গুণাবলী উভয়ের মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান থাকে, তবে এটাই প্রতিপন্ন হবে যে সৃষ্টবস্তু বলে কিছুই নেই। কারণ স্বভাবতই সকল সৃষ্ট-বস্তুর সাথে উভয় আল্লাহ্‌র সম্পর্ক থাকবে সমভাবে। এ অবস্থায় যদি উভয় মিলে কোন বস্তু সৃষ্টি করে থাকে, তবে এটা প্রতিপন্ন হয় যে, একটি সৃষ্ট বস্তুর জন্য দুটি পূর্ণাঙ্গ কারণ রয়েছে। অথচ কোন বস্তুর জন্যই দুটি পূর্ণাঙ্গ কারণ থাকতে পারে না। আর যদি একজনে সৃষ্টি করে থাকে, তবে একের উপর অপরের প্রাধান্য প্রতিপন্ন হয়।

## নবুওয়াত

আশায়েরার মতে, নবুওয়াতের মানে হলো—আল্লাহ্ আপন বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা, তাকে আপন বিধি-বিধান প্রচারের জন্য আদিষ্ট করে থাকেন। এর জন্য তার মধ্যে পূর্ব থেকেই বিশেষ কোন যোগ্যতা বা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের প্রয়োজন নেই।

নবুওয়াতের সত্যতা মুজিযার উপর নির্ভরশীল। মুজিযার সংজ্ঞা হলো—তা হবে অলৌকিক, ঐশী এবং অপরের পক্ষে অসম্ভব; মুজিযাধারী নিজেকে নবীরূপে ঘোষণা করবেন, তাঁর কাজকর্ম হবে নবুওয়াতের দাবী মাফিক এবং তা নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে কখনো প্রকাশিত হবে না। এ শর্তাবলীর সাথে যে ব্যক্তি মুজিযার অধিকারী হবেন, তিনিই নবী। মুজিযা নবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণ করে। কারণ যে ব্যক্তির নিকট থেকে মুজিযার উদ্ভব হয়, সে ব্যক্তি সম্পর্কে আল্লাহ্ তাঁর নিকট উপস্থিত সকলের মনে এ বিশ্বাস সৃষ্টি করে দেন যে, তিনিই সত্য নবী।

## রসূল করীমের নবুওয়াতের প্রমাণ

এটা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে যে, রসূল করীমের সময় আরবগণ বাক্-কৌশল ও রচনাশৈলীতে চরম উন্নতি লাভ করে। তারা মনে করতো যে, এ বিষয়ে সারা দুনিয়া একত্রে মিলেও তাদের

মোকাবিলা করতে সক্ষম নয়। তাদের এ ধারণা ছিল যথার্থ। এ সময়ই কুরআন মজীদ অবতীর্ণ হয় এবং এ দাবী নিয়ে অবতীর্ণ হয় যে, সারা পৃথিবীর মানুষ এবং জিন একত্র হয়েও কুরআনের মত একটি ক্ষুদ্রতম সূরাও পেশ করতে সক্ষম নয়। সমস্ত আরব এ দাবীর মোকাবিলায় সর্বশক্তি নিয়োজিত করে। কিন্তু একটি ক্ষুদ্রতম সূরার চ্যালেঞ্জও গ্রহণ করতে পারেনি। সুতরাং এটা অবশ্যই সমর্থন করতে হবে যে, কুরআন ঐশীবাণী এবং তা একটি মুজিযা। তা না হলে সমস্ত আরবেরা তার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কেন নতি স্বীকার করলো ?

## পরকাল ও তার স্বরূপ

সমস্ত মানুষের সাবেক শরীর নিয়ে হাশরে সমবেত হওয়া, তুলা-দণ্ডে আমল পরিমিত হওয়া, পুলসিরাত পার হওয়া, বেহেশত-দোজখে প্রবেশ করা—এসব পরলৌকিক ব্যাপার। এ বিষয়গুলো সম্ভাব্য। তদুপরি রসূল করীম এগুলোর যথার্থতা সম্পর্কে নিশ্চয়তা বিধান করেছেন। তাই এগুলো সুনিশ্চিত।

আশয়ারী পন্থী ইলমে কালামের বেশীর ভাগ বিষয়বস্তু গ্রীক দর্শনের প্রতিবাদে নিবেদিত। এতে সন্দেহ নেই যে, দর্শনের যেসব বিষয় ইসলাম বিরোধী, তা রদ করাই ইলমে কালামের সর্বাধিক কর্তব্য। কিন্তু মুতাকাল্লিমীন এ ক্ষেত্রে মারাত্মক ত্রুটি-বিচ্যুতির শিকারে পরিণত হন। যে বিষয়গুলো তাঁরা গ্রীক দর্শনের অংগ বলে মনে করেন, সেগুলো মূলত তাঁদের প্রতিপাদ্যই নয়। আর যেগুলো প্রকৃত পক্ষে গ্রীক দর্শনের অন্তর্ভুক্ত ছিল, সেগুলো মোটামটি ইসলাম বিরোধী ছিল না।

## মাতুরিদিয়া

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইসলামী সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে হানাফীরাই সংখ্যায় সবচাইতে বেশী এবং ভাবধারার দিক থেকে তাঁরা হলেন মাতুরিদিয়া মতাবলম্বী। তা সত্ত্বেও ইলমে কালামে আশয়ারীদের তুলনায় মাতুরিদিয়ার খ্যাতি নিতান্ত কম। মাতুরিদিয়া মতবাদের খ্যাতি না থাকায় আজ অধিকাংশ হানাফী ওলামাই আশয়ারী মতাবলম্বী। অথচ পূর্বকালে কোন হানাফীর পক্ষে আশয়ারিয়া হওয়াটা ছিল বিস্ময়কর। আল্লামা ইবনুল আসির 'তারিখে কামিল'

নামক গ্রন্থে ৪৬৬ হিজরীর ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, কোন হানাফী আশয়ারী-মতাবলম্বী হবে – এটা নিতান্ত বিস্ময়কর ব্যাপার।

মাতুরিদিয়া মতবাদের বিলুপ্তির কারণ হলো এই যে, হানাফী ওলামা ইলমে কালাম-বিষয়ে খুব কমই গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ বিষয়ে যত বিখ্যাত এবং গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ আছে, সে সব শাফী মতাবলম্বীদেরই রচিত। তাঁরা সাধারণত ছিলেন আশয়ারিয়া।

ইলমে কালামে মাতুরিদিয়া শাখার উদ্ভাবক হলেন আবুল মনসুর মাতুরিদী। তাঁর পুরো নাম মোহাম্মদ ইবনে মোহাম্মদ ইবনে মাহমুদ। তিনি ছিলেন সমরখন্দ অঞ্চলস্থ মাতুরিদ নামক গ্রামের অধিবাসী। তিনি ইমাম আবু নসর আওয়াযী, আবু বকর আহমদ ইবনে ইসহাক ইবনে সালিহ জোরজানী, নাসির ইবনে ইয়াহ্ইয়া বলখী এবং মোহাম্মদ ইবনে মুকাতিল রাখীর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং পরোক্ষভাবে কাযী আবু ইউসুফ এবং ইমাম মোহাম্মদের শিষ্য ছিলেন। তিনি ৩৩৩ হিজরী সালে ওফাত প্রাপ্ত হন।

## তাঁর রচনাবলী

কিতাবুত তওহীদ, কিতাবুল মাকালাত, রদ্দু আওয়াইলিল্ আদিল্লা-তিল্কাবী, বায়ানু-ওহামিল মুতাযিলাহ্, তাবিলাতুল্ কোরআন। 'তাবিলাতুল্ কোরআন' অসমাপ্ত। এটি আমি অধ্যয়ন করেছি।

যে সমস্ত বিষয়কে আমি আশয়ারির বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করেছি, ইমাম মাতুরিদী সে সব বিষয়ে তাঁর বিরোধিতা করেন। এ জন্যই তাঁর রচিত ইলমে কালামকে আশয়ারীর ইলমে কালাম থেকে স্বতন্ত্র বস্তুরূপে পরিগণিত করা হয়। বিশেষজ্ঞগণ দুই ইমামের মতবিরোধ-মূলক বিষয়গুলোকে পৃথক করে দেখিয়েছেন। কারো কারো মতে, এ ধরনের বিষয়ের সংখ্যা—৩, কারো কারো মতে ১৩, আবার কারো কারো মতে ৪০ বলেও বর্ণনা করা হয়। আল্লামা ইবনুল বাইয়াযী এ বিষয়গুলো ভালরূপে খতিয়ে দেখেছেন। তাঁর মতে, বিতর্কমূলক বিষয়ের সংখ্যা হলো ৫০। আমি প্রধান প্রধান বিষয়গুলো বর্ণনা করছি।

নিম্নে ইমাম মাতুরিদীর চিন্তাধারা থেকে কয়েকটি বিষয়ের রূপরেখা দেয়া হলো। ইমাম আশয়ারী এসব বিষয়ে তাঁর বিরোধিতা করেন।

১. প্রত্যেক বস্তুর ভালমন্দ নির্ধারণের মানদণ্ড হলো বুদ্ধি।

২. আল্লা কাউকেও শক্তি-বহির্ভূত কার্যের জন্য শাস্তি দিতে পারেন না।

৩. আল্লাহ্ উৎপীড়ন করেন না। তাঁর উৎপীড়ক হওয়া অকল্পনীয়।

৪. আল্লাহ্‌র সকল কাজকর্ম মঙ্গলজনক।

৫. মানুষের কর্মক্ষমতা আছে এবং তাঁর ইচ্ছারও স্বাধীনতা রয়েছে। এ ক্ষমতা কর্ম সম্পাদনের সময় সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

৬. ইমান বৃদ্ধিও পায় না, হ্রাসও পায় না।

৭. জীবনের আশা ত্যাগের মুহূর্তেও তওবা কবুল হয়।

৮. পঞ্চইন্দ্রিয়ের দ্বারা কোন বস্তু অনুভব করার নাম জ্ঞান নয়, বরং তা হলো জ্ঞান লাভের উপায় মাত্র।

৯. পরমূর্ত বস্তুর পুনঃ রূপায়ণ সম্ভব নয়।

## তৃতীয় যুগ

## ইবনে রুশ্‌দ

অন্ত যুগের আলিম সমাজ যদিও ইলমে কালামকে কল্পনাপুরীতে পরিণত করেন, তথাপি তাঁদের অবদান অস্বীকার করার জো নেই। কেননা, তাঁদের বদৌলতেই যুক্তিবিদ্যা এবং দর্শনশাস্ত্র জনপ্রিয়তা লাভ করে। ফলে যে সব ধর্মবিদগণ এ যাবত যুক্তিবাদভিত্তিক জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে দূরে সরে থাকতেন, তাঁরাও এ দিকে অনুরক্ত হয়ে উঠেন। ক্রমে মানসিকতায় পরিবর্তন ঘটলো। আশায়েরা মতবাদ যদিও সারা পৃথিবীতে পরিব্যাপ্তি লাভ করেছিল, তথাপি কোথাও কোথাও এর বিশ্বব্যাপী খ্যাতির মধ্য থেকে বিরোধিতার আওয়াজ উঠতে লাগলো। স্পেনে যখন ইমাম গাযালীর ইঙ্গিতে তাঁর শিষ্য মেহ্‌দী মিল্‌স্‌ম্যান-এর শাসনকে নস্যাৎ করে দিলেন এবং আবদুল মুমিন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন, তখন আশায়েরা মতবাদ রাজকীয় মতবাদে পরিণত হয়। এ পৃষ্ঠপোষকতার ফলে সেখানে যুক্তিবিদ্যা ও দর্শন প্রসার লাভ করতে থাকে এবং অর্ধ শতাব্দীরও কম সময়ে ইবনে মাজা, ইবনে তুফাইল এবং ইবনে রুশ্‌দের ন্যায় বড় বড় বিজ্ঞানী (হুকামা) ও দার্শনিক পয়দা হন। প্রাচ্যদেশে একমাত্র ফারাবী ছাড়া এঁদের সমকক্ষ কোন বিজ্ঞানী ও দার্শনিক জন্মলাভ করে নি। আবু আলী সিনা গ্রীক দর্শনের ব্যাখ্যায় অনেক ভ্রান্তির শিকারে পরিণত হন এবং ফলে শত শত ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়। এই দার্শনিকগণ সে সব ভ্রম উদ্‌ঘাটন করে প্রকৃত বিষয়টি তুলে ধরেন। এঁদের মধ্যে ইবনে রুশ্‌দ ইলমে কালামের প্রতিও দৃষ্টিপাত করেন। এজন্যই আমি তাঁর বিবরণ বিস্তারিতভাবে লিখছি।

ইবনে রুশ্‌দের পুরো নাম—আবুল ওলীদ মোহাম্মদ ইবনে রুশ্‌দ। ৫14 হিঃ মোতাবেক ১১২০ খ্রীস্টাব্দে কর্ডোবায় এক

শিক্ষিত পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর দাদা (মৃঃ ৫২০ হিঃ) স্পেনের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। ইবনে রুশ্দ কর্ডোবায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। প্রথমে ফিক্হ্, সাহিত্য এবং চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা করেন। অতঃপর দর্শনের প্রতি অনুরক্ত হন এবং ইবনে বাজ্জার নিকট এ বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেন। স্পেনের শাসনকর্তা আবদুল মুমিন জ্ঞান-বিজ্ঞানে উৎসাহী ছিলেন। তিনি ইবনে রুশ্দকে আপন দরবারে ডেকে আনেন এবং বিচারকরূপে নিযুক্ত করেন। শুধু বিচারকরূপেই নয়, বিশেষ সহচররূপেও তাঁকে বরণ করেন। দিন দিনই তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। মাত্র সাতাশ বছর বয়সে তাঁকে প্রধান বিচারপতির পদে অধিষ্ঠিত করা হয়।

আবদুল মুমিনের পর তাঁর পুত্র ইউসুফ মসনদে আরোহণ করেন। তিনিও ইবনে রুশ্দের প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করেন। গ্রীক দর্শনের প্রতি ইউসুফের বিশেষ ঝোঁক ছিল। গ্রীক দর্শনের যে সব গ্রন্থ আরবীতে অনূদিত হয়, সেগুলো ছিল কঠিন, অসমাপ্ত এবং ভ্রান্তিবহুল। তিনি ইবনে রুশ্দকে আদেশ দিলেন, ইবনে তুফাইলের পরামর্শ এবং সহযোগিতায় যেন অ্যারিস্টটলের গ্রন্থাবলীর বিস্তারিত ব্যাখ্যাপুস্তক (শরাহ) রচিত হয়। তদানুসারে ইবনে রুশ্দ বিশেষ পরিশ্রম এবং গুরুত্ব সহকারে এ কাজে হাত দেন।

৬৬৫ হিজরীতে ইউসুফ তাঁকে উশ্বিলিয়ার কাজীরূপে নিযুক্ত করেন। তিনি দু'বছর এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ সময় তিনি বিচার কার্যের সাথে সাথে গ্রন্থ রচনার কাজেও আত্মনিয়োগ করেন। এ সময়ই তিনি অ্যারিস্টটলের 'আল-হায়ওয়ান' নামক গ্রন্থটির ব্যাখ্যা-পুস্তক (শরাহ) রচনা করেন। বিচারকরূপে তিনি মাঝে মাঝে কর্ডোবা, মরক্কো এবং উশ্বিলিয়া সফর করতেন। ৫৭৫ হিজরীতে ইবনে তুফাইলের মৃত্যু হলে ইউসুফ তাঁকে ব্যক্তিগত চিকিৎসকরূপে নিযুক্ত করেন। ৫৮০ হিজরীতে ইউসুফ ওফাতপ্রাপ্ত হন এবং তাঁর পুত্র মনসুর মসনদে সমাসীন হন। মনসুরও ইবনে রুশ্দের যথেষ্ট কদর করেন। এ সময় তিনি বার্ধক্যে উপনীত হন। তাই তিনি চাকুরী ত্যাগ করে কর্ডোবায় বসবাস আরম্ভ করেন এবং গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন।

ইবনে রুশ্‌দ তাঁর সমসাময়িকদের মতামতের উর্ধ্বে উঠে ধর্মীয় বিষয়ে স্বাধীন চিন্তাধারার পরিচয় দেন। ইমাম গাযালী গ্রীক দর্শনের প্রতিবাদে যেসব গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তিনি সেগুলোরও ভুল প্রতিপাদন করেন। তিনি আপন রচনায় আশ্‌য়ারীদের ভীষণভাবে আক্রমণ করেন। ফলত ফকীহ্‌গণ তার দুশমন হয়ে উঠেন। এ ছাড়া তাঁর প্রতিকূলে আরো অনেক কারণ এসে দাঁড়ায়। ফলে মনসুর তাঁকে দ্বীপান্তরিত করেন।

দর্শনের প্রসার দেখে ফকীহ্‌গণ এত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন যে, দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা ব্যাহত হওয়ার উপক্রম হয়। বাধ্য হয়ে মনসুর আদেশ দিলেন—দর্শনের যাবতীয় গ্রন্থ পুড়ে ফেলা হোক। তদনুসারে শত শত গ্রন্থ পুড়ে ফেলা হয়। ইবনে রুশ্‌দকে তাঁর বাসভূমি থেকে দূরে লুসিনা নামক দ্বীপে বন্ধ করে রাখা হয়। তাঁর সাথে অন্যান্য দার্শনিক—আবু জাফর যাহাবী, আবু আবদুল্লাহ্ মোহাম্মদ ইবনে ইব্‌রাহীম, আবুর রাবী কাফিফ, আবু আব্বাসকেও সাজা দেয়া হয়। মনসুর মূলত ইবনে রুশ্‌দের প্রতি বিরাগভাজন ছিলেন না। তাই কোন এক ছুতো ধরে তাঁকে তওবা করানো হয় এবং দোষত্রুটি মার্জনা করে পুনরায় দরবারে ফিরিয়ে আনা হয়। তিনি হিজরী ৫৯৫ সালে পরলোকগমন করেন।

ইবনে রুশ্‌দ গ্রীক দর্শনের ব্যাখ্যায় এবং তার সহজীকরণে যে কৃতিত্বের পরিচয় দেন, তা ইউরোপে প্রচলিত একটি প্রবাদ বাক্য থেকে অনুমিত হয়। প্রবাদ বাক্যটি ছিল এইঃ

"মানুষ প্রকৃতির নিয়মাবলী অনুধাবনে সক্ষম হবে না, যতক্ষণ না সে অ্যারিস্টটলের গ্রন্থাবলী অনুধাবনে সক্ষম হয়। আবার সে অ্যারিস্টটলের গ্রন্থাবলী অনুধাবনে সক্ষম হবে না, যতক্ষণ না সে ইবনে রুশ্‌দের গ্রন্থাবলী অনুধাবনে সক্ষম হয়।"

বিখ্যাত ফরাসী জ্ঞানী অধ্যাপক রিনান ইবনে রুশ্‌দের জীবন চরিত, গ্রন্থাবলী এবং তাঁর দর্শন বিষয়ে পাঁচশত পৃষ্ঠা সম্বলিত একখানা বিশেষ গ্রন্থ রচনা করেন। এতে তিনি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন যে, জার্মানী, ফ্রান্স এবং অন্যান্য দেশের দার্শনিকগণ দীর্ঘকাল ধরে ইবনে রুশ্‌দের অনুসরণ করেন এবং নিজেদেরকে তাঁর অনুসারীরূপে পরিচয় দিতে গর্ব অনুভব করেন।

এগ্রন্থে ইবনে রুশ্‌দের দর্শন আমার প্রতিপাদ্য নয়। এজন্য ইল্‌মে কালামে তিনি যে সংস্কার করেন বা যে নতুন অধ্যায়ের সংযোজন করেন, শুধু তাই আমি লিখছি।

ইবনে রুশ্‌দের আবির্ভাবের পেছনে প্রকৃতির একটি উদ্দেশ্য ছিল। গ্রীকরা অ্যারিস্টটলের দর্শন বুঝতে যে সব ভুলের অবতারণা করেন এবং তদুপরি আবু আলী সীনা ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে তার যে বিকৃতি সাধন করেন, তা সংশোধন করা এবং তার সঠিক ব্যাখ্যা নির্ণয় করাই ছিল ইবনে রুশ্‌দের আবির্ভাবের পেছনে প্রকৃতির মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু বিভিন্ন কারণে তিনি একচেটিয়া দর্শনের সেবা করতে পারেন নি। তাঁকে ইলমে কালামের দিকেও দৃষ্টি দিতে হয়। সে সময় দর্শনের এত বেশী প্রসার ঘটেছিল যে, বহুলোক ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠে। এ পরিপ্রেক্ষিতেই ফকীহ্ এবং মুহাদ্দিসগণ যুক্তিবিদ্যা এবং দর্শন শিক্ষাকে হারাম বলে ঘোষণা করেন।

ইবনে রুশ্‌দ দর্শনের ভক্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁর এ ধারণাও প্রবল ছিল যে, দর্শন এবং শরীয়ত একই সৌধের দুটি স্তম্ভ। তাই ধর্ম দুর্বল হতে পারে, এমন কোন কাজই তিনি সহ্য করতেন না। অপর দিকে যুক্তিবিদ্যা এবং দর্শনকেও তিনি হারাম বলে মনে করতেন না। এ প্রয়োজনই তাঁকে যুক্তিভিত্তিক মতবাদ এবং ওহীভিত্তিক পরম্পরাগত মতবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে উৎসাহী করে।

তাঁর মনে এ ধারণা উদিত হবার আরো একটি কারণ ছিল। তা হলো এই যে, তিনি ছিলেন পরোক্ষভাবে ইমাম গাযালীর শিষ্য। ইলমে কালাম বিষয়ে তাঁর সামনে থাকতো ইমাম গাযালীর রচনাবলী। এ বিষয়ে তিনি দুটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ রচনা করেন ঃ (১) ফস্‌লুল মাকাল্ ও তাক্‌রিরু মা বাইনাশ্ শরীয়তে অল হিকমাতে-মিনাল্-ইত্তেসাল (২) আলকাশ্‌ফু-আন-মানাহিজিল্-আদিল্লাতে-ফি-আকাই-দিল্-মিল্লাহ্। গ্রন্থ দুটো অনেক আগেই ইউরোপে প্রকাশিত হয়। বর্তমানে মিসরে সেগুলোর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

প্রথমোক্ত গ্রন্থে তিনি এ প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, দর্শন এবং যুক্তিবিদ্যা শিক্ষা করা বৈধ কি না? তিনি স্বয়ং উত্তরে বলেন, তা শিক্ষা করা অত্যাবশ্যক (ওয়াজিব); অন্তত পছন্দনীয় (মুস্তাহাব)। এ বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শন করে তিনি বলেন, স্বয়ং আল্লাহ্‌তায়ালা

কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিশ্বের লীলাখেলা মানুষের সমক্ষে তুলে ধরে আপন অস্তিত্ব প্রমাণ করেন এবং এমনি করে মানুষকেও এরূপ প্রমাণ-পদ্ধতি অবলম্বনে উৎসাহিত করেন। কুরআনের এমনি আয়াতসমূহের আলোকেই ফকীহ্গণ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, অনুসিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রজ্ঞার প্রয়োগ করা প্রয়োজন। ফিক্হ্ শাস্ত্রে যখন এ ধরনের আয়াতের উপর ভিত্তি করে প্রজ্ঞা প্রয়োগের বৈধতা স্বীকৃত হয়েছে, তা হলে মৌলিক যুক্তির প্রমাণে তা অবৈধ হবে কেন?

অতঃপর ইবনে রুশ্দ এ আলোচনা করেন যে, কুরআনের পরোক্ষ ব্যাখ্যা দেয়া বৈধ কি না? পরোক্ষ ব্যাখ্যা (তাবিল) সম্পর্কে মতভেদ ছিল। এক সম্প্রদায় মনে করতো, তা সম্পূর্ণ অবৈধ। অপর সম্প্রদায় ছিল এর পক্ষপাতী। কিন্তু উভয় সম্প্রদায়ের নিকট এর বৈধতা বা অবৈধতা ছিল কুরআনের যে মূল বচন আছে, তার আকৃতি-প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য করে। অথচ তাদের উচিত ছিল, যাদের সম্পর্কে কুরআনের আদেশ নিষেধ অবতীর্ণ হয়েছে, তাদের জ্ঞানের পরিসর বিবেচনা করেই পরোক্ষ অর্থের বৈধতা—অবৈধতা নিরূপণ করা। ইবনে রুশ্দ এক্ষেত্রে তৃতীয় পন্থা অবলম্বন করেন। তা হলো এই যে, একমাত্র চিন্তাশীল এবং বিশেষজ্ঞেরই পরোক্ষ ব্যাখ্যা দেয়ার অধিকার আছে। সাধারণ লোককে কেবল কুরআনের প্রকাশ্য অর্থ শেখানো উচিত। কোথাও যদি তাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়, তবে তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে, এসব আয়াত রহস্যমূলক। এগুলোর উপর মোটামুটি ঈমান গ্রহণ করাই যথেষ্ট।

ইবনে রুশ্দের মতে, এসব ক্ষেত্রে আয়াতের গূঢ় তত্ত্ব সাধারণ লোকের ধারণায় আসতেই পারে না। সুতরাং সাধারণ্যে তা শিক্ষা দেয়ার মানে—কুরআনের প্রতি তাদের অবিশ্বাস ডেকে আনা। যেমন সাধারণ লোকদের যদি বলা হয়, আল্লাহ্ আছেন, কিন্তু তাঁর কোন আসন, স্থান বা দিক নেই, তা হলে এ ধরনের অস্তিত্ব তাদের ধারণায় আসতে পারে না। সুতরাং এমন কথা বলার মানে হলো আল্লাহ্ মূলেই নেই।

যে সমস্ত ঐশীবাণী পরোক্ষ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে, তাতে শুধু মুজতাহিদদের জন্যই চিন্তা ভাবনা করার অনুমতি রয়েছে। এঁরা

যদি ইজতেহাদে ভুলও করেন, তবুও অপরাধ কিছু নয়। কিন্তু যারা ইজতেহাদের উপযুক্ত নয়, তারা যদি ভুল করে, তবে মার্জনীয় নয়। এর উদাহরণ হলো, যদি কোন দক্ষ চিকিৎসক চিকিৎসায় ভুল করে, তবে তাকে অপরাধী বলে গণ্য করা হয় না। কিন্তু যদি কোন হাতুড়ে চিকিৎসক ভুল করে, তবে তাকে সেই ভুলের জন্য মাশুল দিতে হয়।

এ গ্রন্থে ইবনে রুশ্দ আশায়েরাবাদী ইলমে কালামের তীব্র সমালোচনা করেন এবং প্রমাণ করেন যে, তাঁদের প্রমাণ-পদ্ধতি যুক্তিভিত্তিক নয়, আবার ওহীভিত্তিকও নয়। ওহীভিত্তিক এজন্য নয় যে, তাঁরা কুরআনী ভাষার পরোক্ষ অর্থ করেন। তাঁরা মুহাদ্দিসীনদের ন্যায় তার বাহ্যিক ও শাব্দিক অর্থ মোটেও গ্রহণ করেন না। যুক্তিভিত্তিক এজন্য নয় যে, তাদের গ্রন্থে যে সকল যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ রয়েছে, সেগুলো যুক্তি প্রদর্শনের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হয় না।

দ্বিতীয় গ্রন্থে ইবনে রুশ্দ প্রথমতঃ আশায়েরা, মুতাযিলা এবং বাতিনিয়া-ভাবধারা এবং তাদের প্রমাণ পদ্ধতির গলদ প্রমাণিত করেন। অতঃপর আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, তওহীদ, গুণাবলী, বিশ্বের নশ্বরতা, নবী প্রেরণ, ঐশী বিধিবিধান, যুলুম ও ইনসাফ, হাশর ও নশর ইত্যাদির হকিকত বর্ণনা করেন এবং সেগুলোর বুদ্ধিভিত্তিক ও ওহীভিত্তিক প্রমাণ পেশ করেন।

এ পুস্তকটি যদিও বৃহদাকার নয়, তথাপি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লিখিত বলে এটি পূর্বকার সমস্ত গ্রন্থ থেকে স্বতন্ত্র এবং বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এদিক থেকে আল্লামা ইবনে রুশ্দকে একটি বিশেষ প্রমাণ পদ্ধতির প্রবর্তক বলা যায়।

ইলমে কালামের সাধারণ নিয়ম অনুসারে আকাইদ বিষয়ে যে সব মৌলিক প্রমাণ পেশ করা হতো, সেগুলো ছিল প্রত্যেকের নিজস্ব আবিষ্কার। কিন্তু আল্লামা ইবনে রুশ্দ উপরোক্ত বিষয়াদিতে কুরআন থেকেই সমস্ত প্রমাণ পেশ করেন। তিনি দাবী করেন এবং সুপ্রতিষ্ঠিত করেও দেখান যে, কুরআন মজীদের প্রমাণাদি একদিকে যেমন সম্বোধন ধর্মী এবং সর্বসাধারণের জন্য সান্ত্বনাদায়ক, অন্যদিকে তেমনি যুক্তিসম্মতও বটে। এর মানে পুরোপুরি যুক্তি শাস্ত্রের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ। এই প্রমাণগুলো আমি গ্রন্থের দ্বিতীয়াংশে বর্ণনা করার ইচ্ছা রাখি।

যে সব বিষয়ে ইবনে রুশ্‌দ সাধারণ আশায়েরার বিরোধিতা করেন, তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, মুজিযার যুক্তি দিয়ে নবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণ করা। আশায়েরার মতে, নবুওয়াতের সত্যতার প্রমাণ হলো মুজিযা। ইবনে রুশ্‌দ মূলত মুজিযা অস্বীকার করেন নি। কিন্তু মুজিযা দিয়ে নবুওয়াত প্রমাণিত হয়, এটা তিনি সমর্থন করেন, নি। তিনি বলেন, অবরোহ পদ্ধতি অনুসারে এমনি ধরনের প্রমাণ দুটি ভূমিকা সংযোগে সম্পন্ন হয়ঃ

গৌণ ভূমিকা—ওমুক ব্যক্তি থেকে মুজিযা জাহির হয়েছে।

মুখ্য ভূমিকা—যে ব্যক্তি থেকে মুজিযা জাহির হয়, তিনি অবশ্যই নবী।

উভয় ভূমিকায় প্রশ্নের অবকাশ রয়েছে। প্রথমতঃ এটা কি করে প্রমাণ করা যাবে যে, অলৌকিক যা কিছু ঘটে, তা কোন প্রক্রিয়া বা প্রাকৃতিক কার্যকারণ সম্ভূত নয়। দ্বিতীয় ভূমিকার যথার্থতা নির্ভর করে অপর একটি বিষয়ের উপর। তা হলো—নবুওয়াত বা রিসালতের (রসুল-পদ প্রাপ্তি) সত্যতা প্রমাণ করা। কেননা, যে ব্যক্তি নবুওয়াতে বিশ্বাসী নয়, সে কি করে এ ভূমিকা সমর্থন করতে পারে? নবুওয়াত স্বীকার করে নিলেও এটা কি করে প্রমাণ করা যাবে যে, মুজিযা কেবল নবী থেকেই জাহির হয়। হয়তো এর উত্তর এই দেয়া হবে যে, কে নবী, আর কে নবী নন, তা পর্যবেক্ষণ এবং চিরাচরিত নিয়মই বাতলে দেবে। অন্য কথায়, প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত যত মুজিযার উদ্ভব হয়েছে, তা নবী থেকেই হয়েছে। কিন্তু এ যুক্তি কেবল পরবর্তী নবীদের বেলায়ই প্রযোজ্য। সর্বপ্রথম যে নবী পৃথিবীতে আগমন করেন, এ যুক্তিতে তাঁর নবুওয়াতের সত্যতা কি করে প্রমাণিত হবে? এর পূর্বে তো কোন নবীও আগমন করেন নি এবং কোন মুজিযাও সংঘটিত হয় নি। তা হলে মানুষ কি করে বুঝতে পারবে যে, কেবল তাঁরাই নবী, যাঁদের নিকট থেকে মুজিযা জাহির হয়।

এর চাইতে বড় কথা হলো—আশায়েরাবাদীদের মতে, নবী ছাড়া অন্যান্য লোকের হাতেও সকল প্রকার অলৌকিক ব্যাপার ঘটতে পারে। যদি তাই হয়, তবে নবুওয়াতের বৈশিষ্ট্যই বা কি থাকে? আশায়েরাপন্থীরা বলেন, মুজিযা এবং অলৌকিকত্বের মধ্যে পার্থক্য

রয়েছে। মুজিযা শুধু সে ব্যক্তি থেকেই জাহির হয়, যিনি নবুওয়াতের দাবিদার এবং সত্যিকার নবী। কোন অসত্য নবী নবুওয়াতের দাবি করলেও তার নিকট থেকে মুজিযা জাহির হতে পারে না। ইবনে রুশ্দ বলেন, এটা অদ্ভুত ধরনের পার্থক্য। যখন এটা মেনেই নেয়া হলো যে, অলৌকিকত্ব কেবল নবী নয়, যে কোন লোক থেকেই জাহির হতে পারে, তা হলে এ পার্থক্য কে সমর্থন করবে যে, অলৌকিকত্ব সকল ব্যক্তির হাতেই সংঘটিত হতে পারে, কেবল মাত্র কৃত্রিম নবুওয়াতের দাবিদারের হাতে নয়।

এই হলো ইবনে রুশ্দের ভাষ্যের সারমর্ম। কিন্তু আমার মতে, ইবনে রুশ্দের এ অভিযোগ ঠিক নয়। আশায়েরা পরিষ্কার বলেছেন, মুজিযার অসাধারণত্ব যুক্তিনির্ভর নয়, বরং চিরাচরিত নিয়মই এর নিরূপক। 'শরহে মাওয়াকিফ' এবং অন্যান্য গ্রন্থে বিশেষ শিরোনামায় বিষয়টি আলোচিত হয়। ইবনে রুশ্দ যদি কোন যুক্তিভিত্তিক প্রমাণের উপর এ অভিযোগ করে থাকেন, তবে তা আশায়েরার উপর বর্তায় না। কেননা, আশায়েরার বক্তব্য হলো, মুজিযা জাহির হওয়ার পর চিরাচরিত নিয়মানুসারেই অধিকাংশ লোকের মনে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে নবুওয়াতের দাবিদারের প্রতি বিশ্বাস জমে উঠে ; তখন কারো পক্ষে তা অবিশ্বাস করার জো থাকে না।

আশায়েরা মতবাদের ডংকা সারা দুনিয়ায় বেজে উঠা সত্ত্বেও হাম্বলীপন্থিগণ সব সময় তাঁদের বিরোধিতা করেন। তাঁরা ছিলেন ঐশী বাণীর আক্ষরিক অর্থের সমর্থক। তাঁদের এবং 'মুজাস্সিমা'দের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য ছিল না। কুরআনের যে সমস্ত আয়াতে আপাতদৃষ্টিতে আল্লাহ্‌কে দিকবিশিষ্ট এবং সাকার বলে মনে হয়, সেখানে আশায়েরাবাদীরা পরোক্ষ অর্থ গ্রহণ করেন। কিন্তু হাম্বলিগণ তা মোটেই পছন্দ করেন নি। তাঁদের এ অপছন্দনীয়তা এতদূর অগ্রসর হয় যে, উভয় দলের মধ্যে কাটাকাটি হানাহানি পর্যন্ত সংঘটিত হয়। ইবনুল আসীর তাঁর ইতিহাসে এ ধরনের অনেক ঘটনা বর্ণনা করেন।

## ইবনে তাইমিয়্যাহ্

এ বিষয়টিতে আশায়েরাবাদীরা ন্যায়পথেই ছিলেন। তবুও হাম্বলীরা তাঁদের বিরোধিতা করতে থাকেন। এ বিরোধিতার ফল

ভালই হলো। আশায়েরাপন্থীদের শক্তি খুব বেড়ে গেল। তাঁদের বিরোধিতার সাহস করতে পারে, এমন কেউ তখন সারা দুনিয়ায় ছিল না।

মুতাযিলাবাদীরা সম্পূর্ণরূপে দমে গেলেন। হাদীসপন্থিগণ দীর্ঘকাল ধরে আশায়েরা থেকে স্বতন্ত্র ছিলেন। কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁরাও আশায়েরা মতাবলম্বী হয়ে উঠে অন্ততঃ তাঁদের প্রকাশ্য বিরোধিতা ত্যাগ করেন। শেষ পর্যন্ত কেবল হাম্বলীরাই তাঁদের মতবাদ অক্ষুণ্ণ রাখেন এবং আশয়ারীদের বিরোধিতায় অবিচল থাকেন। কিন্তু তাঁরা আশায়েরার যে সব মতবাদ ও আকাইদ মোটেই স্পর্শ করেন নি, যেগুলো ছিল সত্যিই আপত্তিকর এবং ত্রুটিপূর্ণ। এখন সে সব ত্রুটি শোধরাবার সুযোগ ঘনিয়ে এলো। ইমাম গাযালীর বদৌলতে দর্শন এবং যুক্তিবিদ্যা মুহাদ্দিস এবং ফকীহদের আস্তানায় স্থান লাভ করে। ফলে; এ পূত পবিত্র সম্প্রদায়েও বড় বড় চিন্তাবিদ এবং জ্ঞানীর আবির্ভাব হলো। হিজরী সপ্তম শতকে আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার আবির্ভাব হয়। তিনি ছিলেন একাধারে বড় মুহাদ্দিস, যুক্তিবিদ এবং ইলমে কালামে পারদর্শী। সে সময় ইলমে কালামে যত মতবাদ প্রচলিত ছিল, সবগুলোর উপর তিনি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করেন। আশয়ারী ইলমে কালামের সে সব বিষয়ের উপর তাঁর দৃষ্টি পড়ে, যেগুলো ছিল সত্যিই সমালোচনার যোগ্য। অথচ এ যাবত কেউ সে দিকে ভ্রূক্ষেপ করেনি। তিনি স্বাধীন এবং নির্ভীক চিত্তে সে সব বিষয়ের ভ্রম প্রতিপন্ন করেন।

ইবনে তাইমিয়ার নাম—আহমদ ইবনে আবদুল হালীম ইবনে তাইমিয়াতুল্-হাররানী। হিজরী ৬৬১ সালের ১০ই রবিউল আউয়াল তারিখে তিনি সিরিয়ার হাররান নামক এক শহরে জন্মগ্রহণ করেন। দশ-এগার বছর বয়সে তিনি প্রয়োজনীয় শিক্ষা সমাপ্ত করেন। সতর বছর বয়সে তিনি এতটুকু যোগ্যতা অর্জন করেন যে, লোকেরা তাঁর নিকট ফতোয়া গ্রহণ করতে আরম্ভ করে। এ সময় অবধি তিনি গ্রন্থ রচনায় হাত দেন। তাঁর উচ্চ মানসম্পন্ন গ্রন্থাবলী তদানীন্তন আলীমদের মুগ্ধ করে। একুশ বছর বয়সে তিনি শিক্ষকতা আরম্ভ করেন।

ইবনে তাইমিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণত্ব সকলেই একবাক্যে স্বীকার করে নেন। কিন্তু তাঁর স্বাধীন চিন্তাধারা এবং চরম ভাবাপন্নতার দরুন

একদল বড় ওলামা তাঁর বিরুদ্ধে খড়্গ হস্ত হয়ে উঠেন। তাঁরা বাদশার দরবারে ইবনে তাইমিয়ার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আনয়ন করেন, এবং তাঁর হত্যার ফতোয়াও জারি করেন। বাদশা তাঁকে দরবারে হাযির করলেন। তিনি বাদশার প্রভাব প্রতিপত্তির মোটেই পরওয়া করলেন না। তিনি স্বাধীন এবং নির্ভীক চিত্তে প্রশ্নোত্তর করলেন এবং আপন মতবাদে অবিচলিত রইলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁকে সিরিয়া থেকে দ্বীপান্তরিত করে মিসরের কারাগারে নিক্ষিপ্ত করা হলো।

কিছুদিন পর তিনি রেহাই পেলেন। ৬৯৯ হিঃ সালে তাতারীরা সিরিয়ার উপর আক্রমণ চালায়। সে সময় ইবনে তাইমিয়াহ্ জিহাদের প্রচারক এবং মুজাহিদরূপে আত্মনিয়োগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁর উৎসাহ, উদ্দীপনা, নির্ভীকতা ও অবিচলতার ফলেই মুসলিম সুলতান এবং আমীরদের মনে সাহসের সঞ্চার হয় এবং তাঁরা তাতারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সক্ষম হন। এ উদ্দেশ্যে তিনি মিসর গমন করেন এবং কয়েক বছর এ চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকেন। তিনি স্বয়ং যুদ্ধে যোগদান করেন। হিজরী ৭০৪ সালে তিনি কসর্ ওয়ানিন থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করেন এবং বিজয় গৌরব অর্জন করেন।

যদিও ইসলামের প্রতি ইবনে তাইমিয়ার দরদ, অনুরাগ ও দৃঢ় সংকল্প লোকের মনে প্রভাব বিস্তার করেছিল, কিন্তু কোন কোন প্রচলিত মতবাদের প্রতি তাঁর বিরোধিতার ফলে ওলামা সম্প্রদায় তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন এবং বাদশার নিকট অভিযোগ উত্থাপন করেন। বিষয়টি বিবেচনার জন্য একটি বড় বিতর্ক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বাদশার প্রতিনিধিও উপস্থিত ছিলেন। ইবনে তাইমিয়াহ্ বিতর্কে জয়লাভ করলেও জনসাধারণের অসন্তুষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ করা হয়। কিন্তু তিনি স্বাধীন মতামত প্রকাশে অবিচলিত থাকেন এবং সেজন্য তাঁকে কারাবরণও করতে হয়। এমনিভাবে তাঁকে বারবার কারারুদ্ধ করা হয় এবং মুক্তিও দেয়া হয়। কারার অন্তরালেই তাঁকে অন্তিম নিশ্বাস ত্যাগ করতে হয়। কয়েদখানায়ও তিনি গ্রন্থ রচনার কাজ ছাড়েন নি। শেষ পর্যন্ত তাঁর নিকট থেকে কলম, দোয়াত ইত্যাদি ছিনিয়ে নেয়া হয়। বাধ্য হয়ে তিনি রাত দিন ইবাদতে সময় অতিবাহিত করতেন। পড়াশুনা ত্যাগের

ফলে তাঁর অন্তরে কঠোর আঘাত লাগে। অচিরেই তিনি পীড়িত হয়ে পড়েন এবং বিশ দিন অসুখে ভুগে ৭২৮ সালের (হিঃ) জিলকা'দা মাসে ওফাত প্রাপ্ত হন।

তাঁর মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে চারদিক থেকে জনতা এসে ভীড় করে। যে দুর্গে তিনি কারারুদ্ধ ছিলেন, সেখানে তিলধারণেরও জায়গা ছিল না। আনুমানিক দুই লক্ষ লোক তাঁর জানাযায় উপস্থিত ছিল। শহরের সমস্ত দোকান পাট বন্ধ থাকে। তাঁর প্রতি লোকের এত ভক্তি ছিল যে, তারা আপন রুমাল বা চাদর তাঁর মরদেহে ছুঁইয়ে চুম্বন করে এবং নিজদের পবিত্র বলে মনে করে।

ইবনে তাইমিয়ার জীবনচরিত খুবই হৃদয়গ্রাহী। এ ধরনের বিস্ময়কর স্বাধীনচিত্ততা, সাহসিকতা, ন্যায়পরায়ণতা এবং আন্তরিকতার উদাহরণ পৃথিবীতে খুব কমই মেলে। এখানে সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া সম্ভব নয়। ইবনে রজব দু'খণ্ডবিশিষ্ট একখানি গ্রন্থে তাঁর বিস্তারিত জীবনচরিত লিপিবদ্ধ করেন। 'তাবাকাতুল্ হুফ্ফায্,' 'যাইল ইবনুল খাল্লিকান' ইত্যাদি গ্রন্থেও তাঁর জীবনী কিছুটা বিস্তারিতভাবে পাওয়া যায়। পাঠকগণ সেগুলো পাঠ করতে পারেন। এখানে তাঁর জ্ঞানবিষয়ক কৃতিত্ব বর্ণনা করাই আমার উদ্দেশ্য।

ইবনে তাইমিয়ার ছিল অসাধারণ মেধাশক্তি, স্মৃতিশক্তি, সাগরসম জ্ঞান এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গি। তাঁর দৈনিক রচনার গড় ছিল কমপক্ষে চল্লিশ পৃষ্ঠা এবং সবগুলোই ছিল মৌলিক ও মুজতাহিদধর্মী। তাঁর গ্রন্থ সংখ্যা অনুমানিক পাঁচ শ'। প্রায়গুলোই বৃহদাকার এবং কয়েক খণ্ডবিশিষ্ট। আল্লামা যাহাবী ছিলেন একজন বড় মুহাদ্দিস এবং ইবনে তাইমিয়ার সমসাময়িক। তিনি যেখানেই তাঁর রচনার উল্লেখ করেন, খুব শ্রদ্ধা সহকারে তাঁর নাম উচ্চারণ করেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, একজন বিজ্ঞ লোকরূপে তাঁর উপর ইবনে তাইমিয়ার কত বেশী প্রভাব ছিল!

## ইবনে তাইমিয়ার রচনাবলী

আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ্ ইলমে কালাম বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে কয়েকটির নাম পেশ করা হচ্ছে এবং নামগুলোই

বিষয়বস্তুর পরিচয় বহন করছে ঃ আল-ইতেরাযাতুল্ মিস্রিয়াহ্ (চার খণ্ডবিশিষ্ট), আর্-রদ্দু-আলা-তাসিসিদ-তাক্দিসে-লির্রাযী, শরহে মুহাস্সাল, শরহে আরবাঈনে ইমাম রাযী, রদ্দু-তায়ারুযিল্-আক্ল্ (চার খণ্ডবিশিষ্ট), রদ্দু নাসারা (চার খণ্ডবিশিষ্ট), রদ্দে-ফালসাফাহ্ (চার খণ্ডবিশিষ্ট), ইসবাতুল-মায়াদ, সুবুতুন নুবুওয়াতে-অল-মুজিয়াতে-অল-কারামাতে আক্লান-অ-নক্লান, আর্রদ্দে-আলাল্ মান্তিক।

আমি অল্প কয়েকটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করলাম। 'ফওয়াতুল ওফাইয়াত' নামক গ্রন্থে তাঁর ইলমে কালামের গ্রন্থাবলীর একটি সূচীপত্র রয়েছে। এগুলোর মধ্যে আর্রদ্দু-আলাল্-মানতিক' (অ্যারিস্টটলের যুক্তিবিদ্যার সমালোচনা) এবং 'রদ্দে-ফাল্সাফাহ্' বড় গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। আর্রদ্দু-আলাল্-মান্তিক' আমার নিকট আছে। আমি সময় মত এর গবেষণাধর্মী বিষয়গুলোর সদ্ব্যবহার করবো।

## ইলমে কালামের ভুল আবিষ্কার

ইলমে কালামে বহুদিন থেকে অনেক ভুল ধারণা চলে আসছিল এবং সেগুলো এত প্রচলিত ছিল যে, কেউ সেগুলোর বিরুদ্ধে টুঁ শব্দও করতে সাহস পেতো না। আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ্ খুব সাহসিকতা ও স্বাধীনচিত্ততা সহকারে সেগুলোর প্রকাশ্য বিরোধিতা করেন এবং বলেন, 'মুতাকাল্লিম'গণ যে সব বিষয়কে ধর্মের পরিপোষক বলে মনে করেন, বস্তুত সেগুলো হলো ধর্মের পরিপন্থী। 'আর্রদ্দু-আলাল্-মান্তিক' নামক গ্রন্থে তিনি বলেন ঃ

"আল্লাহ্কে দেখা সম্ভব—এটা অবশ্য বুদ্ধিভিত্তিক প্রমাণ দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা যায়; তবে সেই প্রমাণ আবুল হাসান আশয়ারী এবং অন্যান্যদের দেয়া প্রমাণ নয়। তাঁরা বলেন, যা কিছু বিদ্যমান, তাই দর্শনীয়। তাঁরা আরো বলেন, সকল বিদ্যমান বস্তুই পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করা যায়। অথচ এ দাবী সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এটা এমনি ধরনের ভুল যেমন মুতাকাল্লিমীন অমূলকভাবে দাবি করেন যে, (১) পরমূর্ত পদার্থের অস্তিত্ব সম্ভব নয়; (২) সমস্ত পদার্থ এক ধরনের এবং (৩) প্রত্যেক বস্তু অবিভাজ্য পরমাণুর যৌগিক; (৪) আল্লাহ্ কোন বস্তুকে কারণবশতঃ বা হেকমতের পরিপ্রেক্ষিতে

সৃষ্টি করেননি ; এবং (৫) এসব বস্তুর মধ্যে তিনি কোন বৈশিষ্ট্য বা বিশেষ শক্তিও নিহিত রাখেন নি ; (৬) সর্বনিয়ন্তা (আল্লাহ্) যে বস্তুই সৃষ্টি করেন, তা কোন বৈশিষ্ট্য ছাড়াই সৃষ্টি করেন ; (৭) আল্লাহ্ যে সব বস্তু সৃষ্টি করেন, বা শরীয়তে যে সব প্রত্যাদেশ রয়েছে, সেগুলোর সৃষ্টিমূলে বা আদেশের অন্তরালে কোন মঙ্গলা-মঙ্গলের উদ্দেশ্য নেই। মুতাকাল্লিমদের এসব ভুল-ভ্রান্তি বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। লোকেরা মনে করলো, তাঁরা যা বলেন, সেটাই মুসলমানদের ধর্ম এবং সেটাই রসূলুল্লাহ্ এবং সাহাবাদের নির্দেশ।

## মুতাকাল্লিমীন ও দার্শনিকদের ভাবধারা বিচারে স্বাধীন মতামত প্রকাশ

আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ্ ছিলেন পাষাণ, অত্যন্ত কঠোর জীবন যাপনে অভ্যস্ত এবং দর্শনবিরোধী। তিনি অনুকরণ মোটেই পছন্দ করতেন না। তিনি ন্যায়-অন্যায় খতিয়ে দেখতেন। মুতাকাল্লিম ও দার্শনিকদের ভাবধারা বিচারে তিনি সব সময় নিরপেক্ষ মতামত এবং ন্যায়ানুগ-তার পরিচয় দেন। এক স্থানে তিনি বলেন ঃ

"গ্রীক দার্শনিকগণ পদার্থ বিদ্যা এবং অংকশাস্ত্রে যেসব অভিমত ব্যক্ত করেন, তা মুতাকাল্লিমদের মতামতের চাইতে অনেকটা প্রকৃষ্ট বলে মনে হয়। কেননা, এসব বিষয়ে মুতাকাল্লিমগণ যে মতামত পোষণ করেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা জ্ঞানসম্মত নয়, যুক্তিসঙ্গতও নয়, আবার শরীয়ত মাফিকও নয়।"

## পূর্ববর্তী ধর্মবেত্তাগণের মতে ভাল-মন্দ ছিল বুদ্ধিভিত্তিক

অনেক লোক পূর্বেও মনে করতো, আর এখনো মনে করে যে, আশায়েরাবাদীদের আকাইদ বুদ্ধিভিত্তিক প্রমাণে সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। এ সত্ত্বেও পূর্ববর্তী যুগের প্রধান ধর্মবেত্তাগণ সেগুলোর যথার্থতা স্বীকার করেন এবং সেগুলোকে আপন আকাইদরূপে গ্রহণ করেন। সাধারণ লোকের ধারণা—ইসলামের প্রাথমিক যুগে বুদ্ধিবাদ 'ভাল-মন্দের' তুলাদণ্ড ছিল না। তাই সে যুগের লোকেরা এ ধারণাও পোষণ করতো না যে, শরীয়তের প্রত্যেকটি বিধানকে অবশ্যই বুদ্ধিবাদের দিক থেকে প্রকৃষ্ট হতে হবে। আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ্

সাধারণ লোকের এই ধারণাকে ভ্রান্ত বলে গণ্য করেন। তিনি এ ভ্রম প্রতিপাদন করে বলেন, আগেকার সমস্ত ধর্মবেত্তাই বুদ্ধিভিত্তিক ভাল-মন্দের সমর্থক ছিলেন। সর্বপ্রথম এ মতবাদ অস্বীকার করেন ইমাম আবুল হাসান আশয়ারী। তিনি হলেন এক নতুন মতবাদের প্রবর্তক। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে ইবনে তাইমিয়াহ্ বলেন ঃ

"বুদ্ধিভিত্তিক মঙ্গলামঙ্গলের মতবাদ অস্বীকার করা অন্যতম 'বিদাত' যা ইমাম আবুল হাসান আশয়ারীর সময় ইসলাম ধর্মে সৃষ্টি হয়। মু'তাযিলীদের সাথে অদৃষ্টবাদ নিয়ে বিতর্ক করতে গিয়ে এ মতবাদের প্রবর্তন করেন।"

## বুদ্ধিভিত্তিক ভাল-মন্দের মতবাদ সর্বপ্রথম অস্বীকার করেন ইমাম আবুল হাসান আশ্‌য়ারী

মাক্‌রিযী 'তারিখে মিসির' নামক গ্রন্থে লেখেছেন যে, আল্লামা ইবনে তাইমিয়াই সর্বপ্রথম ইসলামী আকাইদকে কলুষমুক্ত করে প্রাথমিক যুগের ছাঁচে ঢালাই করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ফকীহ্‌দের বিদ্বেষ এবং ঈর্ষার ফলে এবং কতকটা তাঁর কঠোর উক্তিতেও লোকেরা তাঁর বিরোধী হয়ে উঠে। ফলে তাঁকে বহুকাল কারাগারে অতিবাহিত করতে হয়। লোকসমাজে তাঁর প্রভাবও হ্রাস পায়। তা সত্ত্বেও তাঁর শিষ্যদের মধ্যে ইবনুল কাইয়্যেম এবং আরো অনেকে তাঁর পথ অনুসরণ করেন। তাঁরা ইলমে কালামে তেমন কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে সক্ষম না হলেও তাঁদের জোরালো লেখনীধারা বহু দীর্ঘস্থায়ী বেদাতের ভিত নড়বড়ে করে দেয়।

## শাহ্‌ ওলী উল্লাহ

ইবনে তাইমিয়া এবং ইবনে রুশদের পর বরং তাঁদের যুগেই মুসলমানদের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তির চরম অবনতি দেখা দেয়। মনে হচ্ছিল যে, এরপর বোধ হয় আর কোন বিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাবান লোকের আবির্ভাব হবে না। কিন্তু প্রকৃতির উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম জাহানে নব দ্যুতি বিকিরণ করা। তাই ইসলামের পতনোন্মুখ মুহূর্তে জন্ম নিলেন শাহ্ ওলী উল্লার ন্যায় এমন একজন মহান ব্যক্তি, যাঁর সুক্ষ্মদর্শিতার সমক্ষে গাযালী, রাযী ও ইবনে রুশদের কৃতিত্বও নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে।

শাহ্ ওলী উল্লাহ হিজরী ১১১৪ সালের ৪ঠা শাওয়াল রোজ বুধবার দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মতারিখ নির্ণায়ক নাম 'আযিমুদ্দিন'। পাঁচ বছর বয়সে তিনি মক্তবে ভর্তি হন। সাত বছর বয়সে নামায আরম্ভ করেন। এ বছরই তাঁর সুন্নাত রসম সমাধা করা হয় এবং এ বছরের শেষ ভাগেই তিনি কুরআন শরীফ শেষ করে ফার্সী ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করেন। দশ বছরের সময় তিনি 'শরহে মুল্লা' পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত করেন। চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি বিয়ে করেন। যদিও চলিত প্রথা অনুসারে সেটা বিয়ের উপযুক্ত সময় ছিল না, তথাপি বিশেষ মঙ্গলের নিরিখে তাঁর পিতা এ কাজ সম্পন্ন করতে বাধ্য হন। পনর বছর বয়সে তিনি পিতার হাতে নকশ্বন্দিয়া তরীকায় বয়াত করেন। এ বছর তিনি আনুষ্ঠানিক অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। এ সময় তাঁর পিতা আবদুর রহীম তাঁকে শিক্ষকতা করার অনুমতি দেন। এ উপলক্ষে বহু লোককে আমন্ত্রণ করা হয় এবং ধুমধামের সাথে খাওয়া দাওয়া করা হয়।

শাহ্ সাহেব পাঠ্যসূচীভুক্ত নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করেন ঃ

ফিক্হ ঃ শরহে ভিকাইয়াহ্, হিদায়াহ্।

ফিক্হের মূলনীতি ঃ হুস্সামী ও তওযীহ্, তল্বীহ।

যুক্তিবিজ্ঞান ঃ কুত্বী, শরহে মাতালে।

কালাম ঃ শরহে আকাইদ, শরহে মাওয়াকিফ্।

অধ্যাত্মবাদ ঃ আওয়ারিফ, রাসাইলে নক্শ্বন্দিয়া, শরহে রুবাইয়াতে মুল্লাজামী, লাওয়াইহ, নক্দুন্ নুসুস্।

চিকিৎসা শাস্ত্র ঃ মুয়াজ্জায

দর্শন ঃ মাইবুযী ইত্যাদি

বাক্য বিন্যাস ব্যাকরণ ঃ কাফিয়া, শরহে জামী

বাক্যালঙ্কার বিদ্যা ঃ মুতাওওয়াল, মুখ্তাসারুল মায়ানী।

জ্যোতির্বিদ্যা ও অঙ্কশাস্ত্র ঃ প্রাথমিক গ্রন্থাবলী।

আনুষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি বার বছর জ্ঞানার্জন ও শিক্ষকতায় ব্যাপৃত থাকেন। অতঃপর তিনি মক্কা মদিনায় গমন করেন এবং হিজরী ১১৪৩ সালে হজক্রিয়া সমাপন করেন। তিনি প্রায় দু'বছর তথায় অবস্থান করেন এবং সেখানে শেখ আবু তাহির এবং অন্যান্য মুহাদ্দিসের নিকট হাদীস শিক্ষা সমাপ্ত করেন।

সেখানকার অন্যান্য ওলামার নিকটও তিনি অনেক কিছু শিক্ষা করেন এবং ১১৪৫ সালের (হিঃ) রজব মাসে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

হিজরী ১১৭৬ সালে তিনি ওফাত প্রাপ্ত হন।

শাহ্ সাহেব প্রত্যক্ষভাবে ইলমে কালাম সম্পর্কে কোন বই পুস্তক রচনা করেন নি। এ জন্যই তাঁকে মুতাকাল্লিমীনের দলে শামিল করা আপাত দৃষ্টিতে সমীচীন বলে মনে হয় না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর 'হুজ্জাতুল্লাহিল্ বালিগা' শীর্ষক গ্রন্থটি হলো ইলমে কালামের প্রাণধন স্বরূপ। এতে তিনি শরিয়তের গূঢ় তত্ত্ব এবং রহস্য উদ্ঘাটন করেন।

## ইলমে কালামে শাহ সাহেবের সংযোজন

ইলমে কালামের মূল উদ্দেশ্য হলো, ইসলাম যে ঐশীধর্ম, তা প্রতিষ্ঠিত করা। ধর্ম দুটি বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিতঃ আকাইদ (বিশ্বাস) ও আহ্কাম (নির্দেশাবলী)। শাহ সাহেবের যুগ পর্যন্ত কেবল প্রথম বিষয়টি নিয়েই বই পুস্তক রচিত হয়। দ্বিতীয় বিষয়টির দিকে কেউ ভ্রূক্ষেপ করে নি। সর্বপ্রথম শাহ্ সাহেবই এ বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি 'হুজ্জাতুল্লাহিল্ বালিগার' ভূমিকায় বলেনঃ "রসূল করীমের উপর কুরআনরূপে যে মুজিযা অবতীর্ণ হয়, তার প্রত্যুত্তর আরব-অনারবদের মধ্যে কেউ দিতে পারেনি; সেইরূপ তিনি যে শরীয়ত (ধর্মীয় বিধি বিধান) প্রাপ্ত হন, তাও ছিল তাঁর জন্য অপর একটি মুজিযা। কারণ এমনি ধরনের একটি পূর্ণাঙ্গ শরীয়ত রচনা করা ছিল লোকের সাধ্যাতীত। কুরআন মজীদকে মুজিযারূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যেভাবে গ্রন্থসমূহ রচিত হয়েছে, তেমনি শরীয়তরূপ মুজিযা সম্পর্কেও স্বতন্ত্র গ্রন্থাবলী রচিত হওয়া প্রয়োজন।"

অতঃপর তিনি বলেন:

"বেদাতপন্থীরা ইসলামের অনেক বিধান সম্পর্কে এ অভিযোগ এনেছেন যে, সেগুলো নাকি বুদ্ধিসম্মত নয়। যেমন তাঁরা প্রশ্ন করে থাকেন, যে কবরের শাস্তি, হিসাব-কিতাব, পুলসিরাত, তুলাদণ্ড ইত্যাদির সাথে বিবেক-বুদ্ধির কি সম্পর্ক রয়েছে? রমযানের শেষদিন রোযা রাখা অবশ্য কর্তব্য, অথচ শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখে রোযা

রাখা হারাম—এর কারণ কি? বেহেশ্তের প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং দোযখের ভীতি প্রদর্শন করতে গিয়ে শরীয়তে যা বলা হয়েছে, তা হাস্যাস্পদ। মোটকথা, অস্বীকারকারিগণ এ ধরনের অনেক প্রশ্নই খাড়া করে থাকে। সেগুলোর জওয়াব দিতে হলে এটা প্রমাণ করতে হবে যে, শরীয়তের প্রত্যেকটি বিষয়ই বুদ্ধিসম্মত।"

শাহ্ সাহেব যে দুটি প্রয়োজন তুলে ধরেন, তাই ইলমে কালামের মৌলিক উদ্দেশ্য। এদিক থেকে আমি তাঁর গ্রন্থটিকে ইলমে কালাম বিষয়ক গ্রন্থ বলে মনে করি।

শাহ্ সাহেব 'হুজ্জাতুল্লাহিল্ বালিগা'য় ইলমে কালাম সম্পর্কীয় যে সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করেছেন, তা নিম্নরূপ ঃ

১. মানুষের প্রতি আদেশ-নিষেধের নির্দেশ কেন দেয়া হলো?
২. আল্লাহ্র স্বভাব অপরিবর্তনীয়।
৩. আত্মার গূঢ়তত্ত্ব।
৪. প্রতিদান ও শাস্তির গূঢ়তত্ত্ব।
৫. কিয়ামত সংক্রান্ত ঘটনাবলীর গূঢ়তত্ত্ব।
৬. সদৃশ (ইন্দ্রিয়াতীত) জগৎ (আলমে মিসাল)।
৭. নবুওয়াতের গূঢ়তত্ত্ব।
৮. প্রত্যেক ধর্মের হকিকত এক।
৯. বিভিন্ন শরীয়ত সৃষ্টির কারণ।
১০. এমন একটি ধর্মের প্রয়োজন ছিল, যা সকল পুরনো ধর্মকে রহিত করে।

**ইন্দ্রিয়াতীত জগৎ ঃ** এটা শাহ্ সাহেব-দর্শনের অন্যতম প্রাণ-কোষ। তাই তিনি এ বিষয়টি নিয়েই তাঁর আলোচনা আরম্ভ করেন 'হুজ্জাতুল্লাহিল্ বালিগায়'। তিনি বলেন, "অনেক হাদীসে এটা প্রতীয়মান হয় যে, অস্তিত্ব-জগতের মাঝে এমন একটি জগৎও রয়েছে, যা ভৌতিক নয়। যেসব বস্তু এ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে অনুভূত হয়, সেগুলো প্রথমে প্রকাশ লাভ করে আলমে-মিসাল অর্থাৎ সদৃশ যে সব বস্তু এ (ইন্দ্রিয়াতীত) জগতে। জগতে কায়া ধারণ করে না, সেগুলোও সেখানে গতিধারণ, উত্তরণ ও অবতরণ করে থাকে। কিন্তু সাধারণ লোকেরা তা দেখতে পায় না।

যেমনঃ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, 'সূরায়ে বাকারা' ও 'সূরায়ে আলি ইমরান' কিয়ামতের দিন বৃষ্টির আকারে উপস্থিত হবে।" অন্য একটি হাদীসে আছে, "কিয়ামতের দিন মানুষের কৃতকর্ম রূপ ধারণ করে উপস্থিত হবে। সর্বপ্রথম উপস্থিত হবে নামায, অতঃপর সদকাহ্, অতঃপর রোযা।"

অপর একটি হাদীসে বলা হয়েছে, "কিয়ামতের দিন সব বারগুলো সাধারণরূপে উপস্থিত হবে। কিন্তু শুক্রবার উপস্থিত হবে একটি উজ্জ্বল রূপ ধারণ করে।" অন্য একটি হাদীসে আছেঃ "কিয়ামতের দিন দুনিয়া একজন কুশ্রী বৃদ্ধার রূপ ধারণ করে উপস্থিত হবে।" অন্যত্র রসূল করীম (সঃ) বলেছেনঃ "আমি তোমাদের ঘরের চারদিকে বিপদসমূহকে বৃষ্টির ন্যায় বর্ষিত হতে দেখছি।"

মে'রাজের হাদীসে আছেঃ আমি চারটি নদী দেখছিঃ দুটি প্রকাশ্য, আর দুটি অপ্রকাশ্য। প্রকাশ্য দুটি ছিলো—নীল ও ফোরাত।

শাহ্ সাহেব এ ধরনের আরো অনেক হাদীস উদ্ধৃত করেছেন এবং এসব বিষয়কে আলমে-মিসাল অর্থাৎ সদৃশ (ইন্দ্রিয়াতীত) জগতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি এই জগৎকে অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। হযরত মরিয়ম জিব্রিল (আঃ)-কে দেখেছেন; হযরত জিব্রিল রসূল করীমের নিকট আবির্ভূত হতেন; ফেরেশ্তাগণ কবরে উপস্থিত হন; মৃত্যুকালেও তাঁরা হাযির থাকেন; কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ বান্দাদের সাথে কথা বলবেন—এসব বিষয়কে শাহ্ সাহেব সদৃশ (ইন্দ্রিয়াতীত) জগতের অন্তর্ভুক্ত করেন। অতঃপর তিনি বলেনঃ এ ধরনের যত বিষয় হাদীসে হয়েছে, সে সম্পর্কে তিনটি মতামত থাকতে পারেঃ

১. হয়ত বলতে হবে যে, সেগুলো প্রকাশ্য অর্থে ব্যবহৃত হবে। এক্ষেত্রে সদৃশ জগতকে অবশ্যই মেনে নিতে হবে, যেমন আমরা মেনে নিয়েছি। মুহাদ্দিসগণ যে নীতি অবলম্বন করেন, তার সারমর্ম এটাই। সুয়ূতি এ অভিমতই পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করেছেন।

২. যদি সদৃশ জগতকে না মানা হয়, তবে বলতে হবে যে, এ বিষয়গুলো লোকের কাছে এভাবেই অনুভূত হয়ে থাকে, যদিও বাস্তবে তা ঘটছে না। কুরআনে একটি আয়াত রয়েছে—"যেদিন

আকাশ প্রকাশ্য ধুয়া নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে।" এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ বলেন, এক সময় দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। ক্ষুধার দরুন লোকদের কাছে মনে হতো, আকাশ যেন ধূম্রময়। বস্তুত আকাশে কোন ধুঁয়াই ছিল না। ইবনুল মাজিশুনের মতে, কিয়ামতের দিন মানুষের সামনে আল্লাহ্‌র উপস্থিতি সম্পর্কে অনেক হাদীস রয়েছে। এর মানে হলো—লোকেরা আল্লাহ্‌কে এমনিভাবে দেখতে পারে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌ও উপস্থিত হবেন না এবং তাঁর সত্তাতেও কোন পরিবর্তন সূচিত হবে না।

৩. তৃতীয় অভিমত হলো—এ ধরনের হাদীস এবং ঘটনাগুলোকে রূপক অর্থে গ্রহণ করা হোক।

এ সব সম্ভাব্য ব্যাখ্যা প্রদানের পর শাহ্‌ সাহেব বলেন "যে ব্যক্তি তৃতীয় ব্যাখ্যা সমর্থন করেন, আমি তাঁকে ন্যায়পন্থী বলে মনে করি না।"

শাহ্‌ সাহেবের মতে, প্রথম ব্যাখ্যাটি আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের মৌলিক নীতি মাফিক। প্রথম ব্যাখ্যা দুটি যদি অন্যান্য আলিমদের নিকটও গ্রহণযোগ্য হয়, তবে দর্শন এবং ধর্মের মধ্যে কোন মতভেদই থাকে না।

শাহ্‌ সাহেবের সময় শেষ যুগীয় আশয়ারীদের লেখা ছাড়া ইলমে কালামের আর কোন রচনাই বিদ্যমান ছিল না। তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা আশয়ারী পদ্ধতিতে হয়ে থাকলেও তা তাঁর মৌলিক চিন্তাধর্মী মন-মেযাজের উপর মোটেই প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তিনি নতুন পদ্ধতি অনুসারে ইলমে কালামের বিষয়বস্তুর পুনঃবিন্যাস করেন। তিনি আশয়ারীদের প্রায় সকল প্রধান বিষয়ের বিরুদ্ধে মত পোষণ করতেন। ইলমে কালামে তাঁর যে সব গুরুত্বপূর্ণ ইজতেহাদ এবং মৌলিক চিন্তাধারা রয়েছে, তন্মধ্যে কয়েকটা এখানে পেশ করা হচ্ছে ঃ

ইলমে কালামের সবচাইতে বড় ত্রুটি ছিল এই যে, কুরআন মজীদ সম্পর্কে বিরোধীদের যে সব সন্দেহ ছিল, সেগুলো নিরসন করার চেষ্টা খুব কমই করা হতো। 'শরহে মাওয়াকিফ' ও অন্যান্য গ্রন্থে কুরআন মজীদের রচনাশৈলী সম্বন্ধীয় অভিযোগসমূহের প্রত্যুত্তর দেয়া হলেও তাতে তেমন ফায়দা হয়নি। কারণ রচনাশৈলীর চাইতে ভাবের দিক থেকেই বিরোধীদের অভিযোগ ছিল বেশী।

তফসির-গ্রন্থসমূহে অবশ্য বেশীর ভাগ অভিযোগের উল্লেখ রয়েছে এবং সেগুলোর উত্তরও দেয়া হয়েছে। কিন্তু সেগুলো সন্তোষজনক নয়। শাহ্ সাহেব সুচারুরূপে বিরোধীদের এসব অভিযোগ খণ্ডন করেন। তন্মধ্যে একটি অভিযোগ ছিল এই যে, কুরআনেএক একটি কথা দশবার বিশবার করে বর্ণনা করা হয়েছে।

## কুরআন মজীদে কোন কোন বিষয়ের পুনরাবৃত্তির গূঢ়তত্ত্ব

কুরআনে কোন কোন বিষয়কে কেন পুনঃপুনঃ উল্লেখ করা হলো—এ প্রশ্নের উত্তরে তফসির বেত্তাগণ বলেন, এতে কুরআনের বলিষ্ঠ রচনাশৈলী দেখানোই ছিল আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য। কারণ, একটি ভাবকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে বারবার বর্ণনা করা—এটা হলো কুরআনের রচনা-কৌশলের সর্বোৎকৃষ্টতার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কিন্তু এসব উত্তর ছিল সম্পূর্ণ বৃথা। কেননা, একটি বিষয়কে বিভিন্ন পদ্ধতিতে পুনঃপুনঃ প্রকাশ করা আবুল ফযল বা যুহুরীর ন্যায় কোন কোন মানুষের জন্য কৃতিত্ব হতে পারে, কিন্ত তা মহামহিম আল্লাহ্‌র মহত্ত্ব মোটেই বৃদ্ধি করতে পারে না।

শাহ্ সাহেব কুরআনের বিভিন্ন বিষয়ের পুনরাবৃত্তির কারণ বর্ণনা করে বলেন ঃ যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে, কুরআন মজীদে বিভিন্ন বিষয়ের পুনরাবৃত্তি কেন করা হলো? প্রত্যেক বিষয়কে একবার উল্লেখ করে ক্ষান্ত করা হলো না কেন? উত্তরে বলবো, এতে শ্রোতৃবর্গের জন্য দু'টি ফায়দা রয়েছে। প্রথমত এতে অজ্ঞাত বিষয় জ্ঞাত হয় এবং উদ্দিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে বিষয়টি ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হয়। দ্বিতীয়ত এতে বিষয়টির প্রতিচ্ছবি লক্ষ্য ব্যক্তির সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে এবং সে তার পূর্ণ স্বাদ আস্বাদনে সমর্থ হয়। একটি উৎকৃষ্ট কবিতার পুনরাবৃত্তি করে যেমন স্বাদ গ্রহণ করা যায়, তেমনি কুরআনের বিভিন্ন বিষয়ের পুনরাবৃত্তিতেও নব নব আস্বাদন মেলে।

## কুরআন মজীদের বিষয়বস্তুর এলোমেলো হবার কারণ

কুরআন সম্পর্কে এ যুগের একটি বড় অভিযোগ হলো এই যে, এর বিষয়বস্তুসমূহকে কালের ক্রমানুসারে সাজানো হয়নি।

একটি বিষয় শেষ হতে না হতেই অপর একটি বিষয়ের অবতারণা করা হয়। উত্তরাধিকারের বর্ণনা সমাপ্ত না হতেই আসরের নামাযের আলোচনা আরম্ভ হয়। কুরআনের একটি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে হলে তার শত স্থান বিচরণ করতে হয়।

পূর্ববর্তী ইমামদের কেউ এ অভিযোগের উত্তর দেন নি। তাঁরা এমন একটি প্রশ্ন এড়িয়ে যান, যাকে আজকাল একটি জটিল বিষয় বলে অভিহিত করা হয়। কারলায়েল রসূল করীম সম্পর্কে খুবই ভাল ধারণা পোষণ করতেন। তিনি ইসলামের প্রত্যেকটি বস্তুকে ভাল চক্ষে দেখতেন। তিনিও কুরআনের এলোপাতাড়ি বিষয় দেখে নিরুত্তর হয়ে পড়েন। তিনি এর কোন কারণ দর্শাতে পারেন নি।

শাহ্ সাহেব খুব সুন্দরভাবে এ অভিযোগটি খণ্ডন করেন। তিনি বলেনঃ যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে, কুরআনের বিভিন্ন সূরায় তার বিষয়বস্তুসমূহকে কালক্রমানুসারে না সাজিয়ে এলেমেলো-ভাবে বর্ণনা করা হলো কেন? উত্তরে বলবো, অবশ্য সবকিছুই করা আল্লাহ্র পক্ষে সম্ভব। তবে এ কাজের মধ্যে তাঁর একটি হেকমত এবং কৌশল নিশ্চয়ই নিহিত রয়েছে। তা হলো এই যে, যাদের উদ্দেশ্যে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, তাদের ভাষা এবং বর্ণনা পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য করেই কুরআনের বিষয়াদিকে সাজানো হয়েছে।

কালের ক্রমানুসারে সাজাবার যে পদ্ধতি বর্তমানকালের গ্রন্থকারগণ আবিষ্কার করেছেন, তা আরবদের কাছে অজ্ঞাত ছিল। যদি এটা বিশ্বাস না করেন, তবে প্রাক-ইসলাম যুগে জন্ম নেওয়া মুসলিম কবিদের কসীদা আলোচনা করা উচিত।

দ্বিতীয়ত কুরআনে যে বর্ণনা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে, তাতে বিভিন্ন বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করে লক্ষ্য-ব্যক্তির সামনে বিষয় বস্তুর প্রতিচ্ছবি তুলে ধরাই হলো মূল উদ্দেশ্য।

শাহ্ সাহেবের এ বর্ণনার সারমর্ম হলো এই যে, কুরআন মজীদ অবতীর্ণ হয়েছে আরবদের ভাষায়। তাঁরাই ছিলেন এর প্রাথমিক লক্ষ্য ব্যক্তি। এজন্য কুরআন শরীফে তাঁদের রচনা পদ্ধতি অবলম্বন করার প্রয়োজনও ছিল। প্রাচীন আরবদের যত গদ্য ও পদ্য রচনা রয়েছে, তাতে এ পদ্ধতির পুরোপুরি স্বাক্ষর মেলে। সেগুলোতে একাধারে বিষয়বস্তুর বর্ণনা দেখা যায় না। বরং একটি

বিষয় আরম্ভ করা হয় এবং তা শেষ না হতেই অন্য একটি বস্তুর অবতারণা করা হয়। আবার প্রথম বিষয়টি টেনে আনা হয়। কিন্তু তাতেও স্থিরতা বজায় থাকে না। আচমকা অন্য একটি বিষয়ের দিকে কলম চালনা করা হয়। কুরআনেও এ পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। দ্বিতীয়ত কুরআন মজীদের সবচাইতে বড় উদ্দেশ্য হলো, মানুষকে আল্লার প্রতি ধাবিত করা, তার আনুগত্য ও ইবাদতের বিষয়-বস্তুকে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করে লক্ষ্য-ব্যক্তির মনে একটি বিশেষ অনুভূতি সৃষ্টি করা। কুরআনের বিষয়বস্তুসমূহকে ক্রমানুসারে সাজানো হলে এরূপ অনুভূতির সৃষ্টি করা সম্ভব হতো না।

## কুরআন মজীদের বাক্য-বিন্যাস পদ্ধতি ব্যাকরণ বিরোধী হবার কারণঃ

কুরআন মজীদ সম্পর্কে একটি বড় অভিযোগ ছিল এই যে, এর অনেক জায়গাই আপাতদৃষ্টিতে বাক্য বিন্যাস-ব্যাকরণ বিরোধী। এসব স্থলে তফসির বেত্তাগণ অদ্ভূত ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। তাঁদের উদ্দেশ্য হলো, কুরআন মজীদকে প্রচলিত ব্যাকরণ মোতাবেক করে দেখানো। শাহ্ সাহেব এ সমস্যার সমাধান করে বলেনঃ

বিনীতের কাছে এ বিষয়ের সুরাহা হলো এই যে, কুরআনের অনেক জায়গা চলতি ব্যাকরণের পরিপন্থী, আবার অনেক জায়গা ভাব মোতাবেক। প্রাচীন আরবদের ভাষা এবং পরিভাষায় অনেক কিছুই ছিল চলতি ব্যাকরণের পরিপন্থী। কুরআন অবতীর্ণ হয় আরবদের ভাষায়। তাই যদি কোথাও কোথাও 'ওয়াও' বর্ণের স্থলে 'ইয়া' ব্যবহৃত হয়, অথবা দ্বিবচনের স্থলে এক বচন প্রয়োগ করা হয়, অথবা পুংলিঙ্গের স্থলে স্ত্রী লিঙ্গ ব্যবহৃত হয়, তবে বিচিত্র কিছুই নয়।

প্রাচীন ধর্মবেত্তাগণ কুরআন মজীদের সবচাইতে বড় যে মাহাত্ম্যটি এড়িয়ে গেছেন, শাহ্ সাহেব তা তুলে ধরেন। বিষয়টি হলো এই যে, সকলেই কুরআনকে শব্দালঙ্কার ও বাক্যালঙ্কারের দিক থেকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলে প্রচার করেন। কিন্তু কেউ এ কথা ভাবেন নি যে, কুরআনের সব চাইতে বড় মোজেযা হলো—তাতে আত্মশুদ্ধি, তওহীদ, রিসালত এবং পরকালের যে গূঢ়তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে, তা সমস্ত মানবিক শক্তির উর্ধ্বে।

# মুসলিম দার্শনিক

## ( হুকামা-এ-ইসলাম )

আপাতদৃষ্টিতে মুতাকাল্লিমদের আলোচনায় মুসলিম হুকামাতে (মুসলিম দার্শনিককে) অন্তর্ভুক্ত করা অযাচিত বলেই মনে হয়। কেননা, সাধারণত 'মুতাকাল্লিমীন' এবং 'হুকামা' বলতে দুটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়কেই বুঝায়। মূলত ব্যাপারটি তা নয়। দেখা যায়, একই ব্যক্তি দার্শনিকও বটে, আবার মুতাকাল্লিমও বটে। তবুও 'হুকামা' নামে আখ্যায়িত দলকে 'মুতাকাল্লিমীন' সম্প্রদায়ের পাশাপাশি অপর একটি স্বতন্ত্র দলরূপে অভিহিত করা যায়। কিন্তু 'হুকামা' শব্দটির সাথে যদি 'ইসলাম' শব্দটি জুড়ে দেয়া যায়, তবে এ দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈপরীত্য থাকে না। ইমাম গাযালী এবং ইবনে রুশ্দ 'হুকামায়ে ইসলাম' অর্থাৎ মুসলিম দার্শনিকরূপে আখ্যায়িত। কিন্তু এঁরাই আবার ইল্মে কালামের শিরোমণিরূপে পরিগণিত।

## মুসলিম দার্শনিক

দুঃখের বিষয়, আমাদের ঐতিহাসিক ও জীবনীকারগণ 'মুসলিম দার্শনিক' শীর্ষক কোন স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন নি, যাতে তাঁদের নামধাম এ সংক্রান্ত এবং তথ্য কেন্দ্রীভূতভাবে পাওয়া যেতে পারে। এতে সন্দেহ নেই যে, ইসলামী বিশ্বে মুসলিম দার্শনিক নামে একটি বিশেষ সম্প্রদায় ছিল। ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী তাঁর 'তফসীর-এ-কবীর' নামক গ্রন্থে অনেক স্থানে 'হুকামা-এ-ইসলাম' নামক সম্প্রদায়ের অনেক মতামতের উদ্ধৃতি দেন। যেমন, এক স্থানে তিনি বলেন, 'হুকামা-এ-ইসলাম' অমুক আয়াত দিয়ে প্রমাণ করেন। অন্য স্থানে তিনি বলেন, দ্বিতীয় অভিমতটি হলো 'হুকামা-এ-ইসলামের'। তিনি প্রায় স্থানে 'হুকামা' শব্দটি ব্যবহার করেন, আর এতে অর্থ করেন 'হুকামা-এ-ইসলাম'। কেননা, তিনি যেসব অভিমতের কথা উল্লেখ

করেন, সেগুলো কুরআন মজীদ সম্পর্কীয়। বলা বাহুল্য, কুরআম সম্পর্কীয় মতামত গ্রীক হুকামার ভাষ্য মোটেই হতে পারে না।

ইমান রাযী 'তফসীর-এ-কবীর' নামক গ্রন্থে মুসলিম দার্শনিকদের যে সব মতামত উদ্ধৃত করেন, সেগুলো খতিয়ে দেখলে বুঝা যায় যে, এ সম্প্রদায়ের বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল দর্শন এবং শরীয়তের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা। সূরায়ে আনয়ামের ব্যাখ্যায় যেখানে তিনি কিয়ামতের হিসাব কিতাবের গূঢ় তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন, সেখানে মুসলিম দার্শনিকদের অভিমত উদ্ধৃত করে সর্বশেষে বলেন, "এ মতামতগুলোর উদ্দেশ্য হলো নবুওয়াতের বিধান এবং দর্শনের বিধানের মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করা।" এ ধরনের কথা তিনি আরো অনেক স্থানে পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত করেন।

## ইয়াকুব কিন্দী

ইয়াকুব কিন্দী ছিলেন মুসলিম দার্শনিকদের পুরোধা। খুব সম্ভব তিনিই সর্বপ্রথম দর্শন বিষয়ে লেখনী ধারণ করেন। তিনি ছিলেন মামুনুর রশিদের সমসাময়িক। তাঁর রচনাবলী বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। এজন্য তাঁর সম্পর্কে কিছু লেখা সম্ভব নয়। এরপর আবুনসর ফারাবী (মৃত্যুঃ ৩৩৯ হিঃ) জোরালো প্রবন্ধসমূহ লিখে শরীয়ত এবং দর্শনের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করার চেষ্টা করেন। সেগুলোর সারমর্ম হলো এই ঃ

## ফারাবী

১. মানুষ দুটি বস্তুর সমষ্টি ঃ আত্মা এবং শরীর। আত্মার কোন রং-রূপ নেই, দিকও নেই এবং তা ইঙ্গিতযোগ্যও নয়। অবশ্য, শরীর এসব গুণে গুণান্বিত হতে পারে। শরীয়তের পরিভাষায় আধ্যাত্মিক এবং জড়-জাগতিক বিষয় যথাক্রমে 'আদেশ' (আম্‌র) এবং 'সৃষ্টি' (খাল্‌ক্‌) রূপে অভিহিত। কুরআন মজীদের আয়াত এ মর্মেই সাক্ষ্য বহন করছে। আল্লাহ্‌ বললেন, "মনে রেখো! সৃষ্টি এবং আদেশ তাঁরই (আল্লাহর) কর্তৃত্বাধীন।" ইমাম গাযালীও 'সৃষ্টি' এবং 'আদেশের' এই ব্যাখ্যা দেন।

## ইসলামী আকাইদের ব্যাখ্যায় ফারাবী

২. যে ব্যক্তির আত্মা পরিশোধিত ও পরিমার্জিত, তিনিই নবুওয়াত-প্রাপ্ত হন। সাধারণ আত্মা যেমন পার্থিব জগতের

উপর কর্তৃত্ব করে, তেমনি পরিশোধিত আত্মা কর্তৃত্ব করে স্বর্গীয় জগতের উপর।

## নবুওয়াত

এ কারণেই নবীদের হাতে অতি-প্রাকৃতিক মুজিযার উদ্ভব হয়। 'লওহে মাহফূয' অর্থাৎ আল্লাহ্‌র জ্ঞানরাজ্যে যা কিছু আছে, তা প্রতিবিম্বিত হয় পরিশোধিত আত্মায়।

৩. মামূলী আত্মার ব্যাপার হলো এই যে, যখন তা বাতিনের (অভ্যন্তরীণ দিকের) প্রতি লক্ষ্য করে, তখন যাহিরের (বাহ্যিক) দিকটা তার সামনে থেকে দূরে সরে যায়। আবার যখন তা যাহিরের দিকটির প্রতি লক্ষ্য করে, তখন বাতিনের দিকটা চাপা পড়ে যায়। কিন্তু ঐশী ক্ষমতাপ্রাপ্ত আত্মার বেলায় তা হয় না। তাকে কোন বস্তুই কোন বস্তু থেকে বিরত রাখতে পারে না।

## ফেরেশতা

৪. ফেরেশতা একটি আকৃতি, যা সবর্তমান এবং যা উপলব্ধি করা যায়। এর প্রকৃত অস্তিত্ব অনুভব করা আধ্যাত্মিক ব্যাপার। কেবল ঐশিক ক্ষমতাপ্রাপ্ত লোকেরাই এই অনুভূতি লাভ করে থাকে। এ সত্যটি উপলব্ধি করার সময় পরিশোধিত ও উন্নত আত্মার অধিকারী লোকের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞান স্বর্গীয় ক্ষমতার পানে ঝুঁকে পড়ে। তখন সে ফেরেশতাদের সশরীরে দেখতে পায় এবং তাঁদের আওয়াজও শুনতে পায়। এ আওয়াজই হলো ওহী।

## ওহী

প্রকৃত ওহী বলতে বুঝায় আত্মার সাথে ফেরেশতার একাত্মতা। ফেরেশতার মনের ভাব আত্মার উপর এমনিভাবে ছায়াপাত করে, যেমন পানির ভেতর প্রতিবিম্বিত হয় সূর্যের কিরণ। এই একাত্মতার অবস্থায় পরিশোধিত আত্মার অধিকারী লোক ফেরেশতার প্রতিচ্ছবি এবং আওয়াজ অনুভব করে। এমতাবস্থায় তার যাহির ও বাতিন (বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ) উভয় দিকের উপর চাপ পড়ে। ফলে তার মধ্যে অচৈতন্যের ভাব দেখা দেয়।

## লওহ্-ও-কলম

লওহ্-ও-কলম বলতে দেহধারী বিশেষ কোন হাতিয়ারকে বুঝায় না ; এতে বুঝায় আধ্যাত্মিক জগতের ফেরেশতারাজি। 'লিখন' বলতে বুঝায় বাস্তবে যা ঘটে, তার ছবি অঙ্কন। কলম, 'আদেশ-জগত' (আলম-এ-আমরা) থেকে ভাব গ্রহণ করে এবং সেভাব আধ্যাত্মিক লিখনের সাহায্যে লওহের উপর অঙ্কিত হয়। লওহ এবং কলমের যুগ্ম ক্রিয়ায় যে অভিব্যক্তি ঘটে, তাকেই বলা হয় আল্লাহ্‌র বিধিবিধান বা তকদীর।

আল্লাহর সত্তা উপলব্ধি করার মানে হলো—অনুগত ও তুষ্ট আত্মার পূর্ণতা লাভ। এটাই আত্মার চরম তৃপ্তি ('নুসূসে ফারাবী' থেকে গৃহীত)।

ফারাবীর পর বু-আলী সীনা বিষয়টিকে আরো ফলাও করে বর্ণনা করেন। তিনি দার্শনিক মনোবৃত্তি নিয়ে কুরআনের কোন কোন সূরার তফসীর রচনা করেন। 'শিফা' এবং 'ইশারাত' নামক গ্রন্থদ্বয়ে তিনি নবুওয়াত, পরকাল, মন্দের সৃষ্টি, দোয়ার প্রতিফলন, ইবাদতের আবশ্যকতা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে উৎকৃষ্ট অধ্যায়সমূহ সংযোজিত করেন এবং সেগুলো যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন।

## বু-আলী সীনা

এখানে এটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ইমাম গাযালীর ধারণায়, বু-আলী সীনা পরকালীন দৈহিক পুনরুত্থান অস্বীকার করেন। তাই তিনি বু-আলীকে কাফের বলে আখ্যায়িত করেন। বস্তুত ব্যাপারটি তা নয়। তিনি পরিষ্কার ভাষায় দৈহিক পুনরুত্থান স্বীকার করেন। তিনি 'শিফা' নামক গ্রন্থে দৈহিক পুনরুত্থান সম্পর্কে আল্লাহ্ তত্ত্বের অধ্যায়ে বলেন :

"আমাদের নবী আমাদের শিরোমণি, আমাদের অধিনায়ক যে সত্য শরীয়ত নিয়ে আবির্ভূত হন, তা দৈহিক শাস্তি ও প্রতিদানের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করে।"

## অলৌকিক ঘটনা

মুজিযা এবং অলৌকিক ঘটনাবলী ছিল শরীয়তের এক বিরাট সমস্যা। বু-আলী সীনা এ সমস্যাটি সমাধান করেন। মুজিযা সম্পর্কে

গ্রীক দার্শনিকগণ কোন অভিমত প্রকাশ করেন নি। তাঁরা এটা স্বীকারও করেন নি, আবার অস্বীকারও করেন নি। আল্লামা ইবনে রুশদ 'তাহাফাতুত্ তাহাফা' নামক গ্রন্থে বলেন, পূর্ববর্তী দার্শনিকগণ মুজিযা সম্পর্কে কোন অভিমত ব্যক্ত করেন নি। প্রাচীন পদার্থবিদেরা, যাঁরা আজকাল জড়বাদী বা প্রকৃতিবাদী বলে অভিহিত, তাঁরা অলৌকিক ঘটনাবলীতে মোটেই বিশ্বাস করতেন না। ধর্মাবলম্বীরা অলৌকিক ঘটনাবলীতে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু তাঁরা এর সমর্থনে কোন যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ দিতে সক্ষম ছিলেন না। এজন্য তাঁদের বিশ্বাস অন্ধ অনুকরণ বলে বিবেচিত হয়। বু-আলী সীনাই সর্বপ্রথম দর্শন-নীতির আলোকে অলৌকিক ঘটনাবলীর সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করেন। আল্লামা ইবনে রুশদ 'তাহাফা' নামক গ্রন্থে বলেন, "আমি যতটুকু জানি, ইমাম গাযালী অলৌকিক ঘটনাবলী প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দার্শনিকদের যে চিন্তাধারার উদ্ধৃতি দেন, তা ইবনে সীনা ছাড়া অন্য কোন দার্শনিকের মতবাদ নয়।"

বু-আলী সীনা 'ইশারাত' নামক গ্রন্থের একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে এ বিষয়টি বিশেষভাবে আলোচনা করেন। তিনি যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ দিয়ে বলেন, একজন 'কামিল' অর্থাৎ শরীয়তের দিক থেকে নিষ্কলঙ্ক আদর্শবান ব্যক্তির পক্ষে এটা সম্ভব যে, তিনি ইচ্ছা করলে খাওয়া দাওয়া না করেও বেশ কিছুকাল জীবিত থাকতে পারেন; গায়েবী খবর দিতে পারেন; দোয়ার সাহায্যে বৃষ্টিপাত ঘটাতে পারেন; অদৃশ্য থেকে আওয়াজ শুনতে পারেন; ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুও দেখতে পারেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

বু-আলী সীনা এসব কি করে প্রমাণ করলেন, তা গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশে বর্ণনা করা হবে।

## ইবনে মিসকাওয়াইহ

আহমদ ইবনে মিস্কাওয়াইহ্ এ যুগেই পয়দা হন। ৪২১ হিজরী সালে তিনি ওফাত প্রাপ্ত হন। তিনি দর্শন এবং শরীয়তের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য একটি বিশেষ গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি দর্শনে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। গ্রীক দর্শনে ফারাবী এবং ইবনে রুশ্দ ছাড়া আর কেউ তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না। তাঁর

রচনাবলীর মধ্যে 'তাহযীবুল আখলাক' মিসর ও ভারতে প্রকাশিত হয় এবং 'তাজারিবুল উমাম' মুদ্রিত হয় ইউরোপে। শেষোক্ত গ্রন্থটি একটি যুগ সৃষ্টিকারী রচনা।

## ইবনে মিস্কাওয়াইহ্-এর রচনাবলী

দর্শন এবং শরীয়তের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য তিনি 'আল্-ফওযুল আসগর' এবং 'আলফওযুল্ আকবর' নামক দুটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। প্রথমটি বৈরুতে প্রকাশিত হয়। আমি তা পাঠ করেছি। এতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে (১) আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব এবং তাঁর গুণাবলী। (২) আত্মার গূঢ় তত্ত্ব ও বৈশিষ্ট্য। (৩) নবুওয়াত। ইবনে সীনার বর্ণনা পদ্ধতি তত মার্জিত নয়, কিন্তু ইবনে মিসকাওয়াইহের বর্ণনা পদ্ধতি খুব পরিচ্ছন্ন ও প্রাঞ্জল। এই বৈশিষ্ট্য তাঁর রচনাবলীর সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়।

## ইবনে মিসকাওয়াইহ্ রচিত 'আল-ফওযুল-আসগর

এ গ্রন্থটি বিষয়বস্তুর দিক থেকে খুবই ব্যাপক। কিন্তু বর্ণনার পদ্ধতির দিক থেকে সংক্ষিপ্ত। এতে আলোচ্য বিষয়বহির্ভূত কিছুই নেই। এর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আলোচনা করছি:

## আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের উপলব্ধি মুশকিল কেন?

আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব—এ বিষয়টি সহজ থেকেও সহজ; আবার কঠিন থেকেও কঠিন। এর উদাহরণ হলো—সূর্য খুবই উজ্জ্বল। কিন্তু এই ঔজ্জ্বল্যের দরুনই তাতে কোন চোখ তিষ্ঠিতে পারে না এবং বাদুড়ও তাকে দেখতে পায় না। আল্লাহ্‌র হকিকতের সাথে মনুষ্য-জ্ঞানের অনুরূপ সম্পর্ক।

মানুষের উপলব্ধি আরম্ভ হয় পঞ্চ ইন্দ্রিয় থেকে। সে কোন বস্তু অনুভব করে ত্বক, নাক, কান, জিহ্বা ও চোখ দিয়ে। যতক্ষণ কোন জড় বস্তু তার সামনে থাকে, ততক্ষণ সে ইন্দ্রিয়জ্ঞান দিয়ে তা উপলব্ধি করে। কিন্তু তার এ উপলব্ধি ক্রমান্বয়ে এত উন্নতি লাভ করে যে, সেই বস্তুর আকৃতি তার কল্পজগতেও অংকিত হয়। এটা হলো জড় জগত থেকে চিন্তা জগতে প্রবেশ করার প্রথম

মঞ্জিল। ক্ষেত্র বিশেষে মানুষ যে খণ্ড জ্ঞান হাসিল করে, তার মধ্য দিয়েই সে অখণ্ড জ্ঞান অর্জন করে। অখণ্ড জ্ঞানের সাথে অবশ্য জড় পদার্থের কোন সংযোগ নেই, কিন্তু তা ইন্দ্রিয়অর্জিত খণ্ডজ্ঞান থেকে উদ্ভূত বলে তাকেও জড় প্রভাব মুক্ত বলা চলে না।

'মানুষ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উপলব্ধি করে—এটা আজন্ম ব্যাপার। সুতরাং যে বস্তু জড় নয় এবং যার সাথে ইন্দ্রিয়ের কোন সম্পর্ক নেই, তা উপলব্ধি করা স্বভাবতই কঠিন। এ কারণেই মানুষের পক্ষে আল্লাহকে উপলব্ধি করা মুশকিল। আল্লাহ্ অজড়। তাঁর সাথে ইন্দ্রিয়ের কোন সম্পর্ক নেই। চিন্তাবাদীরা (আরবাব-এ-নযর) ইন্দ্রিয়ের ঊর্ধ্বে উঠতে চেষ্টা করছেন এবং এমন সব বস্তুর হকিকত উপলব্ধি করার প্রয়াস পাচ্ছেন, যেগুলো অজড়। যেমন অখণ্ড জ্ঞান, বিবেক ও আত্মা—এ ধরনের চিন্তামূলক বিষয়ের গূঢ় তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনে ব্রতী হলে দীর্ঘ সাধনার পর একটি অজড় বস্তুকেও উপলব্ধি করা সম্ভব হয়ে উঠে এবং তা উন্নতি লাভ করে প্রত্যয়ের আকার ধারণ করে।

ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো এই যে, ব্যষ্টিতে সব সময় পরিবর্তন সাধিত হয়। তাই ব্যষ্টিগত জ্ঞানেরও পরিবর্তন না হয়ে পারে না। ধরুন, এক ব্যক্তি আমাদের সামনেই উপবিষ্ট রয়েছে। তার মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটছে, তা আপাতদৃষ্টিতে ধরা পড়ছে না। কিন্তু সর্বক্ষণই তার শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষয় সাধিত সাধিত হচ্ছে এবং তদস্থলে নতুন অঙ্গের সৃষ্টি হচ্ছে। এটাকেই বলা হয় স্থলাভিষিক্তকরণ। এইজন্যই ব্যষ্টিগত জ্ঞান পূর্ণ ও স্থায়ী হয় না। কারণ, তা ক্ষণে ক্ষণে বদলে যায়। পক্ষান্তরে, অখণ্ড ও বিশ্বজনীন জ্ঞান অপরিবর্তনীয়। বিশেষ বিশেষ মানুষ যেমন যায়েদ, বকর বা হামিদের অবস্থায় পরিবর্তন সাধিত হওয়ায় মানব জাতির হকিকতে কোন পরিবর্তন সূচিত হয় না। এমনিভাবে জ্ঞান যতই জড়—প্রভাবমুক্ত হয়, ততই তা পরিবর্তনের ঊর্ধ্বে চলে যায় এবং সেই জ্ঞান অপরিবর্তনীয় হয়। এইজন্যই সামগ্রিক জ্ঞান, আঙ্গিক জ্ঞান থেকে অনেক বেশী স্থায়ী ও উত্তম।

উপরিউক্ত ভূমিকা থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, আল্লাহ্‌কে উপলব্ধি করা মানুষের ক্ষমতাধীন হলেও তা সাধারণ

মানুষের জন্য সম্ভব নয়। কেবলমাত্র সেসব লোকেরাই আল্লাহ্কে উপলব্ধি করতে সক্ষম, যারা ইন্দ্রিয় জগতের উর্ধ্বে উঠে কল্পনার পাখায় ভর করে অজড় বস্তু সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করে। এদের ঐশিক বস্তু উপলব্ধি করার জন্য জড় উপাদান বা ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন নেই।

## আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব প্রমাণ

এটা সবারই জানা কথা, বস্তু মাত্রই গতিশীল। গতি বলতে আমি কেবল স্থানের পরিবর্তন বুঝি না; যে কোন পরিবর্তনকেই গতিরূপে অভিহিত করি। যেমন শরীর—এটা বাড়ে, কমে, আবার একই অবস্থায়ও থাকে। প্রথমোক্ত দুই অবস্থায় স্পষ্টতই পরিবর্তন দৃষ্ট হয়। তৃতীয় অবস্থাটিও মূলত পরিবর্তনশূন্য নয়। কারণ সর্বদাই শরীরের পুরনো অঙ্গ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং তদস্থলে নতুন অঙ্গ স্থানলাভ করে। এটা হলো আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণের প্রথম ভূমিকা।

দ্বিতীয় ভূমিকা হলো—গতিশীল বস্তুর মধ্যে যে গতি আছে, তার একজন স্রষ্টা নিশ্চয়ই রয়েছে। যদি না থাকে, তবে এটা প্রমাণিত হবে যে, বস্তু নিজেই আপন গতির স্রষ্টা। কিন্তু এটা সত্য নয়; কেননা, আমরা দেখতে পাই যে, মানুষ গতিশীল এবং এ গতি তার স্বেচ্ছাধীনও বটে। কিন্তু এ গতিকে যদি তার সত্তাগত সৃষ্টি বলা হয়, তবে এটাই প্রমাণিত হবে যে, মানুষের হাত-পা কেটে ফেলা হলেও তার মূল অঙ্গ এবং বিচ্ছিন্ন অঙ্গ—উভয়ের মধ্যেই গতি বিদ্যমান থাকবে। অথচ মূল অঙ্গ বা বিচ্ছিন্ন অঙ্গ—কোনটাতেই গতি বহাল থাকে না।—

'গতিশীল বস্তুর মধ্যে যে গতি আছে, তার একজন স্রষ্টা অবশ্যই রয়েছে'—এ নীতির উপর ভিত্তি করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, যাবতীয় সৃষ্টির স্রষ্টা এমন একটি সত্তা, যা গতিবিহীন। কেননা, তা-ও যদি গতিশীল হয়, তবে তার গতির জন্য অপর একজন স্রষ্টার প্রয়োজন হবে। আবার সেই স্রষ্টার জন্য আরো এক-জন স্রষ্টার আবশ্যক হবে। এমনিভাবে এমন এক পর্যায়ের দিকে ব্যাপারটি গড়িয়ে যাবে, যার অন্ত নেই। এরূপ অন্তহীনতা অবান্তর।

সুতরাং যে সত্তা স্বয়ং গতিশীল নয়, কিন্তু সমস্ত গতির সৃষ্টি করে এবং যা অনন্ত গতিশীল বস্তুর উৎসমূল, সে-ই-আল্লাহ্।

ইবনে মিস্কাওয়াইহের এ যুক্তি মূলত অ্যারিস্টটল থেকে গৃহীত। বরং সত্যিকার বলতে গেলে অ্যারিস্টটল হুবহু এ যুক্তিই পেশ করেছিলেন। তিনি বলতেন—'বিশ্ব চিরন্তন। কিন্তু এর গতি সৃষ্ট ও নশ্বর। আল্লাহ্ই এ গতির স্রষ্টা।' তাঁর এই অভিমত হুবহু ওঁদেরই ন্যায়, যাঁরা বলেন, মৌল উপাদান চিরন্তন। কিন্তু তার বিভিন্ন আকারে যে রূপান্তর ঘটে, তা হলো নশ্বর। এ রূপান্তর সাধন করা আল্লাহ্রই কাজ।

## ইবনে মিসকাওয়াইহের যুক্তির প্রতিবাদ

ইবনে মিসকাওয়াইহের এ যুক্তি যথাযথ নয়। কেননা, বিরুদ্ধ-বাদীরা প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন যে, বস্তুর মধ্যে যে গতি রয়েছে, তা হলো আঙ্গিক এবং বস্তুর বিভিন্ন অঙ্গের সংযোজনেরই ফল। ইবনে মিসকাওয়াইহের এ দাবী—'গতিশীলতা যদি বস্তুর প্রকৃতিগত ব্যাপার হতো, তবে তার বিভিন্ন অঙ্গকে বিচ্ছিন্ন করার পরেও সেই গতি অক্ষুণ্ণ থাকতো'—নিরর্থক। কারণ, বস্তুর প্রকৃতি হলো তার বিভিন্ন অঙ্গের সংযোজনেরই নামান্তর। তাই তার কোন একটি অঙ্গকে বিচ্ছিন্ন করা হলে সাবেক সংযোজনই বিদ্যমান থাকে না। তাই সেই গতিও অব্যাহত থাকতে পারে না। বস্তুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বতন্ত্র রূপ ধারণ করলে তার গতিও স্বতন্ত্র হতে বাধ্য।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই মুতাকাল্লিমগণ আল্লাহ্র অস্তিত্ব প্রমাণে অন্য যুক্তি পেশ করেন। সেগুলো দুর্বল হলেও অন্তত অ্যারিস্টটলের যুক্তির চাইতে অনেকটা দৃঢ়।

এই যুক্তি প্রদর্শনের পর ইবনে মিসকাওয়াইহ্ আল্লাহ্র গুণাবলী প্রমাণ করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ একক, চিরন্তন ও অজড়। ইবনে মিস্কাওয়াইহ্ আল্লাহ্র গতিহীনতার উপর ভিত্তি করেই এসব গুণাবলী প্রমাণ করেন। নিম্নে বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হচ্ছে ঃ

## আল্লাহ্র এককত্ব

আল্লাহ্ যদি একাধিক হয়, তবে তাদের মধ্যে এমন একটি বৈশিষ্ট্য অবশ্যই থাকবে, যার উপর ভিত্তি করে সবাইকে আল্লাহ্র রূপে

আখ্যায়িত করা যায়। পক্ষান্তরে, তাদের মধ্যে এমন একটি অসামঞ্জস্যমূলক অঙ্গও থাকতে হবে, যাতে তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে। এমতাবস্থায় আঙ্গিক সংযোজনের প্রশ্ন দাঁড়ায়। আবার সংযোজনের ফলে সৃষ্টি হয় গতি। অথচ এটা স্বীকৃত হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র সত্তার কোন গতি নেই।

## চিরন্তনতা

যে বস্তু চিরন্তন নয়, তা গতিশীল। কারণ, অস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে উত্তীর্ণ হওয়াও এক প্রকার গতি। অথচ এটা স্বীকৃত হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র মধ্যে কোন গতি নেই।

## অশরীরিত্ব

আল্লাহ্ যদি শরীরী হতেন, তবে নিশ্চয়ই গতিশীল হতেন। শরীরী বস্তুর গতিশীলতা পূর্বেই প্রমাণিত হয়েছে। আর এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ গতিশীল নন।

## বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণে বিশ্বজগতের সৃষ্টি

আল্লাহ অবশ্য সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তিনি তার প্রত্যক্ষ স্রষ্টা নন। কারণ প্রত্যক্ষভাবে এক বস্তু থেকে একাধিক বস্তু সৃষ্টি হতে পারে না। কেবল নিম্নলিখিত ক্ষেত্রেই তা সম্ভব ঃ

১. যে বস্তু বিভিন্ন শক্তির সমন্বয়ে গঠিত হয়। যেমন, মানুষ বিভিন্ন উপাদান এবং বিভিন্ন শক্তির সমন্বয়ে গঠিত। তাই তার বিভিন্ন শক্তিতে বিভিন্ন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে থাকে।

২. হাতিয়ার বিভিন্ন ধরনের হবে। যেমন একজন মিস্ত্রী, বিভিন্ন হাতিয়ার দিয়ে বিভিন্ন কার্য সম্পন্ন করে থাকে।

৩. উপাদানের বিভিন্নতার ফলে ফলাফলও বিভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন আগুনের কাজ হলো পুড়িয়ে ফেলা। লোহা এতে গলে যায়, কিন্তু মাটি কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। আগুনের ক্রিয়া উভয়স্থানে একই থাকে। কিন্তু রূপ পরিগ্রহকারী উপাদান অর্থাৎ লোহা এবং মাটির প্রকৃতি ভিন্ন হওয়ায় তাদের মধ্যে আগুনের প্রতি ক্রিয়াও বিভিন্ন হয়ে থাকে।

আল্লাহ্‌র সত্তায় উপরিউক্ত তিনটি কারণের কোনটাই দৃষ্ট হয় না। আল্লাহ্ বিভিন্ন উপাদান ও শক্তির যৌগিক হতে পারেন না—

এটা একটা সুস্পষ্ট কথা। দ্বিতীয় বিকল্পটিও বাতিল। কারণ পরম সত্তার যদি বিভিন্ন হাতিয়ার থাকে, তবে তাদের স্রষ্টাই বা কে? যদি অন্য কেউ সেগুলো সৃষ্টি করে থাকে, তবে আল্লাহ্‌র একাধিক্য প্রমাণিত হয়। যদি আল্লাহ্ নিজেই তাদের সৃষ্টিকর্তা হন, তবে সেগুলো সৃষ্টি করতে অপরাপর হাতিয়ারের প্রয়োজন হবে। আবার সেই অপরাপর হাতিয়ার সৃষ্টির জন্য কতগুলো হাতিয়ারের প্রয়োজন দেখা দেবে। এমতাবস্থায় অন্তহীন হাতিয়ারের প্রয়োজনীয়তা মেনে নিতে হবে। অথচ কোন বস্তুর অন্তহীনতা অবান্তর।

এখন বাকী থাকে তৃতীয় বিকল্প। এতেও এ প্রশ্ন জাগে যে, এসব মৌল উপাদান সৃষ্টি করলো কে? আল্লাহ্ স্বয়ং তো বিভিন্ন বস্তু সৃষ্টি করতেই পারেন না। যদি অন্য কেউ সৃষ্টি করে থাকে, তবে আল্লাহ্‌র একাধিক্য প্রতিপন্ন হয়। যেহেতু উপরিউক্ত কোন বিকল্পই আল্লাহ্‌র সত্তার পক্ষে সম্ভব নয়, তাই একমাত্র পন্থা হলো—আল্লাহ্ স্বয়ং একটিমাত্র বস্তু সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তা সৃষ্টি করেছে অপর একটি বস্তু এবং এমনিভাবে একটি থেকে অপরটি উৎপন্ন হয়েছে এবং সৃষ্টি হয়েছে সমগ্র বিশ্ব। সৃষ্টির ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস হলো এই যে, আল্লাহ্ সর্বাগ্রে আদি জ্ঞান (আক্‌ল-এ-আওয়াল) সৃষ্টি করেছেন এবং তা সৃষ্টি করেছে আত্মা। আবার আত্মা সৃষ্টি করেছে আকাশ এবং আকাশ সৃষ্টি করেছে সমগ্র জগত।

আল্লামা ইবনে মিস্‌কাওয়াইহ্ এ বর্ণনার পর বলেন, অ্যারিস্টটলই সর্বপ্রথম এ মতবাদ প্রকাশ করেন। তিনি আরো বলেনঃ আমি এসব বিবরণ ফারফুরিউস থেকে উদ্ধৃত করছি।

## আল্লাহ্ অনস্তিত্ব থেকেই বিশ্ব সৃষ্টি করেন

জড়বাদীদের মতে, অনস্তিত্ব থেকে কোন বস্তুই সৃষ্টি হতে পারে না। বিশ্বে যা কিছু অস্তিত্ব লাভ করে, তার মৌল উপাদান পূর্ব থেকেই বিদ্যমান রয়েছে। তাই বলতে হয়, এই মৌল চিরন্তন। আল্লাহ্ মৌল উপাদান সৃষ্টি করেন নি। বরং মৌল উপাদান যে আকার পরিগ্রহ করে, তাই আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। জালিনুসও অনুরূপ মত পোষণ করেছেন। তিনি তাঁর অভিমত প্রমাণের জন্য একটি গ্রন্থও রচনা করেন। ইসকান্দর আফরুসী নামক একজন গ্রীক দার্শনিক এ

গ্রন্থের বিষয়বস্তু খণ্ডন করেন। আল্লামা ইবনে মিস্‌কাওয়াইহ্, ইস্‌কান্দর আফরুসীর অভিমত সমর্থন করেন এবং তাঁর বিবরণকে ফলাও করে বিবৃত করেন। সে বিবরণের সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

এতটুকু সবার জানা আছে যে, জড় পদার্থ এক আকার থেকে যখন অন্য আকারে রূপান্তরিত হয়, তখন সাবেক আকার সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়। যদি তা না হয়, তবে আকারটি হয়তো অন্য বস্তুতে অনুপ্রবেশ করবে, নয়তো পূর্ববৎ পূর্বস্থানেই অবিচলিত থাকবে। প্রথমোক্ত বিকল্পটি যে স্পষ্টত গলদ, তা আমরা স্বচক্ষেই দেখছি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—আমরা যখন মোমের একটি গোলাকার বলকে সমতল আকৃতিতে রূপান্তরিত করি, তখন এর গোলাকৃতি অপর কোন বস্তুতে অনুপ্রবেশ করে না। দ্বিতীয় বিকল্পটিও অবাস্তব। কেননা বস্তুটির দ্বিতীয় আকার ধারণ করার পর প্রথম আকারটিও যদি বিদ্যমান থাকে, তবে পরস্পর বিরোধী আকারের মিলন ঘটার সম্ভাবনা দেখা দেয়। অর্থাৎ একই সময়ে একই বস্তু, উদাহরণস্বরূপ বলতে গেলে, গোলাকারও হয়, আবার সমতলও হয়।

এজন্য এটাই মেনে নিতে হবে যে, যখন কোন বস্তু নতুন আকার পরিগ্রহ করে, তখন তার সাবেক আকার সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়। তাই অবশ্যই বলতে হবে যে, নতুন আকার অনস্তিত্ব থেকেই অস্তিত্ব লাভ করে।

উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে এটা পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হলো যে, পরমূর্ত-পদার্থ যেমন, আকার, বর্ণ, স্বাদ, গন্ধ—এসব অনস্তিত্ব বা শূন্য থেকেই সৃষ্টি হয়। এখন শুধু এ প্রমাণ বাকী রয়েছে যে, পদার্থ কিভাবে শূন্য থেকে অস্তিত্ব লাভ করে। এর জন্য নিম্নলিখিত ভূমিকাগুলো মনে রাখা প্রয়োজন ঃ

১. যৌগিক পদার্থের বিশ্লেষণ করা হলে তা শেষ পর্যন্ত এক অমিশ্র মৌল উপাদানে গিয়ে ঠেকে।

২. এটা সকলের জানা আছে যে, মৌল উপাদান কোন অবস্থায়ই নিরাকার হতে পারে না। অজস্র পরিবর্তন সাধিত হলেও তাতে কোন না কোন আকার অবশ্যই বিরাজ করবে। কেননা মৌল উপাদান এবং আকার—এ দুটি বস্তু অবিচ্ছেদ্য।

৩. পূর্বেই প্রমাণিত হয়েছে যে, আকার চিরন্তন নয়, বরং তা অনস্তিত্ব থেকেই অস্তিত্ব লাভ করে। এর সাথে যখন এটাও প্রমাণিত হলো যে, মৌল উপাদান কোন অবস্থায়ই আকার শূন্য হতে পারে না, তখন এটাও প্রতিপন্ন না হয়ে পারে না যে, মৌল উপাদান অবশ্যই অনিত্য এবং নশ্বর। তা না হয়, আকারকেও চিরন্তন বলতে হবে। সর্বশেষে এটাই প্রতিষ্ঠিত হলো যে, মৌল উপাদান নশ্বর ও পরিবর্তনশীল। এই নিরিখে এটাও স্বীকার করতে হবে যে, সমস্ত মৌল উপাদান শূন্য থেকেই অস্তিত্ব লাভ করেছে। এটা একটা অবিমিশ্র বস্তু। এর পূর্বে এমন কোন বস্তুই বিদ্যমান ছিল না, যা থেকে মৌলিক উপাদান সৃষ্টি হতে পারতো। এটাই হলো ইবনে মিসকাওয়াইহের বিবরণের সারাংশ।

এখানে একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, অধিকাংশ গ্রীক দার্শনিকের মতে, বিশ্ব চিরন্তন। অ্যারিস্টটলও অনুরূপ মত পোষণ করেন। ইসলামী আকাইদ অনুসারে বিশ্ব চিরন্তন নয়। এজন্য ইবনে মিসকাওয়াইহ্ গ্রীক দার্শনিকদের মধ্যে কেবল সেই সম্প্রদায়ের মত ও যুক্তি গ্রহণ করেন, যারা বিশ্বকে নশ্বর ও পরিবর্তনশীল বলে অভিমত প্রকাশ করেন। এই সম্প্রদায় যেসব প্রমাণ পেশ করেন, তা থেকেই ইবনে মিসকাওয়াইহ্ উপকৃত হন।

## রূহ বা বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন আত্মা

আল্লামা ইবনে মিসকাওয়াইহ এ আলোচনাটি নিম্নের ভূমিকাসহকারে আরম্ভ করেন ঃ

রূহের গূঢ় তত্ত্ব ; এর অস্তিত্ব ; শরীরের বিলুপ্তির পর রূহের স্থায়িত্ব—এ বিষয়গুলো খুবই সূক্ষ্ম এবং জটিল। অথচ এসব বিষয়ের উপরই পরকালের অস্তিত্বের প্রমাণ নির্ভরশীল। তাই এ বিষয়গুলো নিয়ে প্রথমেই আলোচনা করা প্রয়োজন।

অ্যারিস্টটল প্রমুখ রূহ সম্পর্কে যা লিখেছেন, তা ছিল খুবই এলোমেলো এবং অস্পষ্ট। আল্লামা ইবনে মিসকাওয়াইহ্ বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেন। কিন্তু এ বর্ণনায়ও ধারাবাহিকতার অনেক অভাব দৃষ্ট হয়। এজন্য আমি তাঁর পূর্ণ বিবরণের সারাংশ ঝরঝরে করে পেশ করছি।

## রূহের অস্তিত্ব ও অজড়ত্ব

জড় বস্তুর বৈশিষ্ট্য হলো তা কোন না কোন আকার ধারণ করবেই। যতক্ষণ একটি আকার বিলুপ্ত না হয়, ততক্ষণ তা অন্য আকার পরিগ্রহ করতে পারে না। যেমন কোন রৌপ্য পেয়ালাকে যদি সোরাইতে রূপান্তরিত করতে হয়, তবে পেয়ালার আকার বিলুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তা সোরাইর আকার ধারণ করতে পারে না। সকল জড় বস্তুতেই এই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান আছে। যে বস্তুতে এই বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত, তা জড় বস্তু নয়।

কিন্তু মানুষ যখন কোন বস্তুর হকিকত উপলব্ধি করতে শুরু করে, তখন সে বস্তুর আকার তার আত্মায় অঙ্কিত হয়। আবার ঠিক সেই মুহূর্তেই সে অন্য একটি বস্তুর হকিকতও উপলব্ধি করতে সক্ষম। মানুষের আত্মা একই সময় একাধিক বস্তু হৃদয়ঙ্গম করতে পারে এবং একাধিক আকারও তার আত্মায় ছায়াপাত করে। সে যতই হকিকত উপলব্ধি করার চেষ্টা করে, ততই তার বোধশক্তি বৃদ্ধি পায়। এতে প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের উপলব্ধি-ক্ষমতা জড়বস্তু নয়। যে বস্তু একই সময় বিভিন্ন আকার পরিগ্রহ করতে পারে এবং বিভিন্ন বস্তু উপলব্ধি করতে পারে, তাকেই রূহ বা বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন আত্মা বলা হয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে, দেহের যে অংশে কোন বস্তু অনুভূত হয়, তাই অন্তর এবং তাই রূহ।

কেউ এটা অস্বীকার করতে পারে না যে, মানুষের মধ্যে বোধ-শক্তি রয়েছে, যদ্দ্বারা সে সকল বস্তু হৃদয়ঙ্গম করে। যারা আত্মা অস্বীকার করে, তাদের মতে, এ বোধশক্তি হয়তো একটি জড়বস্তু, নয়তো তার একটি বৈশিষ্ট্য। মতভেদের মূল কারণ হলো-এ বোধশক্তি জড়, না-কি অজড়?—এ প্রশ্নটা। এর অজড়ত্বের সমর্থনে ইবনে মিসকায়াইহ্ বিভিন্ন যুক্তি প্রদর্শন করেন। এগুলোর বেশীর ভাগ অ্যারিস্টটল থেকে গৃহীত।

## আত্মার অজড়ত্বের প্রথম প্রমাণ

জড় ইন্দ্রিয়ের বৈশিষ্ট্য হলো, যখন তা কোন শক্তিশালী বস্তুকে অনুভব করে, তখন তার শক্তি ক্ষীণ হয়ে পড়ে। যেমন কোন ব্যক্তি যখন সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকে, তখন তার দৃষ্টিশক্তি ব্যাহত

হয় এবং তা কর্ম সম্পাদনে অক্ষম হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে, চিন্তামূলক বিষয়ের অনুধাবনে আত্মার ক্ষমতা আরো বেড়ে যায়। এতে প্রমাণিত হয় যে, এ শক্তি জড় নয়।

কিন্তু আত্মার অজড়ত্বের এ প্রমাণ দুর্বল। কারণ, আত্মাও কোন কোন ক্ষেত্রে অক্ষম হয়ে পড়ে। যেমন আল্লাহকে উপলব্ধি করা। এ ক্ষেত্রে আত্মার সেই অবস্থা হয়, যা সূর্যের দিকে তাকাতে গিয়ে চোখের হয়ে থাকে।

## দ্বিতীয় প্রমাণ

ইন্দ্রিয়ের বৈশিষ্ট্য হলো—তা কোন শক্তিধর বস্তুকে অনুভব করার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত দুর্বল বস্তুকেও অনুভব করতে পারে না। এটা এমনি ধরনের ব্যাপার, যেমন সূর্যের দিকে তাকানোর ফলে যখন চোখের জ্যোতিতে ধাঁধা লাগে, তখন বেশ কিছুক্ষণ তা মামুলি বস্তুকেও দেখতে পায় না। কিন্তু আত্মার অবস্থা তদ্‌রূপ নয়। এতে প্রতিপন্ন হয় যে, উপলব্ধি-ক্ষমতা জড়বস্তু নয়।

কিন্তু এ প্রমাণও ধোপে টেকে না। আত্মিক শক্তিরও সেই একই দশা। যখন তা কোন সূক্ষ্ম এবং জটিল বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায় এবং দীর্ঘ সময় ধরে তার সমাধানে নিমগ্ন হয়, তখন কিছু সময় পর্যন্ত তার পক্ষে সহজ থেকে সহজ বিষয়ে মনোনিবেশ করাও কষ্টকর বলে মনে হয়।

## তৃতীয় প্রমাণ

মানুষ যখন কোন সূক্ষ্ম এবং চিন্তামূলক বিষয় নিয়ে ধ্যান করে, তখন সে জড়বস্তুসমূহ থেকে তার দৃষ্টি সরিয়ে নেয় এবং নির্জনতা অবলম্বন করে। তখন সে কোন বস্তুর দেখা-শোনা, ঘ্রাণ নেয়া বা স্পর্শ করা—এসব কিছুই পছন্দ করে না। কেননা, এসব বস্তু তার চিন্তাধারায় অন্তরায়ের সৃষ্টি করে। এতে প্রমাণিত হয় যে, বোধশক্তি জড়পদার্থ নয়। যদি এমন কিছু হতো, তবে তা পারিপার্শ্বিক জড়বস্তু এবং বাহ্য ইন্দ্রিয় থেকে মুক্ত হওয়া মোটেই পছন্দ করতো না এবং মুক্ত হতেও পারতো না।

এ প্রমাণও যথার্থ নয়। এটা অবশ্য ঠিক যে, মানুষ চিন্তাভাবনা করার সময় প্রত্যেক জড়বস্তুর সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন করে। কিন্তু

এ বিচ্ছিন্নতা হলো আপাতদৃষ্টিতে। মূলত চিন্তাভাবনার সময়ও মানুষ সে সব ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞানকে কাজে লাগায়, যা পূর্ব থেকেই তাঁর মস্তিষ্কে সন্নিবিষ্ট থাকে। কল্পনার সময়ও মানুষ জড় জ্ঞান থেকে সাহায্য না নিয়ে পারে না। তবে পার্থক্য হলো এতটুকু— চিন্তাভাবনার সময় সে উপস্থিত এবং সম্মুখস্থ ইন্দ্রিয় জ্ঞান থেকে সাহায্য না নিয়ে পুরনো ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান থেকেই সাহায্য গ্রহণ করে। কারণ উপস্থিত জ্ঞানের সাথে তার উদ্দেশ্যের কোন সম্পর্ক নেই।

## চতুর্থ প্রমাণ

মানুষ এমন অনেক বিষয়ের ধ্যান করে, যার সাথে ইন্দ্রিয়ের কোন সম্পর্ক নেই। যেমন পরস্পর বিরোধী দুটি বস্তুর সমন্বয় অবাস্তব; আল্লাহ্ বিদ্যমান; সর্বোচ্চ আকাশের উপর শূন্য বলতে কিছু নেই, আবার তা অন্য কিছুতে ভরাও নয় - এসব চিন্তাগর্ভ বিষয়। এগুলোর সাথে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের কোন সম্পর্ক নেই।

এ প্রমাণও যথার্থ নয়। উপরিউক্ত বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করা হলে বুঝা যাবে যে, এগুলোর সাথেও জড়বস্তু এবং ইন্দ্রিয়ের যোগ-সূত্র রয়েছে। যেমন আমরা অজস্র ক্ষেত্রে দেখতে পাই যে, দুইটি পরস্পর বিরোধী বস্তুর মিলন হয় না। তাই আমরা সার্বিকভাবে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে, পরস্পর বিরোধী দুটি বস্তুর সমন্বয় অবাস্তব। কিন্তু এটাও আমাদের ভাবতে হবে যে, এই ব্যাপক জ্ঞানটি সেই সব অজস্র আংশিক এবং খণ্ড জ্ঞান থেকে অর্জিত, যার সাথে ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে।

## পঞ্চম প্রমাণ

উপলব্ধি-ক্ষমতা বৃদ্ধ বয়সে বৃদ্ধি পায় এবং সজীবতা লাভ করে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, এর সাথে জড়বস্তুর সম্পর্ক নেই। তা না হয় শারীরিক দুর্বলতা উপলব্ধি-ক্ষমতাকে দুর্বল করে দিতো।

এ প্রমাণগুলো অ্যারিস্টটল থেকে গৃহীত। ইবনে মিসকাওয়াইহ্ প্লেটোর প্রমাণাদিরও উদ্ধৃতি দেন। কিন্তু এগুলো কেবল সাধারণ লোকের জন্যই উপযোগী। এর মধ্যে কেবল একটি প্রমাণই দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আল্লামা ইবনে মিসকাওয়াইহ্ তা খুব

সংক্ষেপে এবং অপূর্ণভাবে বর্ণনা করেন। যদি এর সাথে আরো কিছু ভূমিকা সংযোজিত করা যায়, তবে তা নিশ্চয়ই একটি জোরালো প্রমাণ হবার যোগ্যতা রাখে। তাই আমি সে প্রমাণটি পেশ করছি ঃ

## আত্মা ও তার অজড়ত্বের একটি দৃঢ় প্রমাণ

এটা সকলেই দেখতে পায় যে, মানব দেহে বিভিন্ন অঙ্গ রয়েছে এবং এদের ক্রিয়াও ভিন্ন ভিন্ন। মুখ বাক্-ক্রিয়া সম্পন্ন করে; কান শ্রবণ করে; নাক ঘ্রাণ নেয়—এসব ক্রিয়া বাহ্য কোন বস্তুর প্রভাবে সম্পন্ন হয় না। এ সবের উৎস রয়েছে মানুষের অভ্যন্তরে। আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, মানুষের মধ্যে যে সংবেদন বা ভাবাবেগ রয়েছে যেমন, ক্রোধ, দয়া, প্রেরণা, ভালবাসা, স্মৃতিশক্তি, কল্পনা—এগুলোর উৎপত্তিস্থল ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু তা মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশেই রয়েছে।

এটাও স্পষ্টত বুঝা যায় যে, মানুষের বিভিন্ন ভাবাবেগ সাহায্যকারী বস্তুরূপেই কাজ করছে এবং সেগুলো নিজের জন্যে নয়, অপর একটি ক্ষমতার জন্যই আপন আপন ক্রিয়া সম্পন্ন করে চলেছে। এদের নির্দেশক এবং পরিচালকের উপর এমন একটি শক্তি রয়েছে, যা এদেরকে আপন উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত ও পরিচালিত করে। হাত যা স্পর্শ করে, চোখ যা দেখে, কান যা শোনে—এসব ক্রিয়া স্বয়ং হাত, চোখ বা কানের কোন কাজে আসে না, বরং আরো একটি সুপ্ত ক্ষমতা রয়েছে, যা এদের কর্মফলে উপকৃত হয়। ইন্দ্রিয়শক্তি বিভিন্ন প্রকারের অভিজ্ঞান সরবরাহ করে, কিন্তু এসব অভিজ্ঞান দিয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজন অন্য একটি শক্তির।

এ শক্তিটি সেখানেই স্পষ্টত বুঝা যায়, যেখানে ইন্দ্রিয় অনুভূতি ভুলের শিকারে পরিণত হয়। যেমন দূরবশত একটি বড় বস্তুকে ছোট বলে মনে হয় এবং বাহ্য চক্ষু তাকে ছোট বলেই মনে করে। কিন্তু অন্তর চক্ষু এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, বাহ্য চক্ষু ভুল করেছে। এখানে ইন্দ্রিয় চক্ষুর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

এখানে এ প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, সেটা কোন বস্তু, যা এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানকে পরিচালিত করে? জড়-

বাদীরা বলেন, তা হলো মস্তিষ্ক। এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ রয়েছে এবং প্রত্যেকটি অংশ স্বতন্ত্র শক্তির উৎস। কিন্তু তাতে এমন কোন চালক ক্ষমতার প্রমাণ মেলে না, যা বিশেষ বিশেষ শক্তিগুলোকে পরিচালিত করতে পারে। তাতে এমন কেন্দ্রীয় শক্তিরও সন্ধান মেলে না, যার কাজে আঙ্গিক শক্তিগুলো হাতিয়াররূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে যে, যে বস্তু জড়াত্মক এবং যা দেহের অংশ বিশেষ, তা সাহায্যকারী হওয়ার চাইতে বেশী কিছু হতে পারে না। সুতরাং যে বস্তু এসব অঙ্গ-প্রতঙ্গ এবং ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানকে পরিচালিত করবে, তাকে অবশ্যই এসবের চাইতে শ্রেষ্ঠ এবং অজড় হতে হবে। কেননা, যদি জড় বস্তু হয়, তবে তাও হবে হাতিয়ারস্বরূপ এবং তার ক্রিয়া হবে বিশিষ্ট এবং সীমাবদ্ধ। এই সামগ্রিক পরিচালক শক্তিই হলো—রূহ বা বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন আত্মা।

এখন একমাত্র সন্দেহ রইলো এই যে, এ রূহ হয়তো স্বমূর্ত না হয়ে পরমূর্ত হতে পারে। যেমন বর্তমান জড়বাদীরা বলেন যে, এই আত্মা হলো দেহের গঠন বা তার অঙ্গ সংযোজনের একটি অবস্থা মাত্র। ইবনে মিসকাওয়াইহ্ নিম্নলিখিত যুক্তি দিয়ে এ সম্ভাবনা নাকচ করে দেন ঃ

১. যে বস্তুটি স্বয়ং বিভিন্ন আকার ও বিভিন্ন অবস্থা পরিগ্রহ করে, তা সে সব আকার বা অবস্থার সহগোত্রীয় হতে পারে না। জড়বস্তু সাদা, কালো, লাল—বিভিন্ন রং ধারণ করে। তাই তার সত্তা হবে বর্ণহীন। তা না হলে তা কি করে বিভিন্ন বর্ণ ধারণ করতে পারে?

আত্মা প্রত্যেক বস্তুর কল্পনা করতে পারে। তাতে যে কোন আকার পরিগ্রহ এবং অনুধাবন করার যোগতা রয়েছে। তাই বলতে হয়, আত্মা পরমূর্ত বা গুণবাচক পদার্থ নয় এবং পরমূর্ত বস্তুর যে নয়টি বৈশিষ্ট্য যেমন অবস্থা, সংখ্যা, কাল, পাত্র ইত্যাদি রয়েছে, তাদের কোনটির আওতায় পড়ে না।

২. জড় পদার্থের দোষ গুণ, ইত্যাদি পরমূর্ত বা গুণবাচক বস্তু বলে অভিহিত। পদার্থ সৃষ্টির সাথে সাথেই তার সাথে এই পরমূর্ত বস্তুগুলোর সংযোগ ঘটে। গুণ অস্থায়ী। তাই এর মানও নগণ্য।

সুতরাং যে বস্তু সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, দৈহিক শক্তি এবং বাহ্য ও অভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়ের উপর কর্তৃত্ব করে, তা পরমূর্ত (গুণবাচক) হতে পারে না।

এ যুক্তিকে আমরা অন্য শব্দে আরো ফলাও করে এবং আরো সাবলীল উপায়ে বর্ণনা করতে পারি। এটা সর্বজনবিদিত যে, মানুষের দেহ এবং দৈহিক অবস্থা পরিবর্তনশীল। আধুনিক জড়বাদীরা বলেন, ত্রিশ বছর পর মানবদেহের মৌল উপাদানের একটি অণুও বিদ্যমান থাকে না। পূর্বের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বদলে যায় এবং সাবেক দেহের ন্যায় সম্পূর্ণ নতুন অন্য একটি দেহ গঠিত হয়। এ সত্ত্বেও মানবদেহে এমন একটি বস্তু রয়েছে, যা সব সময় অপরিবর্তিত থাকে। এই নিরিখে বলা হয় যে, "এই হামিদ হলো সেই ত্রিশ বছর আগেকার হামিদ।" এ বস্তুকেই আমরা রূহ বা বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন আত্মারূপে অভিহিত করি।

বলা বাহুল্য, এ বস্তু পরমূর্ত অর্থাৎ গুণবাচক হতে পাবে না। কেননা, পর বিদ্যমান এবং গুণবাচক বস্তু সব সময় পরিবর্তিত হয়। অথচ রূহ বা আত্মা এমন একটি বস্তু, যা সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যেও অক্ষত থাকে।

## আত্মার চিরন্তনতা

পূর্বেই প্রমাণিত হয়েছে যে, আত্মা স্ববিদ্যমান এবং অজড় বস্তু। তাই এটাও প্রতিপন্ন হলো যে, তা ধ্বংসনীয়ও নয়। কারণ ধ্বংসশীলতা জড় পদার্থেরই বৈশিষ্ট্য। যে বস্তুর সাথে জড়ত্বের কোন সম্পর্ক নেই, তা কি করে ধ্বংস হতে পারে?

আধুনিক গবেষণার আলোকে এ মতবাদটি খুব সহজেই প্রতিষ্ঠিত করা যায়। আধুনিক ধ্যানধারণা নিশ্চিতভাবে এটা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, কোন বস্তুই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। কেবল তার রূপ বদলে যায়। তার অঙ্গগুলো ভিন্ন ভিন্ন হয়ে অন্য একটি আকার ধারণ করে। সারা পৃথিবী জুড়েও যদি একটি অণুকে ধ্বংস করতে চেষ্টা করে, তবুও তা সম্ভব হবে না।

পূর্বেই প্রমাণিত হয়েছে যে, আত্মা যৌগিক পদার্থ নয়, বরং তা অবিমিশ্র বস্তু। তাই এর আঙ্গিক বিশ্লেষণও সম্ভব নয়, এর অঙ্গের পরিবর্তনও সম্ভব নয়। সুতরাং এর বিনাশও সম্ভব নয়।

## নবুওয়াত

নুবুওয়াতের গূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করতে হলে প্রথমে সৃষ্টি জগতের ক্রমবিকাশ ও তার ক্রমোন্নতি সম্পর্কে গবেষণা করা প্রয়োজন।

## সৃষ্টি জগতের ক্রমোন্নতি

সৃষ্টির প্রথম স্তরে ছিল কতগুলো একক ও অবিমিশ্র মৌল উপাদান। সেগুলোর সংমিশ্রণের ফলে সর্বপ্রথম সৃষ্টি হয় জড় জগত। এটা হলো যৌগিক সৃষ্টির নিম্নতম স্তর। অতঃপর তা উন্নতি লাভ করে উদ্ভিদ জগতে উন্নীত হয়। উদ্ভিদ জগত উন্নতির বিভিন্ন মঞ্জিল অতিক্রম করতে থাকে। এ জগতে প্রথমে সৃষ্টি হলো তৃণ। কিন্তু এ তৃণ বীজ থেকে নয়, তা জন্ম লাভ করে স্বাভাবিকভাবেই। অতঃপর সৃষ্টি হলো বৃক্ষ। বৃক্ষরাজিও উন্নতির অনেক ধাপ অতিক্রম করে। ফলে, সৃষ্টি হলো এমন এমন বৃক্ষ, যার কাণ্ড, শাখা, ফল, ফুল ইত্যাদি রয়েছে এবং যার জন্য প্রয়োজন হয় উৎকৃষ্ট ভূমি, পানি ও বায়ুর। ক্রমোন্নতির ফলে এদের মধ্যে সৃষ্ট হলো জৈব বৈশিষ্ট্য। ফলে, তাদের সীমারেখা প্রাণী জগতের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ালো। যেমন খেজুর বৃক্ষ। এ শ্রেণীর বৃক্ষের মধ্যে প্রাণী জগতের ন্যায় পুরুষ ও স্ত্রী জাত হয়ে থাকে এবং যেভাবে নর-মাদার সঙ্গমের ফলে সন্তানের সৃষ্টি হয়, তেমনি এ বৃক্ষ শ্রেণীর মধ্যেও সহ-মিলনের দরুন ফল উৎপন্ন হয়ে থাকে। এ বৃক্ষে যতক্ষণ সহ-মিলন না হয়, ততক্ষণ সেগুলো ফলবতীও হয় না। রসূল করীম বলেনঃ

তোমাদের ফুফু খেজুর বৃক্ষের সম্মান কর। কেননা হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করার পর যে মাটি উদ্বৃত্ত ছিল, তা দিয়েই এ বৃক্ষ সৃষ্টি করা হয়।

## উদ্ভিদ জগত

উদ্ভিদ ক্রমোন্নতির ফলে প্রাণী জগতের সীমারেখায় প্রবেশ করে এবং তা এমন এক বৃক্ষ শ্রেণীতে পরিণত হয়, যা প্রাণী জগত ও উদ্ভিদ জগতের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে। যেমন, প্রবাল কীট, ঝিনুক। আল্লামা ইবনে মিসকাওয়াইহের যুগে পদার্থ বিদ্যার ততটা উন্নতি হয়নি। তাই তিনি প্রবাল কীট ও ঝিনুকের উদাহরণ দেন। অধুনা

এমন কতক উদ্ভিদের সন্ধান পাওয়া গেছে, যা একাধারে জৈবিক ও উদ্ভিজ্জ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। যেমন এক ধরনের গুল্ম (মানুষ খেকো গাছ), যা বৃক্ষে ঝুলে থাকে। কোন জীব নিকটে গেলে তার দিকে ঝুঁকে প'ড়ে হঠাৎ তাকে জড়িয়ে ধরে এবং সমস্ত রক্ত চুষে খায়। ফলে তার মৃত্যু ঘটে।

উদ্ভিদ ক্রমবিকাশের ফলে প্রাণী স্তরে উপনীত হয় এবং প্রথম ধাপে স্বাধীন গতিসম্পন্ন পোকা মাকড়ে পরিণত হয়। এ স্বাধীন গতি ছাড়া তা উদ্ভিদ থেকে আর কোন অংশে উন্নত নয়। কিন্তু ক্রমোন্নতির ফলে তাতে কেবল স্পর্শেন্দ্রিয়ই নয়, অন্যান্য ইন্দ্রিয় শক্তিও গজাতে আরম্ভ করে। এ ক্রমবিকাশের দরুন এমন প্রাণীরও সৃষ্টি হয়, যাতে ত্বক, কান, নাক, চোখ, জিহ্বা—পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সব-কিছুই বিদ্যমান থাকে। এর পরেও উন্নতি অব্যাহত থাকে। প্রথম পর্যায়ের প্রাণী অবশ্য বুদ্ধিহীনই হয়। কিন্তু ক্রমশ তা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও চাতুর্যের অধিকারী হয়ে উঠে। এমনকি, তারা ধীরে ধীরে উন্নতি করে মনুষ্য জগতের সীমারেখায় উপনীত হয়। যেমন বানর ইত্যাদি। এরা যখন পশুত্বের স্তর অতিক্রম করে আরো উন্নতির পথে ধাবিত হয়, তখন মানুষের ন্যায় এদেরও দৈহিক গঠন সরল হয়ে উঠে। এদের কল্পনা শক্তিও অনেকটা মানুষের মত হয়ে উঠে। এই স্তরে পশুত্বের অবসান ঘটে এবং মনুষ্যত্বের সূচনা হয়। আমরা দেখতে পাই আফ্রিকার কোন কোন স্থানে মানুষ এবং পশুর মধ্যে তেমন বিশেষ ব্যবধান নেই।

ক্রমবিকাশের এ ধারা মানব জাতির মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। চিন্তাশক্তি, ধী শক্তি, আত্মিক পবিত্রতা এবং চারিত্রিক উন্নতি সাধন করে মানুষ ফেরেশতার কাছাকাছি গিয়ে উপনীত হয়। এই স্তরকেই আমরা নবুওয়াত এবং রিসালত বলে অভিহিত করি।

## ওহীর হকিকত

মানুষের জ্ঞান-ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে বিকাশ লাভ করে। মানুষ প্রথমে জড়বস্তুর হকিকত উপলব্ধি করে; অতঃপর চিন্তামূলক বিষয়ের, অতঃপর কাল্পনিক বস্তুর। সে যখন শেষোক্ত পর্যায়ে উন্নীত হয় (পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এ পর্যায়টি নবুওয়াত বলে অভিহিত), তখন কোন বস্তুর হকিকত উপলব্ধি করার জন্য তাকে আর

অগ্রসর হতে হয় না। বরং সে একচোটেই যাবতীয় বস্তুর হকিকত উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ যে ব্যাপারটি অন্যান্য লোক খণ্ডজ্ঞান, চিন্তাশক্তি ও বিভিন্ন ভূমিকা প্রয়োগে উপলব্ধি করে, তা একজন নবী চিন্তা-ভাবনা ব্যতীত একচোটেই হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম। এটাকেই বলা হয় 'ওহী' বা 'ইলহাম'। এর মাধ্যমেই নবী সবকিছু উপলব্ধি করেন।

নবী কখনো কখনো কল্পনার স্তর থেকে ইন্দ্রিয় জ্ঞানের স্তরে নেমে আসেন। তিনি বিচার বুদ্ধি বলে কোন একটি বিষয়বস্তুর গূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করেন; অতপর তা চিন্তা-শক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করে; অতঃপর চিন্তা-শক্তি কল্পনা-শক্তির উপর; অতঃপর কল্পনা-শক্তি ইন্দ্রিয়-শক্তিকে প্রভাবিত করে। ফলে, যে বিষয়টি ছিল কাল্পনিক এবং জড়ত্বের ঊর্ধ্বে, তা তাঁর কাছে ভৌতিক বলে অনুভূত হয়। এটা এমন একটি ব্যাপার, যেমন কল্পনা-শক্তির সাহায্যে মানুষ স্বপ্নযোগে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আকারসমূহ দেখতে পায় বা আওয়াজ শুনতে পায়।

ইন্দ্রিয় এবং জড়জ্ঞান উন্নতি করে যেমন অজড় এবং ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞানে পরিণত হয়, তেমনি ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞানও নিম্নস্তরে নেমে এসে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আকার ধারণ করে। নবিগণ ফেরেশতার যে আকার দেখতে পান বা যে আওয়াজ শুনতে পান, তার রহস্য এখানেই নিহিত।

দার্শনিক এবং পয়গাম্বরের মধ্যে পার্থক্য হলো এই যে, দার্শনিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান থেকে উপরের স্তরে যান। পক্ষান্তরে, নবিগণ সাধারণ মানুষের নাগালে আসার জন্য জ্ঞানের উন্নত শিখর থেকে অবরোহণ করেন।

আল্লামা ইবনে মিস্‌কাওয়াইহ্ নবিগণের ওহী প্রাপ্তি, কল্পনা জগত থেকে তাঁদের অবতরণ, তাঁদের গায়েবী আওয়াজ শ্রবণ ইত্যাদির যে হকিকত বর্ণনা করেন, ইমাম গাযালী 'আল্-মাদ্‌নুনো-বিহী-আলা-গাইরে-আহলিহী' নামক গ্রন্থে তাই নিজ ভাষায় বর্ণনা করেন।

'আল্-গাযালী' নামক গ্রন্থে আমি তাঁর পুরো ভাষ্যের উদ্ধৃতি দিয়েছি। এখানে শুধু কয়েকটি বাক্যের উদ্ধৃতি দিয়ে ক্ষান্ত করছি:

"যে কোন ভাব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ ধারণ করতে পারে'—এই বৈশিষ্ট্য শুধু নবী এবং রসূলদের জন্যই। এটা এমনি ধরনের

৯—

ব্যাপার, যেমন, সাধারণ লোকেরা কাল্পনিক বস্তুকে স্বপ্নযোগে জড় আকারে দেখতে পায় এবং কথাবার্তাও শুনতে পায়।"

"তাই পয়গম্বরগণ এসব বস্তু জাগ্রত অবস্থায়ই দেখতে পান এবং জাগ্রত অবস্থায়ই এগুলো তাঁদের সাথে কথাবার্তা বলে থাকে।'

আবদুর রায্যাক লাহিজী 'গওহারে মুরাদ' নামক গ্রন্থে বিষয়টি এভাবে বর্ণনা করেন ঃ

"আমাদের মস্তিষ্ক যেভাবে ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানকে ইন্দ্রিয়াতীত করে কাল্পনিক বস্তুতে পরিণত করে, তেমনি নবীদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতাও কাল্পনিক বিষয়কে ভৌতিক রূপ দান করে।"

এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন, কেবল দার্শনিকগণই ওহী ও ইলহামের এ হকিকতে বিশ্বাস করেন। প্রকাশ্যবাদী ওলামার (ওলামা-এ-যাহির) মতে এ অভিমত কুফ্‌র বই কিছুই নয়।

এ সময়ই 'ইখ্‌ওয়ানুস-সাফা' নামক সংঘটি গঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল শরীয়ত এবং দর্শনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

এ সংঘের সভ্যগণ দর্শন এবং শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একান্নটি পুস্তিকা রচনা করেন। এ পুস্তিকাগুলো বর্তমানে 'রাসাইলে-ইখওয়ানুস্ সাফা' নামে চার খণ্ডে পাওয়া যায়। কিন্তু আপন নাম প্রকাশ করার মত সৎসাহস এ সংঘের সভ্যগণের ছিল না। 'কাশফুয্‌যুনুন' নামক গ্রন্থে এঁদের যে নামগুলোর উল্লেখ রয়েছে, তা হলো ঃ আবু সুলায়মান মোহাম্মদ ইবনে নাসির আল-বাসতী, আবুল হাসান আলী ইবনে হারওয়ান আয্‌যান জানি, আবু আহমদ হুনার জুরী, সাইদ ইবনে রিফায়াহ্।

এটা সর্বস্বীকৃত যে, এসব পুস্তিকার লেখকমণ্ডলীর সবাই ছিলেন মুসলিম দার্শনিক। 'কাশফুয্‌যুনুন' গ্রন্থে লিখিত আছে, "তাঁরা সবাই ছিলেন 'হুকামা'। তাঁরা একমত হয়ে এসব পুস্তিকা রচনা করেন।"

শহরজুরী 'তারীখুল হুকামা' নামক গ্রন্থে কিছুটা বিস্তারিতভাবে এঁদের আলোচনা করেন। সংঘটি নিজেই এক জায়গায় আপন উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। এর সারাংশ নিম্নে দেয়া হলো ঃ

"প্রাচীন দার্শনিকগণ (হুকামা) নানামুখী জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পর্কে বহুগ্রন্থ রচনা করেন। যেমন, চিকিৎসাশাস্ত্র, অংক, জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থ-বিজ্ঞান—এসব বিষয়ে তাঁদের রচনা রয়েছে। এসব রচনাবলীকে বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রহণ করেছে। এক সম্প্রদায় এগুলোর বিরোধিতা করেছে। তারা হয়তো এ বিষয়গুলো উপলব্ধি করার চেষ্টা করেনি, নয়তো এ বিষয়গুলো ছিল তাদের জ্ঞান সীমার উর্ধ্বে। অন্য সম্প্রদায় এগুলো অধ্যয়ন করেছে। কিন্তু পুরো-পুরি আয়ত্ত করতে পারেনি। তাতে ফল এই দাঁড়ালো যে, তাঁরা শরীয়তের বিধিবিধান অস্বীকার করে বসলো এবং ধর্মীয় বিষয়গুলোকে অবজ্ঞার চোখে দেখতে আরম্ভ করলো।

"আমাদের এ সংঘের সর্ববিজ্ঞ ভাইদের উদ্দেশ্য হলো, শরীয়ত এবং দর্শন উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা। এজন্য আমরা একান্নটি পুস্তিকা লিখে ইসলামী শরীয়ত এবং দর্শনের বিষয়াদির হাল হকিকত ব্যক্ত করছি।"

হিজরী পঞ্চ শতাব্দীতে ইমাম গাযালী পয়দা হন। তিনি ছিলেন এ বিষয়ে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের শিরোমণি। তিনি ওহীবাদ ও বুদ্ধিবাদের মধ্যে পুরোপুরি সমন্বয় সাধন করেন এবং এমনভাবে সমন্বয়সাধন করেন যে, কোনটির অস্তিত্বই ক্ষুণ্ণ হয়নি। আজ যদি আধুনিক ইলমে কালামের ইমারত গড়তে হয়, তবে তাঁর ভাবধারার উপর ভিত্তি করেই তা সম্ভব। এ উদ্দেশ্যেই আমি গ্রন্থের দ্বিতীয়াংশে তাঁর ভাবধারার পূর্ণ আলোচনা করতে চাই। তবে এখানে কেবল এতটুকু বলে রাখতে চাই যে, প্রত্যেক বিষয়ে ইমাম গাযালীর রচনাবলী রয়েছে এবং প্রত্যেক স্থানেই তাঁর একটা নতুন রূপ ফুটে উঠেছে। তিনি কোথাও মুতাকাল্লিম, কোথাও ফকীহ, কোথাও ধর্মীয় উপদেশক, কোথাও দার্শনিক, আবার কোথাও জ্ঞানীর ভূমিকা পালন করেন। এজন্য এটা বলা কঠিন যে, তাঁর আসল ঝোঁক কোন দিকে ছিল এবং তাঁর আসল ভাবধারাই বা কি? তাঁর সমস্ত রচনা যদি একত্র করা যায়, একটাকে অপরটার সাথে তুলনামূলকভাবে দেখা যায়, এবং তাঁর তাৎপর্যপূর্ণ ভাষার ইঙ্গিতসমূহ উপলব্ধি করা যায়, তবেই এ রহস্য উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব। এজন্য আমি তাঁর জীবন চরিতের উপর একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করেছি। তাতে এসব বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে।

ইমাম গাযালী যদিও প্রকাশ্যবাদী ওলামার ভয়ে আপন মতামত প্রকাশে খুব সতর্কতা ও গোপনীয়তা অবলম্বন করেছেন, তথাপি সমঝদার লোকেরা বুঝে নিয়েছেন যে. তিনি দার্শনিক ভাষার মধ্য দিয়েই আপন চিন্তাধারা ব্যক্ত করে গেছেন। এজন্যই প্রখ্যাত বড় বড় ওলামা যেমন, কাযী আইয়ায, মুহাদ্দিস ইবনে জওযী, ইবনে কাইয়েম প্রমুখ তাঁকে ভ্রান্ত এবং পথভ্রষ্টরূপে ঘোষণা করেন।

কাযী আইয়াযের আদেশে স্পেনে ইমাম গাযালীর সমস্ত গ্রন্থ বিনষ্ট করে দেয়া হয়। আমি এ বিষয়টি 'আল্-গাযালী' নামক তাঁর জীবনী গ্রন্থে ফলাও করে বর্ণনা করেছি।

ইমাম গাযালীর পদক্ষেপেই দর্শন ধর্মীয় মহলে স্থান লাভ করে। দর্শন এবং যুক্তিবিদ্যা-শিক্ষা প্রসার লাভ করে। এর ফলে এমন অনেক লোক আবির্ভূত হলেন, যাঁরা ধর্মকে দর্শনের অন্তর্ভুক্ত করতে চাইলেন। এঁদের মধ্যে শায়খুল ইশরাক শায়খ শিহাবুদ্দিন মকতুল (নিহত) সকলের মধ্যমণি ছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে এত উদারতা প্রদর্শন করেন যে, বলতে গেলে তিনিই দর্শনকে ধর্মের পাঁজরে এনে বসিয়ে দিলেন। তাঁর চিন্তাধারার সাথে পাঠকেদের পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে আমি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'হিকমাতুল্-ইশ্‌রাক' এর ভূমিকা থেকে কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করছিঃ

"আমি যে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞানের কথা উল্লেখ করেছি এবং এর যে ভূমিকা বর্ণনা করেছি, আশা করি, সকল মারিফত-পন্থী সে সম্পর্কে আমার সাথে একমত হবেন। এ পন্থাটি দর্শনের শিরোমণি প্লেটোরই অভিরুচি মাফিক, যিনি ছিলেন ঐশী ক্ষমতা প্রাপ্ত এবং স্বর্গীয় নূরের অধিকারী। দার্শনিকদের পুরোধা হারমিসের যুগ থেকে যত বড় বড় দার্শনিক জন্মগ্রহণ করেন, সবারই এ পন্থা ছিল। পারস্যের দার্শনিকগণও অনুরূপ পন্থা অবলম্বন করেন যাঁদের মতবাদের ভিত্তি ছিল আলো এবং অন্ধকার। কিন্তু এ পন্থা অগ্নি-পূজকদের এবং মানীর নাস্তিক্য নয়।"

শায়খুল ইশরাক হিজরী ৫৫০ সালের কাছাকাছি সময় পয়দা হন। তিনি ইমাম রাযীর শিক্ষক মাজ্‌দ জিলীর নিকট বুদ্ধিভিত্তিক বিদ্যা শিক্ষা করেন। আল্লাহপ্রদত্ত মেধা ও প্রতিভা বলে তিনি

অল্প বয়সে এমন দক্ষতা অর্জন করেন যে, তদানীন্তন মুসলিম জাহানে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিলেন না।

হিজরী ৫৭৯ সালে তিনি যখন হালাব গমন করেন, তখন সেখানকার শাসনকর্তা ছিলেন সুলতান সালাহ্‌উদ্দীনের পুত্র মালিকুয্‌-যাহির গাযী। তিনি শায়খুল ইশরাকের খুবই সম্মান করতেন। তিনি এক বিতর্ক সভার আয়োজন করেন। তাতে সমস্ত বড় বড় ওলামা যোগদান করেন। শায়খুল ইশরাক সে সভায় আলোচ্য বিষয়ের সূক্ষ্ম দিকগুলোর উপর এমন মনোমুগ্ধকর বক্তৃতা করেন যে, সমসাময়িক সুধীবর্গ তাঁর সামনে নিজেদের পরাস্ত বলে মনে করেন। সাধারণ ওলামা তাঁর দুশমন হয়ে উঠেন। তাঁরা সুলতান সালাহ্ উদ্দীনকে লিখেন, "যদি এ ব্যক্তি জীবিত থাকে, তবে কেবল আপনার খান্দানই নয়, সমস্ত মুসলমানদের পথভ্রষ্ট করে দেবে।" তাই সুলতান সালাহ্ উদ্দীন, আল্‌-মালিকুয্‌-যাহিরকে তাঁর হত্যার আদেশ দেন। তদনুসারে হিজরী ৫৮৬ সালে তাঁকে হত্যা করা হয়। 'তাবাকাতুল আতিব্বা' নামক গ্রন্থে অনুরূপ বিবরণ রয়েছে।

অন্যান্য ইতিহাস গ্রন্থেও এ প্রমাণ রয়েছে যে, সুলতান সালাহ উদ্দীন ওলামার কথানুসারেই তাঁর হত্যার আদেশ দেন। কিন্তু আমার কাছে এটা মনে হয় না যে, কেবল ওলামার অসন্তোষ এবং তাঁদের ঈর্ষার কারণেই সুলতান তাঁর হত্যার আদেশ দেন। বস্তুতঃ তিনি নিজেও শায়খুল ইশরাককে পথভ্রষ্ট বলে মনে করতেন।

শায়খুল ইশরাকের গ্রান্থবলী আজও বিদ্যমান রয়েছে। তাতে এমন শত শত বিষয় আছে, যা ফকীহ্‌দের মতে, কুফর এবং ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। 'হিকমাতুল-ইশরাক' নামক গ্রন্থে তিনি জরোয়াস্টার প্রমুখকে পয়গাম্বররূপে অভিহিত করেন। গ্রীক দার্শনিক-দের আল্লাহর প্রিয় বান্দারূপে আখ্যায়িত করেন। কুফরী করার জন্য এর চাইতে আর বেশী কি প্রয়োজন ?

শায়খুল ইশরাক দর্শন বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে অধিকাংশই অ্যারিস্টটলের দর্শন মোতাবেক রচিত। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে একমাত্র 'হিক্‌মাতুল্‌ ইশরাক' নামক গ্রন্থটি তাঁর স্বরুচি মোতাবেক রচিত।

প্রাচীন মুতাকাল্লিমদের যুগ থেকেই গ্রীক দার্শনিকদের মতবাদের সমালোচনা শুরু হয়। ইমাম গাযালী ও রাযীর সময় এ সমালোচনা খুবই প্রসার লাভ করে। এ বিষয়ে শায়খুল ইশরাকের একটি বিশেষত্ব রয়েছে। ইমাম গাযালী প্রমুখের উদ্দেশ্য ছিল কেবল সমালোচনা করা। তাঁরা কোন নতুন দর্শন প্রবর্তন করেন নি। পক্ষান্তরে শায়খুল ইশরাক একটি স্বতন্ত্র দর্শন প্রবর্তন করেন এবং তা 'ইশরাক দর্শন' নামে অভিহিত করেন। এতে তিনি অ্যারিস্টটলের অধিকাংশ মতবাদ ভ্রান্ত প্রমাণিত করেন এবং যুক্তি প্রমাণ দিয়ে নিজস্ব অভিমত প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন। 'হিকমাতুল ইশরাক' এর শেষ দিকে তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলেন, "আমার এসব মতবাদ" আল্লাহ্‌প্রদত্ত। দর্শন ছাড়া যুক্তিবিদ্যায়ও তিনি হস্তক্ষেপ করেন এবং এর কোন কোন বিষয়কে ভুল প্রমাণিত করেন। কোন কোন বিষয়ের ভ্রম সংশোধন করেন। পাঠকদের ঔৎসুক্যের প্রেক্ষিতে এখানে সেগুলোর কোন কোনটি উদ্ধৃত করছি ঃ

যুক্তিবিদ্যায় ( মানতিক ) কোন বস্তুর সংজ্ঞা পদ্ধতি হলো যে বস্তুর সংজ্ঞা বা হকিকত বর্ণনা করা উদ্দেশ্য, তার সত্তাগত দুইটি গুণ উল্লেখ করা। তন্মধ্যে একটি হবে এমনি ধরনের, যা সংজ্ঞাধীন বস্তুর মধ্যেও পাওয়া যায়, অপরাপর বস্তুর মধ্যেও দৃষ্ট হয়। যেমন মানুষের অনুভূতিশীল হওয়া এবং তার স্বেচ্ছাধীন গতিশীলতা। এ বৈশিষ্ট্যটি মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীতেও দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বা গুণ হবে এমনি ধরনের, যা শুধু সংজ্ঞাধীন বস্তুর মধ্যেই পাওয়া যাবে, অন্য কোন বস্তুতে নয়। যেমন মানুষের বাকশীলতা, এ গুণ শুধু মানুষের মধ্যেই পাওয়া যায়, অন্য প্রাণীতে নয়। এ দু'ধরনের বৈশিষ্ট্যই হলো সে বস্তুর সংজ্ঞা বা হকিকত। বৈশিষ্ট্য বা এ গুণকে যুক্তিবিদ্যার পরিভাষায় যথাক্রমে 'জিন্‌স' (জাত) এবং 'ফস্‌ল' (প্রভেদকারী) বলা হয়।

শায়খুল ইশরাকের মতে সংজ্ঞার এ পদ্ধতি যথার্থ নয়। তিনি বলেন, সংজ্ঞাধীন বস্তুর বৈশিষ্ট্যটি যে, একমাত্র তারই বৈশিষ্ট্য এবং তা অন্য কোথাও দৃষ্ট হয় না, একথা সম্বোধিত এবং উদ্দিষ্ট ব্যক্তি কি করে জানতে পারবে? যেমন যুক্তিবিদ্যায় ঘোড়ার সংজ্ঞায় বলা হয় যে, এটা হ্রেষারবকারী প্রাণী। হ্রেষারব একটি বিশেষ

আওয়াজ। এ শুধু ঘোড়ার মধ্যেই দৃষ্ট হয়, অন্য কোন প্রাণীতে নয়। এখন মনে করুন এক ব্যক্তি ঘোড়ার হকিকত জানে না। সে পূর্বেও কোন সময় ঘোড়া দেখেনি। ঘোড়ার হ্রেষারবও সে শোনেনি। এমতাবস্থায় যদি তার কাছে বলা হয় যে, ঘোড়া একটি জন্তু, যা হ্রেষারব করে, তবে সে কি করে তা বুঝতে পারবে?

এজন্য শায়খুল ইশরাকের মতে, কোন বস্তুর সংজ্ঞা-পদ্ধতি হলো তার সত্তাগত সমস্ত বৈশিষ্ট্য বা গুণের উল্লেখ করা। সেগুলো হয়তো পৃথক পৃথকভাবে অন্যত্র দৃষ্ট হতে পারে, কিন্তু একত্রে কোথাও পরিলক্ষিত হবে না।

বাক্যের যে অংশটিকে 'বিধেয়' বলা হয়, যুক্তিবিদ্যায় তাকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। শায়খুল ইশরাক এ বিভাগের বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, 'উদ্দেশ্য' ও 'বিধেয়'—বাক্যের এ দুটি অংশের মধ্যে যে সম্পর্ক থাকে, তা আপাতদৃষ্টিতে অনিবার্যতা-মূলক, সম্ভাবনামূলক বা অসম্ভাব্যতামূলক—যা-ই প্রতীয়মান হোক না কেন, প্রকৃতপক্ষে তা হলো অনিবার্যতামূলক সম্পর্ক। যেমন, যখন আমরা বলি—'মানুষ লেখক হতে পারে', তখন তার মানে হয়—মানুষের লিখনী-শক্তির সম্ভাবনা আবশ্যকীয়। তাই বলতে হয় যে, সম্ভাবনাও মূলত অপরিহার্যতার অর্থই বহন করে!

দর্শনের বহু বিষয়ে শায়খুল ইশরাক অ্যারিস্টটলের বিরোধিতা করেন। যেমন, অ্যারিস্টটল প্রত্যেক পদার্থের মৌল উপাদান সৃষ্টির পক্ষপাতী! কিন্তু শায়খুল ইশরাক এ মতবাদ নাকচ করে দেন। অ্যারিস্টটল প্রমুখ সৃষ্টির অস্তিত্বকে আল্লাহর সত্তা-বহির্ভূত বলে মনে করেন। কিন্তু শায়খুল ইশরাক সত্তার অন্তর্গত বলে মত পোষণ করেন। অ্যারিস্টটল প্রমুখ দশ আত্মা বা ফেরেশতায় (উকূল-এ-আশরাহ্) বিশ্বাসী। কিন্তু শায়খুল ইশরাকের মতে, 'আত্মা' দশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং শত শত, হাজার হাজার এবং লক্ষ লক্ষ আত্মাও রয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেক শ্রেণীর স্রষ্টা এক একটি আত্মাস্বরূপ। প্লেটো আত্মার চিরন্তনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু শায়খুল ইশরাক তাঁর এ মতবাদ খণ্ডনে বিভিন্ন যুক্তি প্রদর্শন করেন। অ্যারিস্টটল প্রমুখ ব্যক্তি বা বস্তুর দশটি প্রয়োজনীয় এবং সর্বব্যাপক বৈশিষ্ট্যে

(মাকুলাতে আশার) বিশ্বাসী ছিলেন। শায়খুল ইশরাকের মতে, এ সব হলো ব্যক্তি বা বস্তুর বিভিন্ন দিক।

এ ধরনের আরো অনেক বিষয় রয়েছে। এ সবের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া এখানে সম্ভব নয়। তাই শুধু তাঁর আল্লাহ্-তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে চাই। কারণ, এর সাথে ইলমে কালামের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে।

শায়খুল ইশরাক আল্লাহ্-তত্ত্বে প্রধানতঃ বু-আলী সীনার অনুকরণ করেন। আবার এটাও বলা চলে যে, এ বিষয়ে উভয়ের মধ্যে গতানুগতিকভাবেই মতৈক্য সাধিত হয়েছে। কিন্তু ওহী; ঐশিক জ্ঞান (ইলহাম), ফেরেশতার সাথে সাক্ষাত—এসব বিষয়ে তাঁর নিজস্ব মতবাদ রয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

শায়খ সাহেবের মতে, অস্তিত্ব কয়েক ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে একটি হলো সাদৃশ্যমূলক অস্তিত্ব, অর্থাৎ 'সদশ জগতের প্রতিচ্ছবি'। ওহী, ঐশিক জ্ঞান ইত্যাদি সদৃশ জগতের অস্তিত্বরই অভিব্যক্তি। তিনি বলেন,

"নবী এবং ওলী প্রমুখ বিভিন্নভাবে অদৃশ্য বস্তু উপলব্ধি করেন। তাঁরা কখনো লিখিত বস্তু দেখতে পান, কখনো মধুর আওয়াজ, কখনো ভয়াবহ আওয়াজ শুনতে পান। কখনো সৃষ্টিরাজির আকৃতি, আবার কখনো অতি সুন্দর মনুষ্য-আকৃতি অবলোকন করেন। এসব প্রতিচ্ছবি তাঁদেরকে অদৃশ্য বিষয়ে ওয়াকিফহাল করে।"

যাক, এ ধরনের আরো অনেক অবস্থা বর্ণনা করার পর তিনি বলেন,

"এগুলো হলো আলমে মিসালের (সদৃশ জগত) বিভিন্ন প্রতিচ্ছবি, যা স্বনির্ভরশীল। সুগন্ধ ইত্যাদিরও একই অবস্থা।"

বিস্ময়কর ব্যাপার হলো এই যে, এই চিন্তাধারা কারুর মতে, কুফরী কাজ, আবার কারুর মতে হকিকত ও রহস্যের আলোকবর্তিকা।"

সূফী মহলে শায়খুল ইশরাকের কি মর্যাদা রয়েছে, তা সকলেরই জানা ব্যাপার। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া তাঁর সম্পর্কে যে মত পোষণ করেন, তা ব্যক্ত করার মত নয়।

# ইলমে কালামের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ

## ইলমে কালামের অধিকাংশ বিষয় গ্রীক দর্শন থেকে গৃহীত— এ ধারণা ভ্রান্ত

অধিকাংশ লোকের ধারণা, ইলমে কালামের প্রায় বিষয়ই গ্রীক দর্শন থেকে গৃহীত। এ ধারণার মূলে কাজ করেছে ইমাম গাযালীর ভাষ্য। তিনি 'মাযনূন-এ-সগীর-ও-কবীর', 'জাওয়াহিরুল কুরআন' ইত্যাদি গ্রন্থে নুবুওয়াত, ওহী, স্বপ্ন, শাস্তি, প্রতিদান এবং মুজিযার যে ব্যাখ্যা দেন, তা পুরাপুরি ইবনে সীনা ও ফারাবী থেকে গৃহীত এবং এ দুজন যা লিখেছেন, তা গ্রীক দর্শনেরই অনুকরণ। এ ধারণায় মারাত্মক গলদ রয়েছে। এটা সত্য যে, উপরিউক্ত বিষয়াদিতে ইমাম গাযালীর তথ্যসমূহ ইবনে সীনা এবং ফারাবী থেকেই গৃহীত। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, এ সবই গ্রীক দর্শন। বরং এগুলো ছিল স্বয়ং ইবনে সীনা ও ফারাবীর আবিষ্কার। গ্রীক দর্শনের সাথে এগুলোর কোন সম্পর্কই নেই। আল্লামা ইবনে-রুশ্দ 'তাহাফা' নামক গ্রন্থে বলেন ঃ

"প্রাচীন দার্শনিকগণ মুজিযার আলোচনা করেন নি। স্বপ্ন সম্পর্কে ইমাম গাযালী দার্শনিকদের উদ্ধৃতি দিয়ে যা লিখেছেন, তা সত্যিই প্রাচীন দার্শনিকদের অভিমত বলে আমার মনে হয় না। গাযালীর মতে, দার্শনিকগণ দৈহিক হাশর অস্বীকার করেন। কিন্তু এ সম্পর্কে প্রাচীন দার্শনিকদের কোন মতামত দৃষ্ট হয় না।"

আসল কথা হলো মুসলিম সাধকগণ যদিও অ্যারিস্টটল, প্লেটো প্রমুখের দর্শনকে খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন এবং তাঁদের দেয়া বিষয়াদি থেকে উপকৃত হন, কিন্তু একমাত্র পদার্থবিদ্যা এবং অংক শাস্ত্র ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে তাঁদের পুরোপুরি শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন নি। আল্লাহ্‌তত্ত্ব বিষয়ে গ্রীক দার্শনিকগণ এত পশ্চাদপদ ছিলেন যে, তাঁদের কাছে মুসলমানদের পাওয়ার মত কিছুই ছিল না। ইলমে কালামের বিশেষজ্ঞগণ গ্রীকদের আল্লাহ্‌তত্ত্বকে সব সময় হেয় চোখে দেখতেন। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া মুতাকাল্লিমদের ভক্ত ছিলেন না। এক স্থানে তাঁদের সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ

"মুতাকাল্লিমদের অধিকাংশ কথা বাজে।"

তা সত্ত্বেও তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

"অ্যারিস্টটল এবং মুতাকাল্লিমীন—উভয়ের ভাষ্য আমাদের সামনেই রয়েছে। মুতাকাল্লিমদের ভাষ্য অ্যারিস্টটল প্রমুখের চাইতে অনেকটা নিশ্চিত ভূমিকার উপর প্রতিষ্ঠিত।"

'তাহাফাতুল্ ফলাসিফা' নামক গ্রন্থে ইমাম গাযালী নুবুওয়াত, মুজিযা, পরকালীন পুনরুত্থান ইত্যাদি বিষয়াদিকে গ্রীক দর্শন বলে অভিহিত করেন। অথচ তা গ্রীক দার্শনিকদের অবদান নয়, তা হলো ইবনে সীনার আবিষ্কার। মূলত তা ইবনে সীনারও আবিষ্কার নয়, বরং তিনি প্রাচীন মুতাকাল্লিমদের গবেষণালব্ধ বিষয়কে কতকটা রদবদল করে নতুন মতবাদের আকারে পেশ করেন।

ইবনে তাইমিয়া 'আর্ রদ্দু-আলাল-মানতিক' নামক গ্রন্থে বলেন ঃ

"ইবনে সীনা আল্লাহ্তত্ত্ব, নুবুওয়াত, পুনরুত্থান এবং শরীয়ত সম্পর্কে যা বলেছেন, তা গ্রীক দার্শনিকদের ভাষ্য নয়। তাঁদের চিন্তাধারা সেই পর্যন্ত পৌঁছতেও পারেনি। এ বিষয়গুলো ইবনে সীনা মুসলমানদের নিকট থেকে প্রাপ্ত হন।"

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া বুদ্ধিভিত্তিক জ্ঞানবিজ্ঞানে সাধারণ্যে খ্যাত নন। এজন্য হয়তো তাঁর মতামত এ ব্যাপারে লোকদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হবে না। কিন্তু আল্লামা ইবনে রুশদের চিন্তাধারার ব্যাপারে এ প্রশ্ন উঠতে পারে না। কারণ, মুসলমানদের মধ্যে তাঁর চাইতে বড় দার্শনিক আর কেউ পয়দা হয় নি। 'তাহাফা' নামক গ্রন্থে অনেক বিষয় সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "ইবনে সীনা এগুলো মুতাকাল্লিমদের নিকট থেকেই গ্রহণ করেন।" যেমন স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

"ফারাবী এবং ইবনে সীনা এ বিষয়ে আমাদের মুতাকাল্লিমদের অনুসরণ করেন।"

অন্যত্র তিনি উল্লেখ করেন ঃ

"ইবনে সীনা এ পদ্ধতি মুতাকাল্লিমদের নিকট থেকে প্রাপ্ত হন।"

## ইলমে কালামের অবদান

ইলমে কালামের যে অবদানটি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে, তা হলো, বদৌলতে গ্রীকদের অনুকরণ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করা সম্ভব হয়েছে।

গ্রীক দর্শন পৃথিবীতে এত বেশী প্রচলন লাভ করেছিল যে, সেই চিন্তাধারাকে ওহীর মতই মান্য করা হতো। মুসলমানেরাও সে দর্শনকে অনুরূপ চোখেই দেখতো এবং অ্যারিস্টটল ও প্লেটোকে 'জ্ঞান দেবতা'রূপে মনে করতো। ফারাবীর নিকট এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, 'অ্যারিস্টটল সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?' তিনি প্রত্যুত্তরে বললেন, 'আমি যদি তাঁর যুগে জন্মগ্রহণ করতাম, তবে তাঁর একজন যোগ্য শিষ্য হতাম।' বুআলী সীনা 'শিফা' নামক গ্রন্থে পরোক্ষভাবে বলেন, 'এত কাল অতিবাহিত হলো, কিন্তু অ্যারিস্টটলের গবেষণা-লব্ধ জ্ঞানে বিন্দুমাত্র জ্ঞানও সংযোজন করা সম্ভব হয়নি।'

যতদিন ইলমে কালামবিদগণ দর্শনকে সমালোচকের চোখে দেখেন নি, ততদিন গ্রীকদের এই একচ্ছত্র নেতৃত্ব কায়েম ছিল। নাযযামই সর্বপ্রথম অ্যারিস্টটল রচিত 'আত্তাবায়ে' নামক গ্রন্থের প্রতিবাদ লেখেন। অতঃপর জুব্বাই, অ্যারিস্টটল প্রণীত 'কওন-ও-ফাসাদ' এর খণ্ডনে অপর একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এ সমালোচনা-মূলক দৃষ্টিভঙ্গি ক্রমে ক্রমে প্রসার লাভ করে। এ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ইমাম গাযালী 'তহাফাতুল্ ফলাসিফা' রচনা করেন। আবুল বারাকাত তাঁর 'আল্‌মুতাবার' নামক গ্রন্থে গ্রীক দর্শনের অনেক ভুল প্রতিপন্ন করেন। ইমাম রাযী তো গাদা গাদা রচনাই জনসমক্ষে উপস্থিত করেন। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া নিছক দর্শনের সমালোচনায় চার খণ্ডবিশিষ্ট একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এ রচনাগুলো যদিও ইলমে কালামের সমর্থনে রচিত হয়নি, তথাপি এগুলোর বদৌলতে লোকের মন থেকে গ্রীক দর্শনের প্রভাব বিমোচিত হয়। ফলে, চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এর সমালোচনায় এগিয়ে আসেন এবং এর শত শত ভুল-ত্রুটি জনসমক্ষে তুলে ধরেন।

অধিকাংশ ইওরোপীয় গ্রন্থকার লিখেছেন, সাধারণ মুসলমানরা অ্যারিস্টটলের অন্ধ অনুকারী। একজন গলাবাজ লেখক লিখেছেন, মুসলমানরা ছিল অ্যারিস্টটলের গাড়ীর কুলি। এইরূপ হীনমনা লোকদের উচিত, ফারাবী এবং ইবনে সীনার স্থলে আবুল বারাকাত, ইমাম গাযালী, ইমাম রাযী, আমুদী এবং ইবনে তাইমিয়ার রচনাবলী পাঠ করা। মুসলমানরা কেবল দর্শনেরই নয়, গ্রীক যুক্তি-বিদ্যারও এমন সব ভুল-ত্রুটি উদ্‌ঘাটন করেন, যেগুলো সম্পর্কে কারুর ধারণাও ছিল না।

আল্লামা মুরতাযা হোসাইনী 'এহ্ইয়াউল উলুম' এর ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেন ঃ

"যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম যুক্তিবিদ্যার দোষ-ত্রুটি উদ্ঘাটন করেন এবং তার অনেক পরস্পর বিরোধী ও বিবেক পরিপন্থী বিষয় তুলে ধরেন, তিনি হলেন আবু সাঈদ সীরাফী। অতঃপর কাজী আবুবকর, কাজী আবদুল জাব্বার, জুব্বাই, ইবনে জুব্বাই, আবদুল মায়ানী, আবুল কাসিম আনসারী এবং আরো অনেকে এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। সর্বশেষে ইবনে তাইমিয়া এ বিষয়ে দুটি বিশেষ চমৎকার ছোট-বড় গ্রন্থ রচনা করেন।

ইবনে তাইমিয়ার কিতাব আমার ঘরে আছে। আমি অন্যত্র সেগুলোর বিষয়বস্তু পাঠকের সামনে পেশ করবো।

## আযাদী ঃ

ইলমে কালামের ইতিহাসে সবচাইতে বিস্ময়কর বস্তু হলো আব্বাসী শাসকদের দেয়া আযাদী এবং কালামপন্থীদের আযাদ চিন্তাধারা। বস্তুত আযাদীই ইলমে কালামকে উন্নতির এ পর্যায়ে পৌঁছে দেয়। কতক লোক ছিল, যারা পদে পদে এ প্রশ্ন তুলতো, "প্রশ্ন করা বেদাত।" যদি তাদের কথায় কর্ণপাত করা হতো, তবে আজ ইলমে কালামের অস্তিত্বই পাওয়া যেতো না। এই আযাদীর ফলেই এক শতাব্দীর মধ্যে নানা চিন্তাধারার জোয়ার বয়ে যায় এবং তা ক্রমাগত প্রসার লাভ করে। বহু নব নব সম্প্রদায় আত্মপ্রকাশ করে। যদিও এ সম্প্রদায়গুলো ধর্মীয় বিশ্বাসের দিক থেকে পরস্পর বিরোধী ছিল, তথাপি তাদের মতামতের পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। প্রত্যেকটি দল আপন ইচ্ছানুসারে মতামত ব্যক্ত করতে সক্ষম ছিল।

বিখ্যাত মুতাযিলী ওয়াসিল ইবনে আতা খলীফা মনসুরের সময় প্রত্যেক মুসলিম দেশে আপন প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে হারিসকে ইউরোপে, হাফ্স ইবনে সালেমকে খোরাসানে, কাসিমকে ইয়ামেনে, আইয়ুবকে জাযিরায়, হাসান ইবনে যাক্ওয়ানকে কুফায় এবং ওসমান তবীলকে আর্মেনিয়ায় প্রেরণ করেন। তাঁর প্রতিনিধিগণ প্রত্যেক স্থানে স্বাধীন মতবাদ প্রচার করেন এবং বিরোধীদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হন।

আব্বাসীদের দরবারে পার্সী, মানী মতাবলম্বী, ইহুদী, খ্রীস্টান—প্রত্যেক সম্প্রদায় এবং প্রত্যেক ধর্মের বিশেষজ্ঞ উপস্থিত থাকতেন। দরবারেই বিতর্ক সভা অনুষ্ঠিত হতো। অনেক সময় স্বয়ং খলীফাও পক্ষ অবলম্বন করতেন। এ সত্ত্বেও লোকেরা পুরোপুরি আযাদী এবং নির্ভীকতার সাথে আপন মনোভাব প্রকাশ করতো। তারা এটা চিন্তাও করতো না যে, খলীফার ধর্ম কি, তাঁর ভাবধারাই বা কি ?

তৃতীয় শতাব্দীতে ইবনুর রাবেন্দী নামক একজন লোক ছিলেন (মৃত্যু ৩৪৫ হিজরী)। তাঁর মূল নাম ছিল আহমদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া। তিনি একজন বড় বিজ্ঞ লোক ছিলেন। ইবনুল খাল্লিকান তাঁকে 'বিখ্যাত আলেম'রূপে অভিহিত করেন এবং বলেন, তিনি একশ' চৌদ্দটি গ্রন্থ রচনা করেন।

জানি না, তিনি কেন যে ধর্মান্তরিত হলেন এবং কেন-ই-বা ইসলামের বিরুদ্ধে এত গ্রন্থ প্রণয়ন করলেন ? তিনি 'কিতাবুত্তাজ' নামক গ্রন্থে সমস্ত তওহীদবাদীদের বিরুদ্ধে কলম ধারণ করেন। কুরআন মজীদের বিরুদ্ধেও (নাউযুবিল্লাহ্) একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। 'ফরীদ' নামক অপর একটি গ্রন্থে সমস্ত নবীদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আনয়ন করেন। 'তফসীর-এ-কবীর' গ্রন্থে তাঁর কোন কোন অভিযোগ উদ্ধৃত করা হয়। এসব হীনমন্যতা সত্ত্বেও তাঁকে হত্যাও করা হয়নি, শাস্তিও দেয়া হয়নি, দ্বীপান্তরও করা হয়নি। কেবল ওলামাই তাঁর নাস্তিক্যধর্মী গ্রন্থসমূহ নাকচ করেন এবং তাঁর অভিযোগসমূহের বিরূপ সমালোচনা করেন, এ ছাড়া আর কিছু করা হয়নি।

আযাদী এবং স্বাধিকারের এর চাইতে বড় সাক্ষ্য আর কি হতে পারে ? ইওরোপবাসী মুসলমানদের বিরুদ্ধে হীনমন্যতা এবং পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এনে থাকে। কিন্তু তারা নিজেদের সেই পুরনো যুগ ভুলে গেছে, যখন যৎকিঞ্চিৎ স্বাধীনতা প্রয়োগের অজুহাতেও লোকদের জীবিত অবস্থায় দগ্ধ করা হতো। ইওরোপের আদিযুগে যেসব বৈজ্ঞানিক নতুন নতুন বিষয় আবিষ্কার করেন, তাঁদের বিরুদ্ধে ধর্ম বিরোধিতার অভিযোগ আনীত হয় এবং তাঁদেরকে কারাবরণও করতে হয়। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারকও তাদের ধরাপাকড় থেকে রেহাই পান নি।

## ইলমে কালামের অপূর্ণতা এবং তার কারণ

ইলমে কালাম যদিও বারশ' বছর স্থায়ী ছিল, কিন্তু তা পূর্ণতার শিখরে উন্নীত হতে পারেনি। কারণ উৎপত্তির সাথে সাথেই তাকে নিত্য কঠিন বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। সমস্ত মুহাদ্দিস এবং ইমাম আবু হানিফা ছাড়া সমস্ত মুজতাহিদ এর প্রতি বৈরিতা পোষণ করতেন। আব্বাসী শাসকদের সমর্থনের ফলে তা ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়। কিন্তু জনপ্রিয় হতে পারেনি। যে লঘিষ্ঠ দলটি তা সমর্থন করতেন এবং এর উন্নতি কামনা করতেন, তাঁরা মুতাযিলী বলে অভিযুক্ত ছিলেন। 'আহলে সুন্নাত ও জামায়াত' অনেক কাল পর এদিকে দৃষ্টিপাত করেন। কিন্তু তাঁরা দর্শন এবং বুদ্ধিবাদের সাথে পরিচিত ছিলেন না। কারণ তাঁদের কাছে তখনও দর্শন কেন যুক্তিবিদ্যা শিক্ষা করাও ছিল অবৈধ। ইমাম গাযালীর বলিষ্ঠ পদক্ষেপের ফলে যুক্তিবিদ্যা ধর্মপ্রিয় সম্প্রদায়ের গণ্ডিতে পরিচিত হয়। এই পরিচিতির ফলে দর্শনও তাঁদের আসরে স্থান লাভ করে। দর্শন এবং যুক্তিবাদের সংমিশ্রণে ইলমে কালাম নবরূপ ধারণ করতে আরম্ভ করে এবং এতে ইমাম রাযী ও আমুদীর ন্যায় লোকের আবির্ভাব ঘটতে শুরু করে। কিন্তু তাতার থেকে হঠাৎ এমন এক জোরালো ঝড় উঠলো, যার ফলে ইসলামের যাবতীয় জ্ঞানভাণ্ডার লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। প্রাচ্য তো আর মাথা তুলে দাঁড়াতেই পারলো না। সিরিয়া এবং রোম দেশ অবশ্য পায়ের উপর দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছিল, কিন্তু সেই মাটিতে প্রাচ্যের মন-মেযাজ সৃষ্টি হওয়া ছিল মুশকিল। অচিরে সমগ্র মুসলিম জাতির ইজতেহাদ-শক্তি লোপ পেলো। আশয়ারীদের ভগ্ন ইমারতের কিছুটা চিহ্ন অবশিষ্ট রইলো। পরবর্তী মুতাকাল্লিমগণ তাতে জোড়া-তালি দিতে থাকেন। সেই ইমারতের যতটুকু অংশ অবশিষ্ট রয়েছে, সেটা দিয়েই আজ সকলেই চক্ষু জুড়ায়। ইমাম গাযালী এবং ইবনে রুশ্দ এতে যে সব কারুকার্য করেছিলেন, তা জানে কয়জন?

## ইলমে কালামের অপূর্ণতার সবচাইতে বড় কারণ

ইলমে কালামের অপূর্ণ থাকার সবচাইতে বড় কারণ হলো—স্বাধীন ভাবধারা প্রকাশের অনধিকার। আব্বাসী শাসনামলে স্বাধীন চিন্তাধারার অধিকার ছিল। সেজন্য তাঁদের প্রশংসাও করেছি। কিন্তু আদতে

এই স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ ছিল সরকারী নির্দেশ পর্যন্তই। সরকারের দিক থেকে মতামত প্রকাশে কোন বাধা বিপত্তি ছিল না। কিন্তু যে বিষয় জনগণের বোধগম্য ছিল না, তা ব্যক্ত করা হলে তারা প্রাণের শত্রু হয়ে দাঁড়াতো। সরকারের হস্তক্ষেপের ফলে কেবল প্রাণ বাঁচানো যেতো। কিন্তু এ হস্তক্ষেপের মূল্যই বা কি? সর্বসাধারণ যাকে ইচ্ছা, তাকে কোণঠাসা করে রাখতে পারতো, গালি দিতে পারতো এবং শান্তিময় জীবন যাপনের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারতো। তদুপরি অপর একটি আপদ ছিল এই যে, প্রকাশ্যবাদী ফকীহ্গণও সর্বসাধারণের পক্ষ অবলম্বন করতেন এবং কুফ্রের ফতোয়া দিয়ে মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলতেন। ইমাম গাযালী, আমুদী, রাযী, ইবনে রুশ্দ, শহরিস্তানী এবং ইবনে তাইমিয়ার জীবন-চরিত পূর্বেই আপনারা পাঠ করেছেন। তাঁদের মধ্যে একজনও ফকীহ্দের ফতোয়ার হামলা থেকে রেহাই পান নি। অথচ তাঁরা স্বাধীন চিন্তাধারা খুব কমই প্রয়োগ করেছিলেন। তাঁরা যা কিছু বলতেন, শত দিক ভেবেচিন্তেই বলতেন।

ইমাম গাযালী প্রমুখের রচনাবলী পাঠ করলে পরিষ্কার বুঝতে পারবেন যে, তাঁদের অন্তর ছিল শত শত ধ্যান ধারণায় ভরা। কিন্তু সেগুলো মুখে আনার মত অধিকার তাঁদের ছিল না। 'জওয়া-হিরুল্-কুরআন' নামক গ্রন্থে তিনি বলেন, "কোন কোন গ্রন্থে আমি আমার কিছু আদত ধারণা বর্ণনা করেছি। কিন্তু সাথে সাথে আল্লাহ্র দোহাই দিয়ে একথাও বলেছি যে, বিশেষ উপযুক্ত লোক ছাড়া যেন সেগুলো অন্য কারুর হাতে না পড়ে। ইমাম সাহেব এবং অন্যান্য সুধীদের এ ধরনের উক্তি এ গ্রন্থের দ্বিতীয়াংশে বর্ণনা করবো।

এসব কারণে অনেক বিশেষজ্ঞ ইমামদের প্রকৃত ধারণা হয়তো মোটেই প্রকাশিত হয়নি, নয়তো প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু কেউ তা বুঝেছে, আবার হয়তো অনেকেই তা বুঝেনি।

মুতাযিলীদের যা বলার ছিল, তা তাঁরা স্পষ্টতই বলেছেন। কেননা সর্বসাধারণের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। তাই তাদের পরোয়াও করতে হয়নি। তাঁরা উপদেশও দিতেন না, ফতোয়াও প্রচার করতেন না, ইমামত্ও করতেন না। এর পরিণতি এই দাঁড়ালো যে, আজ তাঁদের একটি রচনাও বেঁচে নেই। বিভিন্ন

গ্রন্থে যদি তাঁদের জীবনচরিত এবং মতবাদের উল্লেখ না থাকতো, তবে আজ এটা বলাও মুশকিল হতো যে, তাঁরা পৃথিবীতে কখনো বিদ্যমান ছিলেন কি না?

## ইলমে কালামের বিষয়বস্তু

ইলমে কালাম গোড়ার দিকে সংক্ষিপ্ত ও সরল ছিল। কিন্তু ক্রমশ এতে অনেক বিষয় জুড়ে দেয়া হয়। বর্তমানে ইলমে কালাম বলতে মোটামুটি দু'টি বস্তুকে বুঝায়ঃ

১. ইসলামী আকাইদের প্রতিষ্ঠা।

২. নাস্তিকদের দর্শন ও অন্যান্য ধর্ম নাকচ করা।

## অসত্য ধর্মের অসারতা প্রমাণ

ইলমে কালামে অসত্য ধর্মের অসারতা প্রমাণ প্রথম থেকেই আরম্ভ হয়। কেননা, আব্বাসী খলীফাদের দরবারে প্রত্যেক ধর্মের সুধী থাকতেন। তাঁদের মধ্যে ধর্মীয় বিষয়ে বিতর্কসভা অনুষ্ঠিত হতো।

মুসলিম দার্শনিকদের পুরোধা ইয়াকুব কিন্দী সর্বপ্রথম এ বিষয়ে কয়েকটি পুস্তিকা লিখেন। ইবনুন্ নাদিম 'আল-ফিহ্‌রিস্ত' নামক গ্রন্থে নিম্নলিখিত পুস্তিকাগুলোর নাম উল্লেখ করেন ঃ

১. 'রিসালাতুন-ফির-রদ্দে আলাল্ মানানিয়াহ্'—পার্সীদের এক বিশেষ সম্প্রদায়—'মানানিয়ার' বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

২. 'রিসালাতুন-ফির-রদ্দে আলাস্ সান্‌ভিয়াহ্'—দুই স্রষ্টার সমর্থক সান্‌ভিয়াহ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

৩. 'রিসালাতুন-ফির-ইহ্‌তিরাসে-মিন-খাদায়িস্ 'সুফাস্তাইন' 'সোফাস্তাইয়াহ্' একটি সম্প্রদায়, যারা প্রত্যেক বস্তুতে সন্দেহ পোষণ করতো। এই পুস্তিকাটি তাদের ভ্রম প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে লিখিত।

ইয়াকুব কিন্দীর পর জাহিয্ খ্রীস্টান এবং ইহুদী ধর্মের খণ্ডনে বিভিন্ন গ্রন্থে রচনা করেন। এর পরেও এ বিষয়ে অনেক গ্রন্থ লিখিত হয়। তন্মধ্যে 'কাশফুয্‌যুনুন' এর রচয়িতা তাঁর গ্রন্থে সংক্ষিপ্তরূপে 'আন্‌নসিহাতুল্ ঈমানিয়াহ্' 'তোহফাতুল্ আরীব' 'তাজাইউল' 'ইনতিসারাত-এ-ইসলামিয়া' নামক গ্রন্থাদি ছাড়াও আবদুল জব্বার মাগরিবী, কাজী আবুবকর, ইমাম জুওয়াইনী, ইবনুত তাইয়েব তারসসী,

ইবনে এওয্ দামইয়াতী প্রমুখের রচনাবলীর উল্লেখ করেন। আল্লামা ইবনে হাযম্ 'আল-মিলাল-অন্-নিহাল' নামক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে এ দু'টি ধর্মের অসারতা প্রমাণ করেন। যাঁরা ইহুদী ও খ্রীস্ট ধর্মের খণ্ডনে গ্রন্থ রচনা করেন, তাঁদের মধ্যে দু'ব্যক্তির নাম বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা হলেন: আবদুল্লাহ্ তরজুমান এবং ইয়াহ্ইয়া ইবনে জাযালা। ইয়াহ্ইয়া ইবনে জাযালা প্রথমে ছিলেন খ্রীস্টান। তিনি ওলিদ মুতাযিলীর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। শিক্ষকের হিদায়েত এবং যুক্তি-শক্তিতে প্রভাবিত হয়ে তিনি হিজরী ৪৬৬ সালে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। তিনি ইন্‌জিল এবং তওরাতে দক্ষ ছিলেন। এ দু'টি কিতাবে রসূল করীম সম্পর্কে যে সব ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, সেগুলো নিয়ে তিনি একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন। এটাই বোধ হয় এ বিষয়ে সর্বপ্রথম রচনা।

ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি ইল্‌ইয়ার নামে পুস্তিকাকারে একটি চিঠি প্রেরণ করেন। ইল্‌ইয়া ছিলেন সে সময়কার একজন বিশপ্।

ইবনে জাযালা তাঁর রচনায় যুক্তি দিয়ে এটা পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেন যে, খ্রীস্টান এবং ইহুদিগণ জেনে শুনেই রসূল করীম সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলো গোপন করে এবং তা মিথ্যা বলে ঘোষণা করে।

আবদুল্লাহ্ তরজুমানও প্রথমে খ্রীস্টান ছিলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণ করার কারণ ছিল এই যে, তিনি তওরাত ও ইনজীলে রসূল করীম সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ দেখে ওস্তাদের নিকট এর হকিকত জিজ্ঞেস করলেন। তাঁর ওস্তাদ ছিলেন সে সময়কার একজন বড় পাদরী। তিনি বললেন, "এতে কোন সন্দেহ নাই যে, এসব ভবিষ্যদ্বাণী রসূল করীমের আগমনবার্তা বহন করছে। কিন্তু পার্থিব স্বার্থের বশবর্তী হয়ে আমরা তা প্রকাশ করতে পারছি না। তোমাকে আল্লাহ্ তওফীক দিলে মুসলমান হয়ে যাও।" ওস্তাদের উপদেশ অনুসারে তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন এবং 'তুহ্‌ফাতুল্ আরীব' নামক একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাতে তিনি এসব বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন এবং আসমানী গ্রন্থসমূহ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে রসূল করীমের আগমন সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর যথার্থতা প্রমাণ করেন।

গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে এবং তা আমি পাঠ করেছি।

ইমাম গাযালীও এ বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। সেটি আমি পড়েছি। ইনজীল এবং তওরাতে যে সব বিকৃতি সাধিত হয়েছে, উপরিউক্ত গ্রন্থাবলীর রচয়িতগণ দু'টি যুক্তি দিয়ে তা প্রমাণ করে দেখান। একটি হলো—এসব আসমানী কিতাবের বিভিন্ন সংস্করণে এমন ভীষণ গরমিল দেখা যায়, যাতে কোন প্রকারেই সমন্বয় সাধন করা সম্ভব নয়। তাই এ সিদ্ধান্ত নিতে হয় যে, এগুলোর কোনটাই নির্ভরযোগ্য নয়। দ্বিতীয় যুক্তি হলো—এ গ্রন্থসমূহের অধিকাংশ বিষয় বিবেক বিরোধী। তাই এগুলো আল্লাহ্ প্রদত্ত হতে পারে না। পূর্বসূরী ওলামা মনে করতেন, বিবেক বিরোধী বাণী কখনো আল্লাহ্ প্রদত্ত হতে পারে না। এটা লক্ষণীয় বিষয়।

## দর্শনের খণ্ডন

মুতাকাল্লিমদের দর্শন রদের পেছনে একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এই যে, যে বিষয়গুলো ইসলাম ধর্ম বিরোধী, কেবল তা নাকচ করা। কিন্তু তাঁরা এ গণ্ডি ছাড়িয়ে যান। তাঁরা গ্রীক দর্শনের ভ্রম উদঘাটনেরও প্রয়াস পান। এর কারণ হল এই যে, গ্রীক দর্শন যখন বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হলো, তখন লোকেরা সেদিকে তড়িৎ গতিতে ধাবিত হয় এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে দর্শনের ভক্ত হয়ে উঠে। দর্শনের প্রতিটি বিষয়ের উপর তাদের সুনজর পড়তে আরম্ভ করে। দর্শনের দুর্বল বিষয়গুলোও তাদের কাছে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত এবং বিশ্বাস্য বলে মনে হতে লাগলো। এ সবের মধ্যে অল্প কিছু বিষয় এমনও ছিল, যা বাহ্য দৃষ্টিতেই ইসলাম বিরোধী। মুতাকাল্লিমগণ যখন বিশেষ করে এ বিষয়গুলো বাতিল বলে ঘোষণা করলেন, তখন দর্শন ভক্তগণ মনে করলো যে, যদি এর অন্যান্য বিষয় যথার্থ হয়, তবে এর গুটি-কতক বিষয় দুর্বল এবং ইসলাম বিরোধী হবে কেন?

এ অবস্থার নিরিখে মুতাকাল্লিমগণ দর্শনের প্রতি ব্যাপকভাবে দৃষ্টিপাত করেন এবং এর শত শত ভ্রম উদ্‌ঘাটন করেন। পূর্ববর্তী মুতাকাল্লিমগণ প্রয়োজন-পরিমাণে এ কাজে হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তিগণ এবং বিশেষ করে ইমাম রাযী দর্শনের আগাগোড়া কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখেন। দর্শনের এই সমালোচনামূলক অংশকে যদি পৃথক করা যায়, তবে তা হবে সত্যিকার একটি

স্বতন্ত্র দর্শন। অবসর পেলে এ বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করার ইচ্ছা আছে। তবে এটাও বলছি যে, এ অংশটি মূলত ইলমে কালামের অন্তর্ভুক্ত নয়।

## মুতাকাল্লিমগণ গ্রীক দর্শনের অনুধাবনে যে সব ভুল করেছেন

সত্যিকার বলতে গেলে, মুতাকাল্লিমগণ গ্রীক দার্শনিকদের ভাবধারা অনুধাবনে অনেক ভুল করেছেন। তার কারণ হলো, মুসলিম দার্শনিক (যেমন ইবনে সীনা প্রমুখ) গ্রীক ভাষা জানতেন না। হোনাইন ও ইসহাক-অনূদিত দর্শনের উপরই তাঁদেরকে নির্ভর করতে হতো। ইবনে সীনা এ ভুল করেছেন সবচাইতে বেশী। আল্লামা ইবনে রুশদ্‌ 'তাহাফাতুত তাহাফা' নামক গ্রন্থের বহু স্থানে একথা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেন। ভুলের আরো একটি কারণ ছিল এই যে, অ্যারিস্টটলের ব্যাখ্যাকার হিসেবে ইবনে সীনার অত্যধিক খ্যাতি ছিল। যা কিছু তাঁর কণ্ঠ থেকে বের হতো, সেটাকেই লোকেরা অ্যারিস্টটলের হুবহু অভিমত বলে মনে করতো। এমন অনেক বিষয় রয়েছে, যার সাথে অ্যারিস্টটল এবং প্লেটোর মতবাদের কোন সম্পর্কই নেই। অথচ ইমাম রাযী, ইমাম গাযালী এবং সমস্ত মুতাকাল্লিমগণ ইবনে সীনার কথার উপর ভর করে সেগুলোকে অ্যারিস্টটল এবং প্লেটোর অভিমত বলে প্রচার করেন এবং সেগুলোর প্রতিবাদ করে মনে করলেন যে, তাঁরা গ্রীক দর্শনেরই প্রতিবাদ করেছেন। অথচ সেগুলো ছিল স্বয়ং ইবনে সীনার আবিষ্কার।

হাকীম আবু নসর ফারাবীর 'আল্-জাম্‌য়ু-বাইনার-রাআইন' নামক পুস্তিকাটি বর্তমানে ইউরোপে প্রকাশিত হয়েছে। এতে এ ধরনের অনেক ভুলের সন্ধান পাওয়া যায়। আল্লামা ইবনে রুশদ্‌ও 'তাহাফাতুত্ তাহাফা' নামক গ্রন্থে এ ধরনের ভুলের কথা উল্লেখ করেন। তাই আমি এ দুটি গ্রন্থ থেকে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করছি।

১. এ অভিমত সাধারণ্যে প্রচলিত আছে যে, অ্যারিস্টটল বিশ্বের চিরন্তনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। অথচ তিনি 'উসুলোজিয়া' নামক গ্রন্থে পরিষ্কার বলেন যে, আল্লাহ্‌ অনস্তিত্ব (শূন্যতা) থেকে মৌল উপাদান সৃষ্টি করেন। অতঃপর মৌল উপাদান থেকে বিশ্বের

যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টি হয়। এমনিভাবে প্লেটো 'তাইমাবুস' এবং 'বুলিতা' নামক গ্রন্থে পরিষ্কার ভাষায় বলেন, আল্লাহ্ অনস্তিত্ব থেকেই এসব বস্তু সৃষ্টি করেন।

২. কথিত আছে যে, প্লেটো 'আলম-এ-মিসাল' (সদৃশ জগত) এর সমর্থক ছিলেন। অর্থাৎ যে সব বস্তু আমাদের এ জগতে আছে, অনুরূপভাবে অপর একটি জগতেও সেসব বিদ্যমান রয়েছে। কেবল পার্থক্য হলো—এগুলো জড়াত্মক, আর সেগুলো অজড় এবং সেগুলোর কোন বিনাশনেই। কিন্তু সাধারণ লোকের এই ধারণা ভ্রমাত্মক। প্লেটো বলতে চেয়েছেন যে, সমগ্র জগতে যা কিছু আছে বা ভবিষ্যতে হবে, সব কিছুই আল্লাহ্র জ্ঞান-জগতে বিদ্যমান রয়েছে। যেমন কোন কারিগর যদি একটি ঘর প্রস্তুত করতে চায়, তবে সেই ঘরের নকশা তার অন্তরে পূর্ব থেকেই বিদ্যমান থাকে। এটাকেই প্লেটো 'আলম-এ -মিসাল" বা সদৃশ জগত বলে অভিহিত করেছেন।

৩. সাধারণতঃ বলা হয় যে, অ্যারিস্টটল এবং প্লেটো পরকালীন শাস্তি ও প্রতিদান অস্বীকার করেন। এ ধারণা ভুল। সিকান্দরের (আলেকজাণ্ডার) মৃত্যুর পর তাঁর মায়ের নিকট অ্যারিস্টটল যে পত্রখানি লিখেন, তার একটি বাক্য হলো এই ঃ

"এমন কাজ (বিলাপ) করবেন না, যাতে আপনি কিয়ামতের দিন সেকান্দরের সাক্ষ্য থেকে বঞ্চিত হন।"

প্লেটো 'কিতাবুস সিয়াসাহ' নামক গ্রন্থের শেষভাগে পুনরুত্থান, ইনসাফ, দাড়িপাল্লা, প্রতিদান ও শাস্তির বিষয় পরিষ্কার ভাষায় উল্লেখ করেন। (আল্-জাময়ু-বাইনার রাআইন্' থেকে গৃহীত)

৪. সাধারণত বলা হয় যে, দার্শনিকগণ মুজিযা অস্বীকার করেন। তাঁরা ওহী, স্বপ্ন ইত্যাদির যে ব্যাখ্যা দেন, তা ইসলামী আকিদার পরিপন্থী। কিন্তু আল্লামা ইবনুর রুশদ্-এর মতে মুজিযা এবং স্বপ্ন সম্পর্কে দার্শনিকগণ কোন অভিমতই ব্যক্ত করেন নি।

আদত কথা হলো, ইবনে সীনা 'শিফা' এবং 'ইশারাত' নামক গ্রন্থে নবুওয়াত, মুজিযা, কিয়ামত, ওহী ও ইলহামের যে হকিকত বর্ণনা করেন, তা ছিল যুক্তিভিত্তিক। এ গ্রন্থ দুইটির যাবতীয় বিষয়বস্তু ছিল গ্রীক দর্শন থেকে গৃহীত। তাই লোকেরা মনে করলো যে, উপরিউক্ত ধর্মীয় বিষয়গুলোও গ্রীক দর্শন থেকেই গৃহীত।

৫. প্রচলিত ধারণা হলো, অ্যারিস্টটল প্রমুখের মতে "একটি বস্তু হতে কেবল একটি বস্তুই উৎপন্ন হতে পারে। এ নীতি অনুসারে বিশ্ব সৃষ্টির যে ক্রমবিকাশ ঘটলো, তার বিন্যাস হলো এই যে, আল্লাহ্ কেবল 'চালক বুদ্ধি' (আকল্-এ-ফা'য়াল) সৃষ্টি করেন। অতঃপর চালক বুদ্ধি 'দ্বিতীয় বুদ্ধি' এবং 'প্রথম আকাশ' সৃষ্টি করে। এভাবে ক্রমানুসারে সমগ্র দুনিয়া এবং নভোমণ্ডলের সৃষ্টি হয়।" এই যে ধারণা—এটা অ্যারিস্টটলের প্রতি মিথ্যা অভিযোগ ছাড়া আর কিছুই নয়। এই সৃষ্টি নীতি এবং তার আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো ইবনে সীনারই আবিষ্কার। আল্লামা ইবনে রুশ্‌দ 'তাহাফাতুত্ তাহাফা' নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি অ্যারিস্টটলের প্রকৃত অভিমত ব্যক্ত করে শেষ পর্বে বলেন ঃ

> দেখুন! লোকেরা দার্শনিকদের সম্পর্কে কেমন ভুল ধারণা পোষণ করছে? তাদের এ ধারণা কতটুকু যুক্তিযুক্ত, তা আপনাদের খতিয়ে দেখা কর্তব্য। আপনাদের আরো উচিত, ইবনে সীনা প্রমুখের গ্রন্থ পাঠ না করে পূর্ববর্তীদের গ্রন্থসমূহ পাঠ করা। কেননা, ইবনে সীনা প্রমুখ আল্লাহ্তত্ত্ব সম্পর্কে দার্শনিকদের মতামত বর্ণনায় গড়বড় করে ফেলেছেন।

ইবনে রুশ্‌দ 'দশ আত্মা বা ফেরেশতা' (উকুল-এ-আশারা) এর 'কার্যকারণ' সম্পর্কে বলেন ঃ

ইবনে সীনা বর্ণনা করেন যে, 'দশ আত্মা বা ফেরেশতা' এর একটি অপরটি থেকে উৎপন্ন। অথচ দার্শনিকগণ এ সম্পর্কে মোটেই ওয়াকিবহাল নন।

৬. দর্শন গ্রন্থসমূহে লিখিত আছে, দার্শনিকদের মতে, আল্লাহ্র সত্তাই সৃষ্টির কারণ। অর্থাৎ বিশ্বসৃষ্টি আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন ব্যাপার ছিল না, তা ছিল এমনি ধরনের, যেমন সূর্য থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আলো বিকীর্ণ হয়। এই অভিমতের জন্য ইমাম গাযালী এবং ইমাম রাযী গ্রীক দার্শনিকদের বিরুদ্ধে কড়া অভিযোগ আনয়ন করেন। অথচ, মূলত এগুলো দার্শনিকদের অভিমতই ছিল না। ইবনে রুশ্‌দ 'তাহাফা' গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

৭. ইবনে সীনা সমগ্র অস্তিত্বকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন ঃ (১) অনিবার্য সত্তা (আল্লাহ্) (২) পরোক্ষভাবে অনিবার্য, প্রত্যক্ষ

ভাবে সম্ভাব্য। (৩) সম্ভাব্য। শেষ যুগীয় মুতাকাল্লিমদের মতে. এগুলো ছিল অ্যারিস্টটলের অভিমত। অথচ আসল ব্যাপার হলো এই যে, পরোক্ষ অস্তিত্ব বলে কিছু আছে—এমন বিশ্বাসই তাঁদের ছিল না। তাঁদের মতে, যে অস্তিত্ব সম্ভাব্য, তা কোন প্রকারেই অনিবার্য হতে পারে না।

গ্রীক দার্শনিকগণ কেবল দুই প্রকার অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন ঃ অনিবার্য এবং সম্ভাব্য। এঁদের মধ্যে যাঁরা বিশ্বকে চিরন্তন এবং অনিবার্য বলে মনে করতেন, তাঁরা একে সত্তাগতভাবেই অনিবার্য মনে করতেন এবং তাকে আল্লাহ্র কার্য বলে পরিগণিত করতেন না। আর যাঁরা সত্তাগত অনিবার্য বলে বিশ্বাস করতেন না, তাঁরা বিশ্বকে নশ্বর বলে মনে করতেন। ইবনে রুশ্দ 'তাহাফা' নামক গ্রন্থে এবং আল্লামা ইবনে তাইমিয়া 'আর রদ্দু-আলাল-মানতিক' নামক গ্রন্থে এ বিষয়টি বারবার উল্লেখ করেন।

মোটকথা, এ ধরনের আরো অনেক বিষয় রয়েছে, যেগুলোকে মুতাকাল্লিমগণ অ্যারিটস্টল এবং প্লেটোর অভিমত বলে মনে করেন। অথচ সেগুলো ছিল আবু আলী সীনা প্রমুখেরই আবিষ্কৃত।

যে মতবাদগুলো বস্তুতই গ্রীক দার্শনিকদের নিকট থেকে গৃহীত; মুতাকাল্লিমগণ ভুলবশত সেগুলোকে ইসলাম বিরোধী বলে মনে করেন। অথচ সেগুলোর সাথে ইসলামের কোন সম্পর্কই নেই। সেগুলো 'হাঁ'বোধক হোক, আর 'না'বোধক হোক, তাতে ইসলামের কিছু আসে যায় না। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে কয়েকটি বিষয় পেশ করা হল ঃ

| দার্শনিকদের অভিমত | আশায়েরাবাদী মুতাকাল্লিমদের অভিমত |
| --- | --- |
| ১. অস্তিত্ব বলতে সমস্ত সৃষ্টির অস্তিত্বকে সমভাবে বুঝায়। | ১. তা বুঝায় না, বরং প্রত্যেকটি সৃষ্টির অস্তিত্ব পৃথক। |
| ২. আল্লাহ্র অস্তিত্ব তাঁর পরম সত্তাভুক্ত। সম্ভাব্য বস্তুর অস্তিত্ব তাঁর সত্তা বহির্ভূত। | ২. অনিবার্য এবং সম্ভাব্য—উভয় শ্রেণীর অস্তিত্ব বস্তুর সত্তাভুক্ত। |
| ৩. বস্তুর অস্তিত্ব কাল্পনিকও হতে পারে। | ৩. হতে পারে না। |

| | |
|---|---|
| ৪. অনিবার্যতা, অবাস্তবতা এবং সম্ভাব্যতা—এসব বস্তুর মৌলিক গুণ। | ৪. আপেক্ষিক গুণ। |
| ৫. সম্ভাব্য বস্তুর অস্তিত্বের মূলে রয়েছে মুখাপেক্ষিতা ও সম্ভাব্যতা। | ৫. সম্ভাব্যতা নয়, বরং বস্তুর অস্থায়িত্ব হলো তার সত্তা বহির্ভূত। |
| ৬. পরমূর্ত পদার্থ পরমূর্ত পদার্থের সাহায্যে অস্তিত্ব লাভ করতে পারে। | ৬. পারে না। |
| ৭. পরমূর্ত পদার্থ স্থায়ী হতে পারে। | ৭. অনবরত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। |
| ৮. সংখ্যা ও পরিমাণ কালের অঙ্গ। | ৮. এগুলোর কোনটারই অস্তিত্ব নেই। |
| ৯. শূন্যজগত অবাস্তব। | ৯. সম্ভব। |
| ১০. অবিভাজ্য পরমাণুর অস্তিত্ব নেই। | ১০. অস্তিত্ব আছে। প্রত্যেকটি জড় পদার্থ অবিভাজ্য পরমাণুর যৌগিক। |
| ১১. প্রত্যেকটি জড়বস্তু মৌল উপাদান এবং আকারের যৌগিক। | ১১. মৌল উপাদান বলতে কিছুই নেই। |

এ ধরনের আরো অনেক বিষয় আছে, যেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ এবং যুক্তিযুক্ত প্রমাণ 'শরহে মাওয়াফিক' নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে।

মুতাকাল্লিমগণ এসব বিষয়কে ইসলাম ধর্মের সাথে কিভাবে জড়ালেন, তা একটি উদাহরণের মাধ্যমে বর্ণনা করছি ঃ

দার্শনিকদের মতে, পদার্থ যৌগিক বস্তু, যা মৌল উপাদান এবং আকারযোগে গঠিত। মুতাকাল্লিমগণ বলেন, পদার্থ অবিভাজ্য পরমাণুর সমষ্টি মাত্র। এতে আপাতদৃষ্টিতে সংমিশ্রণ আছে বলে মনে হলেও মূলত কোন সংমিশ্রণ নেই। এখান থেকে মুতাকাল্লিমগণ এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, সমস্ত পদার্থের হকিকত এক। কেননা পদার্থ হলো অবিভাজ্য পরমাণুসমূহের নামান্তর মাত্র এবং

সেগুলো একই হকিকত বিশিষ্ট। এ বিষয়টিকে মুতাকাল্লিমগণ 'পদার্থ-সাদৃশ্য' বলে অভিহিত করেন। পদার্থ-সাদৃশ্য সম্পর্কে আল্লামা তাফতাযানী 'শরহে মওয়াকিফ' গ্রন্থে বলেন ঃ

"এটা একটি বুনিয়াদ। এর উপর ইসলামের অনেক নীতি, যেমন আল্লাহ্‌র সর্বশক্তি বিশিষ্ট সত্তার প্রমাণ, নবুওয়াত ও কিয়ামতের হাল-হকিকত—অনেক কিছু নির্ভর করে।"

মুতাকাল্লিমগণ এক বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে উপরিউক্ত বিষয়টিকে ধর্মের মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত করেন। এটা পূর্বেও প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রত্যেকটি পদার্থ একই হকিকতবিশিষ্ট। সুতরাং তদনুসারে প্রত্যেক পদার্থের একই গুণবিশিষ্ট হওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, বিভিন্ন বস্তু বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এতে এটাই প্রতিপন্ন হয় যে, এই বৈশিষ্ট্যগুলো স্বয়ং পদার্থ-উদ্ভূত নয়। বরং তা হলো এক সর্বশক্তিমান সত্তার সৃষ্টি এবং তাকেই আমরা আল্লাহ্ বলে অভিহিত করে থাকি।

অলৌকিক ঘটনাবলীর সত্যতা প্রমাণও এ বিষয়টির উপর নির্ভরশীল। কেননা এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, সকল জড়পদার্থ একই প্রকৃতিবিশিষ্ট। তাই একটি পদার্থে যে বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে, তা স্বভাবত অন্য পদার্থেও বিদ্যমান থাকার কথা। যেমন আগুন যে নীতিতে দগ্ধ করে, সে নীতি অনুসারে পানিরও দগ্ধ করার কথা। এটাকেই বলা হয় মুজিযা।

বস্তুত সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রমাণ উপরিউক্ত বিষয়টির উপর নির্ভরশীল নয়। মুতাকাল্লিমদের একটি বড় দলও পদার্থ-সাদৃশ্যের সমর্থক নন। এ সত্ত্বেও তাঁরা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব এবং নবীদের অলৌকিকত্বের সমর্থক।

খুব টানা হেঁচড়া করলে ধর্মের সাথে উপরিউক্ত বিষয়টির যোগ-সূত্র স্থাপন করা যায়। এ বিষয়টির কথা বাদই দিলাম। যেসব বিষয়ের সাথে আপাতদৃষ্টিতে ধর্মের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, বস্তুত সেগুলোর সাথেও ধর্মের তেমন বিশেষ সম্পর্ক নেই। যেমন বিশ্বের চিরন্তনতা। মুতাকাল্লিমদের মতে, এটা সম্পূর্ণ ধর্মবিরোধী। অথচ কুরআন-হাদীসে এর চিরন্তনতা বা অচিরন্তনতার প্রতি কোন ইঙ্গিত নেই। মুতাকাল্লিমদের যুক্তি হলো—বিশ্ব যদি অবিনশ্বর হয়,

তবে আল্লাহ্ তার স্রষ্টা হতে পারেন না। কিন্তু দার্শনিকদের মতে চিরন্তনতা এবং নশ্বরতার মধ্যে কোন বিরোধ নেই। তাঁদের নিকট বিশ্ব অবিনশ্বরও বটে এবং তা আল্লাহ্ সৃষ্টও বটে। মানুষের হাত যখন নড়ে, তখন কলমও নড়ে। উভয়ের গতির সময় একই। অথচ হাতের স্পন্দনের ফলেই কলমের স্পন্দন সৃষ্টি হয়।

অন্য একটি উদাহরণ হলো, মুতাকাল্লিমদের ধারণায় দার্শনিকগণ আল্লাহর খণ্ডজ্ঞানে বিশ্বাসী নন। আর এটা অস্বীকার করার মানে হলো পরিষ্কারভাবে কুরআন অস্বীকার করা। কিন্তু ব্যাপারটি মূলত তা নয়। আদত কথা হলো, দার্শনিকগণ মূল বিষয়টি অস্বীকার করেন না। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ্ সমস্ত খণ্ড জ্ঞানেরও অধিকারী। তবে তাঁরা এটা সমর্থন করেন না যে, খণ্ড বস্তু যখন বাস্তব রূপ লাভ করে, কেবল তখনই আল্লাহ্ সে সম্পর্কে জ্ঞাত হন, এবং পূর্বে নয়। কেননা, এতে আল্লাহ্‌র জ্ঞান অচিরন্তন হয়ে দাঁড়ায়।

## নাস্তিকদের অভিযোগ খণ্ডন

আপনারা পূর্বের বর্ণনা থেকে অনুমান করেছেন যে, দার্শনিক, ইহুদী ও খ্রীস্টানদের প্রতিরোধ করতে গিয়ে ইলমে কালামকে কোন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়নি। কেবল নাস্তিকদের মোকাবিলা করতে গিয়েই মুতাকাল্লিমদের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। 'মুল্‌হিদ' বা নাস্তিকরা কোন ধর্মেই বিশ্বাসী ছিল না। তারা প্রত্যেক ধর্মেরই সমালোচনা করতো। ইসলামের প্রত্যেকটি নীতির প্রতি তাদের আক্রোশ ছিল। তবে কুরআন মজীদের প্রতি ক্ষোভ ছিল সবচাইতে বেশী। তারা কুরআন মজীদ সম্পর্কে যে সব প্রশ্ন তোলে, ইমাম রাযী তাঁর 'তফসীর-এ-কবীর' নামক গ্রন্থের স্থানে স্থানে সম্প্রদায়ের নামধামসহ সেগুলোর উদ্ধৃতি দেন। যেমন কুরআন মজীদে হযরত সুলাইমান, হুদ্‌হুদ্, বিলকিস এবং পিপড়া সম্পর্কে যে সব ঘটনার উল্লেখ রয়েছে এবং সে সম্পর্কে নাস্তিকদের যে সব সন্দেহ ছিল, ইমাম রাযী তাঁর তফসীরে সে সব বিষয় তুলে ধরেন।

## নাস্তিকদের সন্দেহ

১. হুদ্‌হুদ্ এবং পিঁপড়া কি করে জ্ঞানাত্মক কথাবার্তা বলতে পারে?

২. হযরত সুলাইমান ছিলেন সিরিয়ায়। সেখান থেকে হুদহুদ কি করে এক নিমিষে ইয়ামেনে গেলো, আবার ফিরেও এলো ?

৩. হযরত সুলাইমান সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি সমস্ত পৃথিবীর, বরং জিনদেরও বাদশাহ্ ছিলেন। এ সত্ত্বেও তিনি বিলকিসের ন্যায় শাসনকর্তার নাম-নিশান পর্যন্ত জানতে সক্ষম হলেন না কেন ?

৪. হুদহুদ কি করে জানতে পারলো যে, সূর্যকে সেজদা করা অবৈধ এবং কুফরী কাজ ?

আল্লামা ইবনে হায্মের সময় আবদুল্লাহ্ ইবনে শানিফ্ নামক একজন বিখ্যাত নাস্তিক ছিল। ইবনে হায্মের সাথে তার বিতর্ক হয়। তিনি 'মিলাল ও নিহাল' নামক গ্রন্থে এ বিতর্কের উল্লেখ করেন।

সাক্কাকী 'মিফ্তাহ' নামক গ্রন্থের শেষভাগে একটি অধ্যায় সংযোজিত করেন এবং তাতে নাস্তিকদের সে সব অভিযোগের উত্তর দেন, যা রচনাশৈলীর দিক থেকে কুরআনের বিরুদ্ধে আনীত হয়। অন্যান্য রচনাবলীতেও নাস্তিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের পর্যাপ্ত জওয়াব দেখতে পাওয়া যায়। একটি বিস্ময়কর ব্যাপার হলো এই যে, আজ দর্শন এতখানি এগিয়ে গেছে, মানুষ সমালোচক ধর্মী হয়ে উঠেছে, চারদিক থেকে সন্দেহের পর সন্দেহের অবতারণা করা হচ্ছে, তা সত্ত্বেও ধর্মীয় বিষয়াদিতে আজকাল যেসব প্রশ্নের অবতারণ করা হচ্ছে, তার শক্তি, সূক্ষ্মতা এবং সংখ্যার দিক থেকে আগেকার নাস্তিকদের উত্থাপিত প্রশ্নসমূহের তুলনায় কোন অংশে অতিকতর জটিল নয়।

ইমাম রাযী 'মাতালিবে আলিয়া' নামক গ্রন্থে নবুয়তের আলোচনায় আনুমানিক ষাট পৃষ্ঠা ব্যয় করেন। তন্মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ পৃষ্ঠা কেবল নাস্তিকদের উত্থাপিত অভিযোগের বর্ণনায় লিখিত। এমনিভাবে কুরআন মজীদের মুজিযা অস্বীকারকারীদের অভিযোগসমূহকেও তিনি 'নিহাইয়াতুল উকুল' নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত করেন। এসব সন্দেহের নিরসন করাই হলো ইলমে কালামের আসল উদ্দেশ্য। নাস্তিকগণ কুরআন মজীদের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আনে, তা ছিল তিন ধরনের ঃ

১. কুরআন মজীদে এমন ঘটনাবলীর উল্লেখ রয়েছে, যা প্রকৃতির নিয়ম বিরোধী। যেমন, অলৌকিক ঘটনা, জীবজন্তুর কথাবার্তা, পাহাড়ের তসবীহ্ পাঠ।

২. কুরআন মজীদে এমন অনেক বিষয় আছে, যা সংস্কারজনিত। যেমন, যাদুর প্রতিক্রিয়া, শয়তানের মানুষকে পেয়ে বসা।

৩. কুরআনে এমন অনেক বিষয় আছে, যা গবেষণালব্ধ জ্ঞান বিরোধী। যেমন, সূর্যের কূপে ডুবে যাওয়া, ছয় দিনে পৃথিবীর সৃষ্টি হওয়া, আকাশ থেকে পানি বর্ষিত হওয়া, পিঠ ও বুকের মধ্যবর্তী স্থলে বীর্যের সৃষ্টি হওয়া ইত্যাদি।

এসব অভিযোগের উত্তরে মুতাকাল্লিমদের প্রত্যেকটি সম্প্রদায় বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেন। আশয়ারিগণ কুরআন মজীদের এসব বিষয় সমর্থন করেন এবং নাস্তিকদের আরোপিত প্রশ্নাবলীর উত্তর দেন। পূর্বসূরী মুতাকাল্লিমগণ এসব ব্যাপার অস্বীকার করেন। তাঁদের মতে, অবিশ্বাসকারিগণ কুরআন মজীদের অর্থ বুঝতেই ভুল করেছেন। উদাহরণস্বরূপ আমি কুরআন মজীদ সম্পর্কে অবিশ্বাস-কারীদের কয়েকটি অভিযোগ এবং সেগুলোর উত্তর পেশ করছি।

## প্রথম উদাহরণ

কুরআন মজীদে হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে ঃ

"ওয়ামা— কাতালূহূ—ওয়ামা — সালাবূহূ— অলাকিন্— শুব্বিহা লাহুম"। সাধারণ তফসীরবিদগণ এ আয়াতের ব্যাখায় বলেন, হযরত ঈসা (আঃ) নিহতও হন নি, শূলবিদ্ধও হন নি, বরং কোন একজন লোক তাঁর আকার ধারণ করে। লোকেরা তাকেই হযরত ঈসা মনে ক'রে শূলবিদ্ধ করে। এ ধারণার অনেক বিরূপ সমালোচনা করা হয়।

১. যদি এভাবে আকৃতি বদলে যায়, তবে কোন ব্যক্তি সম্পর্কেই এটা নিশ্চিত বলা যাবে না যে, এ কি সেই ব্যক্তি, না অন্য কেউ?

২. হযরত ঈসা (আঃ)-কে বাঁচানো যদি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য হতো, তবে অন্যভাবে বাঁচাতে পারতেন, তাঁর জন্য একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে শূলবিদ্ধ করার কি প্রয়োজন ছিল?

৩. হযরত ঈসা (আঃ) এর সাহায্যের জন্য আল্লাহ্ তায়ালা হযরত জিব্রাইলকে নিয়োগ করেন। তাঁর কতটুকু শক্তি-সামর্থ্যের প্রয়োজন

ছিল, তা আল্লাহ্‌র অজানা থাকার কথা নয়। এ সত্ত্বেও তিনি হযরত ঈসা (আঃ)-কে ইহুদীদের কবল থেকে বাঁচাতে পারলেন না। তাঁকে রক্ষা করার জন্য একজন নিরপরাধ ব্যক্তির আকৃতিকে হযরত ঈসার আকৃতিতে পরিবর্তিত করার প্রয়োজন হলো।

ইমাম রাযী 'তফসীর-এ-কবীর' নামক গ্রন্থে এসব বিরূপ সমালোচনা উদ্ধৃত করেন এবং সেগুলোর উত্তরও দেন। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন : সকলেই এটা সমর্থন করবে যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে করিম, রহিম সকলকে একই আকৃতি বিশিষ্ট করতে পারেন। তা সত্ত্বেও তাদের সম্পর্কে কারুর এ ধারণা হয় না যে, তাদের পূর্বের আকৃতি হয়তো বদলে গেছে। এমনিভাবে বর্তমান আকৃতি সম্পর্কেও কারুর মনে এ সন্দেহের উদ্রেক হয় না যে, হয়তো এ আকৃতি কোন সময় বদলে যাবে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রশ্নের জওয়াবে ইমাম রাযী বলেন, অন্য কোন উপায়ে যদি আল্লাহ্ হযরত ঈসা (আঃ)-কে বাঁচাতেন, তবে মুজিযাটি প্রকাশ্য এবং রহস্যহীন ঘটনায় পরিণতি হতো এবং তাঁর উপর ঈমান আনয়ন করা অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়তো। কিন্তু মুজিযার উদ্দেশ্য এই ছিল না যে, লোকেরা বাধ্য হয়ে তাঁর উপর ঈমান গ্রহণ করুক। ইমাম রাযী আশায়েরাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এসব উত্তর প্রদান করেন।

কিন্তু অন্যান্য ধর্মের গবেষকগণ এ আয়াত নিয়ে গবেষণা করেন এবং এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, আয়াতটির ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং এ ভুল ব্যাখ্যার ফলেই বিভিন্ন প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে। মুহাদ্দিস ইবনে হায্‌য্‌ 'কিতাবুল-মিলাল-অন্‌নিহাল' নামক গ্রন্থে জোরালো ভাষায় উপরিউক্ত ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করেন এবং বলেন :

> যদি কোন সুস্থ বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তির মনে এরূপ সন্দেহের উদ্রেক হয়ে থাকে এবং সে ব্যক্তি নবুওয়াতপ্রাপ্ত লোকটির আকৃতি নিরূপণ করতে গিয়ে বিভ্রাটে পরিণত হয়ে থাকে, তবে গোটা নবুওয়াতের ব্যাপারটাই মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়ে পড়ে।

মুহাদ্দিস সাহেব উপরিউক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, হযরত ঈসা (আঃ) নিহতও হন নি, শূলবিদ্ধও হননি ; কিন্তু বিরুদ্ধবাদীরা যখন তাঁকে শূলবিদ্ধ করা হয়েছে বলে প্রচার করলো, তখন লোকের

কাছে আসল ব্যাপারটি চাপা পড়ে গেল। তাদের সন্দেহ হলো যে, আসল ব্যাপারটি কি?

## দ্বিতীয় উদাহরণ

কুরআন মজীদে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত মূসা (আঃ) যখন সামিরীকে বাছুর প্রস্তুত করার অভিযোগে অভিযুক্ত করলেন, তখন সে বললো, "ফা-কাবায্তু-কাব্যাতাম-মিন্-আসরির্ রাসূলে।" সাধারণ তফসীরবিদগণ এর ব্যাখ্যায় বলেন, সামিরী হযরত জিব্রাইল (আঃ)-কে ঘোড়ার উপর সওয়ার দেখতে পায়। তখন সে তাঁর ঘোড়ার খুরের নিম্নস্থ ধূলি তুলে বাছুরটির পেটে ঢুকিয়ে দেয়। ফলে মাটির তৈরী বাছুরটির দেহে প্রাণের সঞ্চার হয় এবং সে হাম্বা রব করতে আরম্ভ করে। উপরিউক্ত আয়াতে এই ঘটনাটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সাধারণ তফসীরবিদদের মতে এটাই আয়াতের ঠিক ব্যাখ্যা। তাঁরা বলেন, মাটির এরূপ গুণ বিচিত্র নয়।

কিন্তু আবু মুসলিম ইস্ফাহানী আয়াতটির এ ব্যাখ্যা সমর্থন করেন না। তিনি বলেন, আরবের বাগধারা মতে, "আররাজুলু ইয়াক্ফু আসরা ফুলানিন্ ও ইয়াকবিযু আসরাহু'—এ কথাগুলো অনুসরণ এবং আনুগত্যের অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাঁর মতে, এখানে 'রসূল' বলতে হযরত মূসা (আঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। তদনুসারে আয়াতের অর্থ হবে—সামিরী বলেছিল, "আমি হযরত মূসা (আঃ) -এর অনুসরণ করেছিলাম এবং তাঁর ধর্মকে সত্য বলে মনে করেছিলাম। কিন্তু এখন বুঝতে পারলাম যে, সে ধর্ম অসত্য। তাই আমি তা ত্যাগ করলাম।" এখানে একটি প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, সামিরী নিজেই হযরত মূসা (আঃ)-এর সাথে কথা বলছিল। সুতরাং তার বলা উচিত ছিল—'আমি পয়গাম্বরের অনুসরণ করেছিলাম'-এটা না বলে 'আমি আপনার অনুসরণ করেছিলাম'—একথা বলা। তবে এটাও মনে রাখতে হবে যে, আমীর-কবীদের সাথে সাধারণ লোকের এমনিভাবেই কথাবার্তা বলতে হয়। আব্বাসীদের দরবারে লোকেরা খলীফাদের 'আপনি' শব্দে সম্বোধন না করে 'আমিরুল মুমেনীন' শব্দেই সম্বোধন করতো। আবু মুসলিম ইসফাহানীর এ ব্যাখ্যাটি সাধারণ তফসীরবিদদের কাছে গ্রহণীয় নয়। তা সত্ত্বেও ইমাম রাযী তার 'তফসীর-এ-কবীরে' এ ব্যাখ্যাটিকেই উৎকৃষ্ট বলে বিবেচনা

করেন এবং এই উৎকৃষ্টতার বিভিন্ন কারণও বর্ণনা করেন। কারণ-গুলোর আলোচনা আমি এখানে বাদ দিলাম।

## তৃতীয় উদাহরণ

কুরআন মজীদে আছে ঃ

"আল্লাহ্ বলেছিলেন, চারটি পাখী আন, অতঃপর সেগুলো খণ্ড-বিখণ্ড কর; অতঃপর প্রত্যেকটি পাহাড়ে তাদের এক একটি অংশ রেখে আস, অতঃপর তাদের আহ্বান কর; দেখতে পাবে সেগুলো উড়ে চলে আসছে।"

এটা হলো সে সময়কার ঘটনা, যখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহকে বললেন ঃ হে আল্লাহ্! তুমি কি করে মৃতকে জীবিত করবে? আল্লাহ্ বললেন ঃ তুমি কি তা বিশ্বাস করছ না? হযরত ইব্রাহীম বললেন ঃ করবো না কেন? তবে তোমার প্রতি আমার আস্থাকে দৃঢ় করতে চাই। তখন আল্লাহ্ বললেন ঃ চারটি পাখী আন ইত্যাদি ইত্যাদি। অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারী এই অর্থ করেন এবং বলেন ঃ বস্তুতই হযরত ইব্রাহীমই পাখীগুলোকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছিলেন। অতঃপর সেগুলো জীবিত হয়েছিল। কিন্তু আবু মুসলিম ইসফাহানী এ ব্যাখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তিনি বলেন ঃ সুরহুন্না ইলাইকা" এর মানে খণ্ড-বিখণ্ড করা নয়। আরবী ভাষায় 'সারা-ইয়াসুরু'—ক্রিয়াটি এ অর্থে ব্যবহৃত হলে 'ইলা' শব্দটি বিভক্তিরূপে তার সাথে ব্যবহৃত হয় না। দ্বিতীয়ত "উদ্‌য়ুহুন্না" এ বাক্যে যে (হুন্না) রয়েছে, তা প্রাণীবাচক বস্তুর পরিবর্তেই ব্যবহৃত হয়। তাই এর মানে হবে—"পাখীদের আহ্বান।" অথচ সাধারণ তফসীরবিদদের মতে তার অর্থ হচ্ছে—তাদের খণ্ড-বিখণ্ডিত অঙ্গগুলোকে ডাক।

এ দুটি প্রশ্নের চাইতে আরো একটি অধিকতর জোরালো প্রশ্ন হলো—যদি হযরত ইব্রাহীমের আস্থা অর্জন করাই উদ্দেশ্য হতো, তবে চারটি পাখীর কি প্রয়োজন ছিল? একটি পাখীকে খণ্ড-বিখণ্ড করা এবং সেটিকে জীবিত করাই যথেষ্ট ছিল। মনের সন্দেহ দূর করার সম্পর্ক হলো জীবিত করার সাথে। এক, দুই বা চারটি পাখীর সাথে তার কি সম্পর্ক থাকতে পারে? আবু মুসলিম ইস্‌ফাহানী সমস্ত তফসীরবিদদের মতের বিরোধিতা করেন।

তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আল্লাহ্ রূপক বাক্যের আকারে হযরত ইব্রাহীমকে বললেন ঃ ধরুন আপনি চারটি পাখী এনে পোষ মানালেন। সেগুলো যেন আপনার নিকট থেকে পৃথক হইতেই চায় না! অতঃপর আপনি তাদের বিভিন্ন পাহাড়ে রেখে এসে ডাকতে আরম্ভ করলেন। তখন দেখলেন যে, তারা আপনার দিকে দৌড়ে চলে আসছে। এমনিভাবে আমি (আল্লাহ্) যখন সকল আত্মাকে আহ্বান করবো, তখন এরা দৌড়ে এসে আপন দেহে প্রবেশ করবে।

## চতুর্থ উদাহরণ

কুরআন মজীদে আছে ঃ

আমি পাহাড়গুলোকে দাউদের এত অনুগত করে দিয়েছিলাম যে, সেগুলো তাঁর সাথে সাথে তসবীহ্ পাঠ করতো। পাখীদেরও আমি তাঁর অনুগত করে দিয়েছিলাম।

এ ব্যাপারে নাস্তিকগণ প্রশ্ন তুললো যে, পাহাড় জড়-পদার্থ। তা কি তসবীহ পাঠ করতে পারে? আশায়েরা বলেন ঃ জড়ত্বের সাথে বাক-শক্তির কোন বিরোধ নেই। তাই পাহাড় ইত্যাদির পক্ষে কথা বলাও অসম্ভব নয়। ঈমাম রাযীও এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আশয়ারী-দের মতানুসারে অনুরূপ জওয়াব দেন। কিন্তু সাধারণ মু'তাযিলী এবং কোন কোন অন্তঃবাদী ব্যাখ্যাকারী আয়াতটির এ তফসীর সমর্থন করেন নি। তাঁরা বলেন ঃ পাহাড়ের তসবিহ পাঠ হলো এমনি ধরনের, যেমন কুরআন শরীফের অন্যত্র রয়েছে—"এমন কোন বস্তু নেই, যা আল্লাহ্র তসবীহ পাঠ করছে না।" অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুই আপন আপন ভাব-ভঙ্গীতে আল্লাহ্র প্রশংসায় পঞ্চমুখ রয়েছে।

## পঞ্চম উদাহরণ

কুরআন মজীদে আছে ঃ

"যাকারিয়া বললেন : হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে তার কিছুটা লক্ষণ বাতলে দিন। আল্লাহ্ বললেন ঃ সেই লক্ষণ হলো, আপনি তিন দিন যাবত কথাবার্তা বলতে সক্ষম হবেন না। কেবল ইঙ্গিতেই কথাবার্তার কাজ চালাতে হবে।"

সাধারণ তফসীরবিদগণ বলেন, আল্লাহ তায়ালা হযরত যাকারিয়া (আঃ)-কে তার সন্তান লাভের লক্ষণ বাতলে দেন। তিন দিন তাঁর মুখ বন্ধ থাকে। কেবল ইঙ্গিতেই তিনি কথাবার্তার কাজ চালিয়ে যান।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নের অবতারণা করা হয়। প্রথমত এটা বলা হয় যে, এ ব্যাপারটি যুক্তি বিরোধী। দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো—কথা বলা না বলার সাথে সন্তান লাভের কি সম্পর্ক থাকতে পারে? তফসীরবিদগণ বলেনঃ এটা হলো অলৌকিক ব্যাপার এবং অলৌকিকত্ব একটি বৈধ-বিষয়। আবু মুসলিম ইসফাহানী বলেনঃ জবান বন্ধ থাকা বলতে 'ইতেকাফ'কে বুঝানো হয়েছে। কেননা, ইতেকাফের অবস্থায় ইঙ্গিত ছাড়া কথাবার্তা বলা অবৈধ ছিল। আল্লাহ তায়ালা হযরত যাকারিয়াকে বললেনঃ যখন আপনি ইতেকাফ এবং ইবাদতে মশগুল হবেন, তখনই আপনি সন্তানলাভ করবেন। ইমাম রাযী আবু মুসলিমের এই ভাষ্য উদ্ধৃত করে বলেনঃ

এই ব্যাখ্যা আমার মতে উৎকৃষ্ট এবং যুক্তিযুক্ত। কুরআনের ব্যাখ্যায় আবু মুসলিমের মতামত বিচার বুদ্ধিসম্মত। তিনি সাধারণত সূক্ষ্ম দিকগুলো তুলে ধরেন।

## ষষ্ঠ উদাহরণ

কুরআন মজীদে হযরত সুলাইমান সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছেঃ

"আমাকে পাখীর ভাষা শেখানো হয়েছে।"

আশায়েরাগণ বলেনঃ পাখীর কথাবার্তা বলা সম্ভব। হযরত সুলাইমান তাদের কথাবার্তা বুঝতে সক্ষম ছিলেন। এটা ছিল তাঁর মুজিযা।

কিন্তু মুহাদ্দিস ইবনে হাযম এই আয়াত সম্পর্কে বলেনঃ

জীবজন্তু প্রয়োজনের তাকিদে—যেমন খাদ্যের অনুসন্ধান, কষ্টের অনুভূতি, লড়াই, যৌন-সঙ্গম, ছানাকে ডাকা এবং এ ধরনের অন্যান্য প্রয়োজনে কিছু একটা আওয়াজের মাধ্যমে মনের কথার অভি ব্যক্তি করে থাকে—এটা আমরা অস্বীকার করি না। হযরত সুলাই-মানকে আল্লাহ সেই শিক্ষা দিয়েছিলেন। অর্থাৎ তিনি সেসব আওয়াজ শুনে তাদের মনোভাব বুঝতে পারতেন।

## সপ্তম উদাহরণ

কুরআন মজীদে আছে ঃ

"ইয়া আইয়ুহান্নাসুত্তাকু রাব্বাকুমুল্লাযী খালাকাকুম মিন্ নফসেঁ-ও ওয়াহিদাহ্।"

সাধারণ তফসীরবিদগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেনঃ আল্লাহ হযরত আদমকে সৃষ্টি করেন এবং তাঁর বাম পাঁজরের হাড় দিয়ে হযরত হাওয়াকে সৃষ্টি করেন। কিন্তু আবু মুসলিম ইসফাহানী বলেন ঃ 'মিন্হা' এর অর্থ হলো 'মিনজিনসিহা।' অর্থাৎ হযরত হাওয়াকে হযরত আদমের সমজাত করে সৃষ্টি করা হয়েছে, কিন্তু এ সৃষ্টি তাঁর বাম পাঁজরের হাড় থেকে নয়। মোটকথা এ ধরনের জায়গায় গবেষকদের মতে, লোকেরা কুরআনের ভুল অর্থ করেছে এবং তার ফলেই এ ধরনের প্রশ্নের উদ্ভব হচ্ছে।

## নাস্তিকদের আরো একটি বড় প্রশ্ন

নাস্তিকদের আরো একটি বড় প্রশ্ন ছিল এই যে, পরকালীন ভোগবিলাস সম্পর্কে ইসলাম যে সব বস্তুর বর্ণনা দেয়, যেমন দুধ, মধুর ঝরণা, কচি বয়স্কা হুর, মনোহরা তরুণী, রংবেরংগের ফুল, রত্নখচিত বড় বড় মহল—এসব ছেলে ভোলানো ছলনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

পরকাল আগাগোড়া একটি পবিত্র জগত। সেখানে যদি পার্থিব মনষ্কাম সিদ্ধির ব্যবস্থা থাকে, তবে এ অধম দুনিয়ার উপর তার শ্রেষ্ঠত্ব কি করে প্রতিপন্ন হবে? এ ছাড়া আরো অনেক অসম্ভব ও অবাস্তব বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। যেমন—হাত পায়ের সাক্ষ্যদান, পুলসিরাত অতিক্রম, কৃতকর্মের পরিমাপ, দোযখে জীবিত থাকা ইত্যাদি।

এ প্রশ্নগুলো সম্পর্কে তিনটি সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। আশায়েরা বলেন ঃ এসব ঠিক এমনিভাবেই ঘটবে, কুরআনে যেমন উল্লেখ আছে। এখানে অবাস্তবতার কোন প্রশ্নই উঠে না। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্যদান, কৃতকর্মের পরিমাণ, চিরস্থায়ী শাস্তি এসব অতি প্রাকৃতিক ব্যাপার হলেও মোটের উপর অসম্ভব কিছু নয়। আশায়েরা ছাড়া বাকী সমস্ত সম্প্রদায় বলেন ঃ পরকালীন বিষয়া-

দির আসল রূপ অন্য কিছু। তবে যে শব্দে এবং যে পন্থায় সেগুলোর ধারণা দেয়া হয়েছে, সেটা ছাড়া গত্যন্তরও ছিল না। মুহাদ্দিস ইবনে তাইমিয়া ছিলেন একজন বাহ্যপন্থী। তা সত্ত্বেও তিনি নুজুল নামক হাদীসের একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থে একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা পেশ করার পর বলেন ঃ

"আল্লাহ্ তায়ালা মানুষকে কিয়ামতের দিন যে শান্তি ও শাস্তি দেবার ওয়াদা করেছেন, যে পানাহার, শয়ন ও সঙ্গমের সুসংবাদ দিয়েছেন, সে সব ওয়াদাকৃত বস্তুসমূহের সাথে সামঞ্জস্য আছে, এমন সব পার্থিব বস্তুগুলো যদি আমরা না জানতাম, তবে অমাদের কাছে আল্লাহর ওয়াদা ও সুসংবাদ নিরর্থক হয়ে দাঁড়াতো। এ সামঞ্জস্য থাকা সত্ত্বেও আমরা এটা বুঝি যে, আল্লাহর ওয়াদাকৃত বস্তু এবং এই পার্থিব বস্তু মোটেই সমকক্ষ নয়। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন ঃ দুনিয়া এবং পরকালীন বস্তুসমূহের মধ্যে কেবলমাত্র নামেরই মিল রয়েছে। তা না হয় উভয়ের মধ্যে কোন তুলনাই হয় না।"

ইমাম গাযালী 'জাওয়াহিরুল কুরআন' নামক গ্রন্থে পরকালীন শাস্তির ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন ঃ মানুষের মধ্যে যে ষড় রিপু রয়েছে, সেটাকেই রূপক আকারে সাপ এবং বিছারূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

তিনি আরো বলেন ঃ আল্লাহর এবং রসূলের নিম্নলিখিত বাণীগুলোও এমনিভাবে রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ঃ

১. "তোমাদের কৃতকর্ম তোমাদের সামনেই হাযির করা হবে।" (আল-হাদীস)

২. কিয়ামতের দিন মানুষ তার সৎকর্মের ফল প্রস্তুত দেখতে পাবে।" (আল-কুরআন)

৩. "তোমাদের যদি নিশ্চিত বিশ্বাস থাকতো, তবে দোযখকে এক্ষুণি দেখতে পেতে" (আল-কুরআন)-এর মানে—দোযখ তোমাদের অন্তরেই রয়েছে। সুতরাং সেটাকে চাক্ষুষ দেখার পূর্বেই বিশ্বাস-সূত্রে এক্ষুণি দেখে নাও।

৪· "কাফেরগণ আপনার (রসূল করীম) নিকট শাস্তির বিষয়ে তাড়াহুড়া করছে। অথচ শাস্তি তাদের চারদিকে ঘিরে রেখেছে।" (আল-কুরআন)

এখানে আল্লাহ এটা বলেন নি যে, ভবিষ্যতে ঘিরে ফেলবে। বরং এটাই বলা হয়েছে যে, তা এখনো ঘিরে রেখেছে।

কারো কারো মতে, "বেহেশ্‌ত এবং দোযখ এখনো প্রস্তুত।" তাদের একথাটিও সেই গোত্রীয়।

ইমাম গাযালী বলেন ঃ আপনারা যদি বিষয়গুলো এমনিভাবে বুঝে নিতে না পারেন, তবে কুরআনের সারগর্ভে পৌঁছতে পারবেন না, বরং আপনাদের কাজ হবে কেবল খোসা নিয়ে টানাটানি করা। এর উদাহরণ হলো এমনি ধরনের, যেমন চতুষ্পদ জন্তু গমের শ্বাসের জন্য লালায়িত নয়, বরং তাদের প্রয়োজন হলো কেবল ভুষির। কুরআন মজীদ সকলের পক্ষেই জীবিকাস্বরূপ। তবে তা মানুষের জ্ঞানের পরিসর অনুসারে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি যে পর্যায়ের, সে কুরআন থেকে সে পরিমাণেই আহার্য সংগ্রহ করতে সক্ষম। মনে রাখতে হবে, প্রত্যেক প্রকারের খাদ্যেই সারাংশ, খোসা ও ভুষি এই তিনটি বস্তু রয়েছে।

## নাস্তিকদের আরো একটি প্রশ্ন

নাস্তিকদের আরো একটি বড় প্রশ্ন ছিল এই যে, ইহুদী ও পার্সীদের মধ্যে যে সব অলীক কাহিনী এবং গল্প প্রচলিত ছিল, কুরআন সে সবে পরিপূর্ণ। যেমন হারূত-মারূত নামক দুজন ফেরেশতা ব্যাবিলনের কূপে মাথা নত অবস্থায় আবদ্ধ রয়েছেন। তাঁরা লোকদের মন্ত্র শেখাচ্ছেন। ইয়াজুজ-মাজুজ দুটি অদ্ভুত আকৃতি বিশিষ্ট কওম। তাদের জন্যই সিকান্দর (আলেকজাণ্ডার) বাদশা সিকান্দরী দেয়াল স্থাপন করেন।

আরো প্রচলিত ছিল যে, হযরত দাউদ তাঁর দরবারের একজন অফিসারের স্ত্রীকে প্ররোচনা দিয়ে বাধ্য করেন। হযরত সুলাইমানের জন্য অস্তমিত সূর্য পুনঃ উদিত হয়। শয়তান আল্লাহর নিকট থেকে অনুমতি গ্রহণ করে হযরত আইয়ুবের সন্তান-সন্ততি ধ্বংস করে দেয় এবং তাঁকে এমন রুগ্ন করে দেয় যে, তাঁর গায়ে পোকা ধরে। হযরত ইব্রাহীম কয়েকবার মিথ্যার শিকারে পরিণত হন। হযরত আদম শির্‌ক করেছিলেন অর্থাৎ আপন সন্তানদের নাম আব্দুল হারেস রেখেছিলেন। হারেস ছিল শয়তানের নাম।

এ প্রশ্নগুলোর জওয়াব দেওয়া ইলমে কালামের অবশ্য কর্তব্য বিষয় ছিল। কিন্তু এ বিষয়ের গ্রন্থসমূহে এরূপ কিছু দেখা যায় না। মুতাকাল্লিম-গণ মনে করেন যে, এটা হাদীসবিদ ও তফসীরবিদদেরই দায়িত্ব।

তফসীর রচয়িতাগণ এ ধরনের কিস্‌সা সম্পর্কে যা লিখেছেন, তার সারমর্ম হলো-নবী সংক্রান্ত কিস্‌সাসমূহের যে অংশটুকু কুরআনে উল্লেখ রয়েছে, ততটুকু যথার্থ। কিন্তু বনি ইসরাইলেরা আসল কিস্‌সার সাথে যতটুকু জুড়ে দিয়েছে, তা যথার্থ নয়। এ জন্যই যেসব প্রাচীন তফসীরকারগণ তাঁদের তফসীরে বনি ইসরাইল প্রবর্তিত কিস্‌সা কাহিনী অন্তর্ভুক্ত করেন, মুহাদ্দিসগণ তাঁদের গ্রন্থসমূহকে, বরঞ্চ এসব তফসীরকারদেরকেও অযোগ্য এবং অবিশ্বাস্য বলে বিবেচনা করেন। প্রাচীন তফসীর রচয়িতাদের মধ্যে প্রধান কয়েক-জনের নাম হলো—মুজাহিদ, মুকাতিল্, ইবনে সুলাইমান, কালবী, যাহ্‌হাক ও সাদারী। তাঁরা কুরআনে বর্ণিত নবী-কাহিনীর সাথে ইহুদী মহলে প্রচলিত অনেক গল্প-গুজব জুড়ে দিয়েছেন। 'তফসীর এ কবীর' ইত্যাদিতে নবী:দর কিস্‌সার সাথে যে সব কৃত্রিম বর্ণনা স্থান লাভ করে, তা প্রাচীন তফসীর রচয়িতাদের নিকট থেকেই গৃহীত। মুজাহিদ ছিলেন একজন নির্ভরযোগ্য ইমাম। কিন্তু তাঁর তফসীরের বিষয়বস্তু বনি ইসরাইল থেকে গৃহীত হয়েছে বলে তাও অগ্রহণীয় বলে বিবেচিত। যাহাবী রচিত 'মিযানুল ই'তেদাল' নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, কেউ আ'মাশকে জিজ্ঞেস করলেন, মুজাহিদের তফসীর সাধারণ মতামতের পরিপন্থী কেন? তিনি বললেন, তাঁর তফসীর ইহুদী ভাবধারা থেকে গৃহীত।

মুহাদ্দিসীন মুকাতিলকে স্পষ্ট ভাষায় মিথ্যাবাদী ও বানওয়াটী বলে ঘোষণা করেন। তাঁর একমাত্র দোষ ছিল এই যে, তিনি আহ্‌লে কিতাবের বর্ণনা গ্রহণ করতেন। পক্ষান্তরে তাঁরা কাল্‌বী, সাদারী এবং যাক্‌হাক্-এর বর্ণনাকে সাধারণভাবে গ্রহণীয় বলে মনে করেন। যাহাবী রচিত 'মিযানুল-ইতেদাল' নামক গ্রন্থে এঁদের প্রত্যেকের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়।

আল্লামা ইবনুল খালদুন এই আলোচনার উপর ভিত্তি করে একটি সুখপাঠ্য প্রবন্ধ রচনা করেন। তার অনুবাদ পেশ করা হলো ঃ

পূর্ববর্তী ইমামগণ তথ্য সংগ্রহ করেছেন খুব বেশী। কিন্তু তাঁদের রচনাবলীতে খাঁটি, মেকি, গ্রহণীয়, অগ্রহণীয় সব কিছুই

রয়েছে। এর কারণ হলো, আরবরা ছিলেন একটি অশিক্ষিত জাতি। যাযাবরতা ও মূর্খতা যেন তাদের ধাতেই বদ্ধমূল ছিল। সাধারণ মানুষের ন্যায় তাদের মনেও স্বভাবতঃ কতগুলো প্রশ্ন জাগতো। যেমন, দুনিয়া কি করে সৃষ্টি হলো? সৃষ্টির মূল কোথায়? অস্তিত্বের রহস্য কি? তারা এ প্রশ্নগুলো 'আহলে কিতাবের' নিকট জিজ্ঞেস করতো। সে সময়কার আরবের আহলে কিতাবেরা ছিল বেদুঈন। তাদের চিন্তাধারা ছিল মূর্খদের ন্যায়। তারা প্রধানতঃ ছিল 'হুমাইর' গোত্রভুক্ত। তারা এক সময় ইহুদী ছিল। পরে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। তারা শরীয়ত বিষয়ে মতামত প্রকাশে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতো। কিন্তু বিশ্ব সৃষ্টির কারণ, নবীদের কাহিনী ইত্যাদি বিষয়ে পূর্ব ধর্মীয় মতামতই পোষণ করতো। কায়াব, আহ্বার, ওহ্হাব, ইবনে মুনাব্বাহ্, আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম প্রমুখ ছিলেন তাদেরই অন্যতম। ইহুদী ধর্মের যে সব গল্প, কাহিনী এবং প্রচলিত মতামত তাঁরা ধরে রেখেছিলেন, সেগুলো তাঁদের মাধ্যমে তফসীরের গ্রন্থসমূহে প্রবেশ করে। তাঁদের এই বর্ণনাগুলো শরীয়তের আদেশ নিষেধ বিষয়ক ছিল না। তাই তফসীর রচয়িতাগণ সেগুলো গ্রহণ করার সময় সাবধানতা অবলম্বন করেন নি। ফলত যাবতীয় তফসীরগ্রন্থ এসব প্রচলিত কিস্‌সা কাহিনীতে ভরে যায়। অথচ এই বর্ণনাগুলোর মূলে ছিল সেই যাযাবর ইহুদী, যাদের শুদ্ধ-অশুদ্ধ যাচাই করার কোন শক্তিই ছিল না। কিন্তু ধর্মপরায়ণতার দিক থেকে তারা ছিল খ্যাত ও সুপরিচিত। তাই লোকেরাও তাদের সম্মান করতো। এটাই হলো তাদের কিংবদন্তীসমূহের জনপ্রিয়তা লাভের একমাত্র কারণ।

তফসীরবিশারদগণ এ ব্যাপারে কেবল সাবধানতার বাণী উচ্চারণ করেই ক্ষান্ত হন নি। তাঁরা তফসীরে বর্ণিত বিশেষ বিশেষ কিস্‌সা সম্পর্কে পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন যে, এগুলো ভ্রান্ত এবং কৃত্রিম। ইমাম রাযী তাঁর 'তফসীর-এ-কবীর' গ্রন্থের অনেক স্থানে জোরালো ভাষায় এসব কিস্‌সা কাহিনীর অসারতা প্রমাণ করেন।

এ ছাড়া গবেষকগণ এ দিকটাও খতিয়ে দেখেছেন যে, কুরআন মজীদে যে সব কিস্‌সা রয়েছে, তা ঐতিহাসিক ঘটনারূপে বিধৃত হয়েছে, না কেবল শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে সেগুলো লোকদের সামনে

উপস্থাপিত করা হয়েছে? শাহ্ ওলী উল্লাহ্ 'ফওযুল-কবীর-ফী উসূলীত তফসীর' নামক গ্রন্থে বলেন ঃ

"আল্লাহ্তায়ালা অনেক ঘটনার উল্লেখ করেছেন। অনুগতদের পুরস্কার এবং অবাধ্যদের শাস্তি সম্পর্কিত অনেক সংক্ষিপ্ত কিস্‌সা কুরআনে স্থান লাভ করেছে। এসব কাহিনীর উৎস বিভিন্ন। নূহ্, আদ, সামুদ এসব কওমের কিস্‌সাগুলো আরবগণ তাদের পূর্ব পুরুষ থেকেই শিক্ষালাভ করে। আরবগণ ইহুদীদের সাথে যুগ যুগ ধরে সহঅবস্থান করে এবং তাদের অনেক প্রচলিত লৌকিক উপাখ্যানও গ্রহণ করে। এরই ফলে হযরত ইব্রাহীম এবং বনি ইসরাইলের নবীদের কিস্‌সা-সমূহ জনপ্রিয়তা লাভ করে। এ সব প্রচলিত কিস্‌সা-সমূহের কিছুটা অংশ মানুষের শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে কুরআনে বিধৃত করা হয়। যাবতীয় কিস্‌সা হুবহু বর্ণিত হয়নি।"

"সুতরাং এটাই প্রতীয়মান হয় যে, এসব কিস্‌সা কাহিনীর উদ্দেশ্য ইতিহাসের ঘটনাবলী শেখানো নয়, বরং শিরক ও গোনাহের অশুভ পরিণাম, গোনাহ্গারের প্রতি আল্লাহর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহে সৎ বান্দাদের তৃপ্তি লাভ—এসব বিষয়ের প্রতি শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই হলো এসবের উদ্দেশ্য।"

## অপ্রকাশ্য ও পরোক্ষ অর্থ গ্রহণ (তাবীল)

মুতাকাল্লিম এবং প্রাচীন তফসীরবেত্তাগণ কুরআন মজীদের শব্দ এবং মূল বচনের যে ব্যাখ্যা দেন, তাতেই নাস্তিকদের উত্থাপিত প্রশ্নাবলীর প্রত্যুত্তরের কাজ সম্পন্ন হয়। কিন্তু অপর একটি বড় প্রশ্ন অমীমাংসিত থেকে যায়। তা হলো, কুরআন মজীদে পরোক্ষ অর্থ গ্রহণ করা কোন্খানে বৈধ, আর কোন্খানে বৈধ নয়? এ বিষয় নিয়ে তুমূল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। 'মুজাস্‌সিমা' এবং 'মুশাব্বিহা' সম্প্রদায়ের মতে, কোন শব্দেরই পরোক্ষ অর্থ করা বৈধ নয়। তাঁরা এ মত থেকে আদৌ হটতে রাযী নন। তাঁরা বলেন, কুরআন মজীদে যেখানে 'আল্লাহ্র হাত'—বলা হয়েছে, সেখানে হাতই অর্থ করা হবে। পক্ষান্তরে, 'বাতিনিয়া' সম্প্রদায় বলেন, কুরআন মজীদের

প্রত্যেকটি শব্দে পরোক্ষ অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে। তাঁরা আরো বলেন, রোযা, নামায, যাকাত এসবেরও প্রকাশ অর্থ উদ্দেশ্য নয়।

একটি বিস্ময়কর ব্যাপার হলো এই যে, এগুলোতে বর্তমানে যেভাবে কুরআন মজীদের পরোক্ষ অর্থ করা হচ্ছে, তেমনি পূর্ববর্তীকালের হিতৈষী লোকেরাও এ অনুরূপ অর্থ করতেন। ইমাম রাযী 'তফসীর-এ-কবীর' গ্রন্থে কুরআনের সূরায়ে সাবার আয়াত "অলে-সুলাইমানার রীহু গুদুব্বুহা শাহ্রুন"-এর তফসীরে কোন কোন লোকের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, কুরআন মজীদের প্রকাশ্য শব্দে বুঝায় যে, বাতাস, জিন এবং শয়তান হযরত সুলায়মানের সেবায় নিয়োজিত ছিল। কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ হলো এই যে, তিনি বাতাসের মত বেগবান ঘোড়া পালতেন এবং দৈত্যাকৃতি মানুষ তাঁর এখানে কাজ কর্ম করতো।

কুরআন শরীফে হযরত ঈসা (আঃ)-এর মুজিযার বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, তিনি মৃতকে জীবিত করতেন। সেখানে কোন কোন লোক এই পরোক্ষ অর্থ করেছেন যে, তিনি মৃত-প্রাণ ব্যক্তিদের হেদায়েত করতেন। এটাই ছিল তাদের জন্য চিরস্থায়ী জীবন।

'কোথায় পরোক্ষ অর্থ গ্রহণ করা হবে, আর কোথায় হবে না'—এ সম্পর্কে 'মুশাব্বিহা' এবং 'বাতিনিয়া' ছাড়া বাকী সম্প্রদায়সমূহ বাধ্য হয়ে কতগুলো নীতি নির্ধারণ করেন।

আশায়েরা এ নীতি নির্ধারণ করেন যে, যে স্থানে প্রকাশ্য এবং আভিধানিক অর্থ গ্রহণে বিশেষ অসুবিধা দাঁড়ায়, কেবল সেখানেই পরোক্ষ অর্থ করা বৈধ, অন্যথা নয়। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে—'আল্লাহ্র 'ইয়াদ' আছে। 'ইয়াদ' এর মানে হলো হাত। এখানে যদি 'আল্লাহ্র হাত' এ অর্থ করা হয়, তবে তিনি 'শরীরী' হয়ে দাঁড়ান। অথচ যুক্তিতে পূর্বেই প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি শরীরী হতে পারেন না। এ জন্যই আশায়েরা কবরের সাপ, বিছা, তুলাদণ্ড, পুল-সিরাত—এরূপ বিষয়াদির প্রকাশ্য অর্থই গ্রহণ করছেন। কারণ এ গুলোর প্রকাশ্য অর্থে কোন অসুবিধা দাঁড়ায় না। অন্যান্য গবেষকগণ এ নীতিকে আরো ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেন। এ ব্যাপারে সবচাইতে বেশী সূক্ষ্ম এবং বিস্তারিত আলোচনা করেন ইমাম গাযালী তাঁর 'তাফ্রিকাতু বাইনাল-ইসলাম-অয্-যানদাকাহ্' নামক গ্রন্থে। আমি এখানে যতটুকু প্রয়োজন, কেবল ততটুকুর সারমর্মই পেশ করছি।

'তসদীক' অর্থাৎ বিশ্বাসের মানে হলো রসূল করীম যে বস্তুর অস্তিত্ব আছে বলে উক্তি করেছেন, তা বিশ্বাস করা। অস্তিত্বের পাঁচটি শ্রেণী রয়েছে। এ সব শ্রেণী সম্পর্কে অবহিত না থাকার ফলেই এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করে। তাই অস্তিত্বের বিভিন্ন শ্রেণীর বিস্তারিত বিবরণ দিচ্ছি ঃ

১. সত্তামূলক অর্থাৎ বাস্তব অস্তিত্ব।

২. অন্তর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অস্তিত্ব। যেমন স্বপ্নে দেখা বস্তু। এ অস্তিত্ব কেবল আমাদের অন্তর ইন্দ্রিয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। রুগ্ন ব্যক্তির জাগ্রত অবস্থায় কাল্পনিক ছবি দেখা অথবা আগুনের ফুলকিকে বৃত্তাকার দেখা—এসবও এ গোত্রীয় অস্তিত্ব। মূলত আগুনের কোন বৃত্ত নেই। কিন্তু আমাদের কাছে তা বৃত্ত বলেই মনে হয়।

৩. কাল্পনিক অস্তিত্ব। যেমন, হামীদকে একবার দেখলাম। অতঃপর চোখ বন্ধ করলাম। তখন তার যে আকৃতিটি আমাদের চোখে ভাসে, তা'ই কাল্পনিক অস্তিত্ব।

৪. বুদ্ধিজাত অস্তিত্ব। যেমন, আমারা যখন বলি, এ বস্তুটি আমাদের হাতে আছে, তখন এটাই বুঝানো উদ্দেশ্য হয় যে, এ বস্তুটি আমাদের এখতিয়ার এবং ক্ষমতাধীন আছে। এমতস্থলে এখতিয়ার এবং ক্ষমতার যে অস্তিত্ব ধরে নেয়া হয়, সেটাই বুদ্ধিজাত অস্তিত্ব।

৫. সাদৃশ্যমূলক অস্তিত্ব। অর্থাৎ যে বস্তু স্বয়ং বিদ্যমান নয়। কিন্তু তার মত অন্য একটি বস্তু বিদ্যমান রয়েছে।

বিভিন্ন অস্তিত্বের বর্ণনা দেবার পর ইমাম গাযালী প্রত্যেক প্রকার অস্তিত্বের কয়েকটি উদাহরণ দেন। যেমন হাদীসে আছে, "কিয়ামতের দিন মৃত্যুকে ভেড়ীর আকারে উপস্থিত করা হবে এবং তাকে জবাই করা হবে।" ইমাম সাহেব এ অস্তিত্বকে অন্তর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অস্তিত্বের অন্তর্ভুক্ত করেন। দ্বিতীয় উদাহরণ হলো—রসূল করীম বলেছেন, "আমি ইউনুসকে দেখছি।" ইমাম সাহেব এ অস্তিত্বকে কাল্পনিক অস্তিত্ব বলে বর্ণনা করেন।

বিস্তারিত বিবরণ পেশ করার পর ইমাম গাযালী বলেন, শরীয়তে যত বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে, তাদের কোন একটাকে সর্বতোভাবে অস্বীকার করা কুফর। অবশ্য অস্তিত্বের উপরিউক্ত শ্রেণীসমূহের যে কোন

একটির আওতায় ফেলে যদি তা মোটামুটি স্বীকার করে নেয়া হয়, তবে কুফর হবে না। কারণ, এটা হলো পরোক্ষ অর্থ প্রয়োগের শামিল। পরোক্ষ অর্থ প্রয়োগ থেকে কোন সম্প্রদায়ের গত্যন্তর নেই।

ইমাম আহ্‌মদ ইবনে হাম্বল পরোক্ষ অর্থ (তাবীল) এড়াবার সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। কিন্তু নিম্নলিখিত হাদীসসমূহে তাঁকেও পরোক্ষ অর্থ গ্রহণ করতে হলো :

রসূল করীম বলেন :

"কালো পাথর (হাজরে আসওয়াদ) হলো আল্লাহ্‌র হাত।"

"মুসলমানের অন্তর আল্লাহ্‌র অঙ্গুলীসমূহের মধ্যে অবস্থিত।"

"আমি ইয়ামেন থেকে আল্লাহ্‌র খোশবু পাচ্ছি।"

অতঃপর ইমাম সাহেব লিখেন, হাদীসে আছে যে, "কিয়ামতের দিন মানুষের কৃতকর্ম (আমল) ওজন করা হবে।" এটা জানা কথা যে, আমল গুণবাচক বস্তু। তা ওজন করা সম্ভব নয়। তাই সবাই ওজনের পরোক্ষ অর্থ গ্রহণ করতে বাধ্য হন। আশায়েরা বলেন, এর অর্থ আমলনামার কাগজ ওজন করা হবে। মুতাযিলা বলেন, ওজন করার অর্থ হলো, বিষয়টি সমক্ষে তুলে ধরা। মোট কথা, উভয় সম্প্রদায়কেই তাবীল করতে হলো। হাঁ, যারা বলেন, 'আমল গুণবাচক বস্তু, সেটাই ওজনবিশিষ্ট বস্তুতে পরিণত হবে এবং সেটাই ওজন করা হবে'—তাদের আমি নিরেট মূর্খ এবং নির্বোধ বলে মনে করি।

এরপর ইমাম গাযালী 'তাবীলের নীতি' বর্ণনা করেন এবং বলেন, শরীয়তে যে সব বস্তুর উল্লেখ রয়েছে, তাদের বাহ্য অস্তিত্বকে মেনে নেওয়াই উচিত। যদি এমন কোন অকাট্য প্রমাণ থাকে, যাতে বুঝা যায় যে, বিশেষ কোন বস্তুর বাহ্য অস্তিত্ব সমর্থন-যোগ্য নয়, তবে তাকে অন্তর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অস্তিত্ব বা কাল্পনিক অস্তিত্ব বা বুদ্ধিজাত অস্তিত্ব বা সাদৃশ্যমূলক অস্তিত্ব বলে ধরে নিতে হবে। এখন প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, একজনের নিকট যা অকাট্য প্রমাণ বলে বিবেচিত, তা হয়তো অন্যের নিকট তদ্রূপ নয়। যেমন, আশয়ারীদের মতে, আল্লাহ্ কোন দিকের সাথে সীমাবদ্ধ হতে পারেন না। কারণ, এ ব্যাপারে তাঁদের কাছে দৃঢ় যুক্তি রয়েছে। পক্ষান্তরে, হাম্বলীদের

মতে, এর পেছনে কোন যুক্তি নেই। এমন ক্ষেত্রে তাবীল করার দায়ে কাউকেও কাফের বলে অভিযুক্ত করা সমীচীন হবে না। বেশীর পক্ষে এতটুকু বলা যাবে যে, সে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট বা বেদা'তী।

অতঃপর ইমাম গায্যালী বলেন, যদি তাবীল করার দায়ে কাউকেও কাফের বলে আখ্যায়িত করতে হয়, তবে আমাদেরকে সর্বপ্রথম খতিয়ে দেখতে হবে যে, তাবীল সংক্রান্ত ঐশী বাণীটি পরোক্ষ ও অপ্রকাশ্য অর্থে ব্যবহৃত হবার যোগ্য কি না। যদি হয়, তবে তা সহজবোধ্য, না কঠিন? সেটি 'হাদীস-এ মুতাওয়াতির, না হাদীস-এ-আহাদ? অর্থাৎ তা বহু রাবী (বর্ণনাকারী) বর্ণিত, না একক রাবী বর্ণিত? তা ইজমাতে পরিণত হয়েছে কিনা অর্থাৎ তাতে যুগের সমস্ত ওলামার সমর্থন রয়েছে কিনা? যদি সেই ঐশীবাণী 'হাদীস-এ-মুতাওয়াতির' পর্যায়ের হয়, তবে দেখতে হবে যে, তাতে তাওয়াতুরের (মুতাওয়াতির হওয়া) শর্তাবলী পাওয়া যায় কি-না? 'মুতাওয়াতির' এর সংজ্ঞা হলো বর্ণনার দিক থেকে তা হবে সমস্ত সন্দেহের উর্ধ্বে। যেমন, নবিগণ, বিখ্যাত শহর, কুরআন মজীদ—এসবের অস্তিত্ব মুতাওয়াতির পর্যায়ের অর্থাৎ সন্দেহাতীত। কিন্তু কুরআন ছাড়া অন্য কোন বস্তুর নিঃসন্দেহ হওয়াটা খুবই দুষ্কর। কেননা এমন একটি ব্যাপারেও বেশীর ভাগ লোকের মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, যা মূলত যথার্থ নয়। যেমন হযরত আলীর খিলাফত সম্পর্কে শিয়া জামাত বর্ণিত হাদীসসমূহ। 'ইজমা'-এর যথার্থতা নিরূপণ করা আরো মুশকিল। কেননা, ইজমা বলতে আমরা বুঝি—কোন ব্যাপারে ধর্মীয় জনকদের মতৈক্যে উপনীত হওয়া এবং বেশ কিছুকাল, আবার কারো কারো মতে প্রথম যুগ শেষ হওয়া পর্যন্ত সেই মতের উপর কায়েম থাকা।

এ ধরনের ইজমা কেউ অস্বীকার করলে সে ব্যক্তি কাফের হবে কিনা—এ ব্যাপারেও মতানৈক্য রয়েছে। কেননা কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে, ইজমা প্রতিষ্ঠিত হবার সময় যখন কোন এক ব্যক্তির বিরোধিতা অবৈধ ছিল না, তবে এখন তা অবৈধ হবে কেন?

অতঃপর তাওয়াতুর বা ইজমা থাকা সত্ত্বেও দেখতে হবে যে, যিনি তাবীল করছেন, তিনি তাওয়াতুর বা ইজমা সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল কি-না? যদি ওয়াকিফহাল না হন, তবে এই তাবীলের জন্য তিনি গুণাহগার হতে পারেন, কিন্তু মিথ্যাবাদী হতে পারেন না।

অতঃপর দেখতে হবে যে, যে প্রমাণের উপর নির্ভর করে তিনি তাবীল করছেন, তা প্রমাণের শর্তানুসারে উত্তীর্ণ হয় কিনা? প্রমাণের শর্ত বলতে কি বুঝায়, তা ব্যাখ্যা করতে হলে একটি স্বতন্ত্র বড় গ্রন্থের প্রয়োজন। আমি 'মুহিক্কুল ফিতর' নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে কিছুটা বর্ণনা করেছি। কিন্তু এ যুগের অধিকাংশ ফকীহ্ ব্যাপারটি বুঝতে অক্ষম। অবশ্য প্রমাণটি যদি অকাট্য হয়, তবে এমন তাবীল করার অনুমতি রয়েছে, যা মূল বচনের প্রকাশ্য এবং প্রত্যক্ষ অর্থের কাছাকাছি। দূরবর্তী অর্থে তাবীল করা বৈধ নয়।

অতঃপর দেখতে হবে যে, যে বিষয়টির পরোক্ষ অর্থ করা হচ্ছে, তার সাথে ধর্মের মৌলিক নীতির কোন যোগসূত্র রয়েছে কিনা? যদি না থাকে, তবে সেক্ষেত্রে পরোক্ষ অর্থ করা বা না করার ব্যাপারে কোন কড়াকড়ি নেই। যেমন শিয়াগণ মনে করেন যে, ইমাম মেহেদী মাটির তলায় উধাও হয়ে গেছেন। এটা হলো একটা সংস্কার। এরূপ বিশ্বাসের ফলে ধর্মে কোন ব্যাঘাত জন্মায় না।

এখন পাঠকবৃন্দ বুঝতে পারেন যে, কোন ব্যক্তিকে কাকেও কাফের বলে আখ্যায়িত করার জন্য উপরিউক্ত বিষয়গুলোর প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। আপনারা আরো বুঝতে পারবেন যে, আশয়ারীদের বিরোধিতার উপর নির্ভর করে কাউকেও কাফের বলা অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নয়। ফকীহ্দের পক্ষে কেবল ফিক্হ্ শাস্ত্রের উপর ভিত্তি করে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা মোটেই সম্ভব নয়। সুতরাং যখনি আপনারা দেখবেন যে, কোন ফকীহ্ কেবল ফিকহের উপর ভর করে কোন ব্যক্তিকে কাফের বা পথভ্রষ্ট বলে আখ্যায়িত করছেন, তখন তাঁর মতের মোটেই গুরুত্ব দেবেন না।

ইমাম সাহেব অন্যত্র বলেন, "যে সব বস্তু আকাইদ সংক্রান্ত নয়, তাতে পরোক্ষ অর্থ গ্রহণ করার দায়ে কাউকেও কাফের বলা উচিত হবে না। যেমন কোন কোন সূফী তাবীল করে বলেন, হযরত ইব্রাহীম সূর্য এবং চন্দ্রকে আল্লাহ্ বলে মনে করেন নি। কেননা, কোন জড় বস্তুকে তিনি আল্লাহ্ বলবেন—এটা নবীর পদমর্যাদার বরখেলাফ। বরং আকাশের মৌল উপাদানের স্রষ্টাকেই আল্লাহ্ বলে মনে করেন।"

## আকাইদ প্রমাণ

বস্তুত আকাইদ প্রমাণ করাই হলো 'ইলমে কালাম'। এটাই 'ইলমে কালামে'র প্রাণবস্তু। কিন্তু দুঃখের বিষয় পূর্বসূরী ইমামগণ তাঁদের রচনায় এ বিষয়ের উপর মোটেই আলোকপাত করেন নি। শেষ যুগীয় ইমামগণ যদিও ভূরি ভূরি লিখেছেন, কিন্তু তাঁদের লেখা নিম্নের চরণটির মর্ম কথাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়ঃ

"নানা ব্যাখ্যার দরুন আমার স্বপ্ন হয়ে দাঁড়ালো এক বিভ্রাট।"

## শেষ যুগীয় ইমামদের প্রথম ভুল

শেষ যুগীয় ইমামদের সবচাইতে বড় ভুল হলো এই যে, তাঁরা এমন সব বিষয়কে ইসলামী আকাইদের অন্তর্ভুক্ত করেন, যার প্রতিষ্ঠা বা অপ্রতিষ্ঠার সাথে ইসলামের তেমন কোন সম্পর্ক নেই। অথচ এসব বিষয় ইলমে কালামের এক বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে। "শরহে মাওয়াকিফ', 'শরহে মাকাসিদ' ইত্যাদি গ্রন্থে যে সব বিষয়কে আকাইদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, সেগুলো গণনা করলে তার সংখ্যা দাঁড়াবে কয়েক শতকে। অথচ এর মধ্যে এমন দশটি বিষয়ও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেগুলোকে বস্তুত আকাইদরূপে পরিগণিত করা চলে। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করছিঃ

আল্লাহ্‌র গুণাবলী তাঁর সত্তাভুক্ত নয়।

আল্লাহ্‌র সত্তায় নশ্বর কিছুই জড়িত হতে পারে না।

স্থায়িত্ব অস্তিত্বের একটি গুণ। কিন্তু তা সত্তা বহির্ভূত।

শ্রবণ ও দর্শন এগুলো আল্লাহ্‌র গুণ। কিন্তু জড় বস্তুর সাথে জড়িত হতে পারে।

আল্লাহর বাণীতে একাধিক্য নেই। তা সর্বতোভাবে একক।

আল্লাহ্‌র সত্তাগত বাণী শ্রবণযোগ্য।

ঐশী শক্তি কর্মের পূর্ব শর্ত।

শূন্য বলতে কিছুই নেই।

জীবনের জন্য দেহ শর্ত নয়।

## দ্বিতীয় ভুল

শেষ যুগীয় ইমামদের দ্বিতীয় ভুল হলো এই যে, তাঁরা এমন অনেক বিষয় বাড়িয়ে-চড়িয়ে বলেন, যা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল

কখনো বলেন নি। তাঁরা এসব মনগড়া বিষয়কে আকাইদের অঙ্গরূপে পরিগণিত করেন। তাদের এসব অভিনব সংযোজনের বেশীর ভাগ ছিল কল্পনাপ্রসূত। সেগুলো প্রমাণ করতে গিয়ে তাঁদেরকে অনেক গলাবাজিও করতে হয়। কিন্তু তা মোটেই ফলপ্রসূ হয়নি। যেমন ওহীভিত্তিক একটি প্রচলিত ধর্মীয় মতবাদ হলো এই যে, কিয়ামতের দিন মৃত ব্যক্তিদের পুনরুত্থান হবে। কিন্তু তাতে উল্লেখ ছিল না যে, পুনরুত্থান সাবেক দেহ সমেত হবে, না অন্য একটি অভিনব দেহ নিয়ে। শেষ যুগীয় আশায়েরাবাদিগণ এর সাথে এতটুকু বাড়িয়ে দিলেন যে, সেই পুনরুত্থান হবে সাবেক দেহ নিয়ে। এই উক্তির ফলে তাঁদের সামনে দেখা দিল অপর একটি সমস্যা। তা হলো ধ্বংসপ্রাপ্ত অস্তিত্বের পুনরাবৃত্তি হয় কি করে? এ প্রশ্নটি হয়ে উঠে ইলমে কালামের এক গুরুগম্ভীর বিষয়। এর বৈধতা প্রমাণের জন্য তাঁদেরকে অনেক যুক্তি দাঁড় করাতে হয়। মোট কথা, এমনিভাবে বহু অপ্রয়োজনীয় বিষয় ইলমে কালামে প্রবেশ লাভ করে। মজার ব্যাপার হলো—'সুন্নী' হবার জন্য এই মনগড়া আকাইদগুলোকে মাপকাঠিরূপে নির্ধারণ করা হলো। শেষ পর্যন্ত শাহ্ ওলীউল্লাহ্ মরহুম এসব ভ্রম নিরসনে ব্রতী হন। 'হুজ্জাতুল্লাহিল-বালিগাহ্' নামক গ্রন্থে তিনি বলেন ঃ

> "যে সব বিষয়ে বিভিন্ন মুসলিম সম্প্রদায় পরস্পর বিরোধী মতবাদ পোষণ করেন, তা দু'প্রকার ঃ ১. আল্লাহ্ এবং রসূলের নির্দেশ রয়েছে, এমন সব বিষয়। ২. কুরআন—হাদীসে কোন নির্দেশ নেই, সাহাবাগণও কোন মতামত ব্যক্ত করেন নি, এমন সব বিষয়। যেমন, ক. 'কার্যকারণ'। এর মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে, তা অনিবার্যতামূলক নয়। খ. ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তুর পুনঃঅস্তিত্ব সম্ভব। গ. শ্রবণ ও দর্শন আল্লাহ্র দুটি স্বতন্ত্র গুণ। ঘ. আরশের উপর আল্লাহর আসীন হওয়া মানে তাঁর আধিপত্য কায়েম হওয়া ইত্যাদি। 'আহলে সুন্নাত-অল-জামাত'ভুক্ত হতে হলে এ সব বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে'—এরূপ কোন মাপকাঠি হতে পারে না।"

শাহ সাহেব আরো বলেন ঃ

এসব বিষয়ের উপর ভিত্তি করে কোন সম্প্রদায় যদি নিজকে সুন্নী বলে দাবী করে এবং সেজন্য গর্ব অনুভব করে, তবে তা ন্যায় হবে না"

এরপর শাহ্ সাহেব ব'লেন ঃ

এ বিষয়গুলো সুন্নী হবার জন্য কি করে মাপকাঠি হতে পারে? কেননা, সুন্নী বলতে যদি খাঁটি সুন্নাতের অনুসরণ বুঝায়, তবে এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করাই উচিত হবে না। বলা যেতে পারে, কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যা এবং ব্যাখ্যার পূর্ব-শর্ত থেকে এ বিষয়গুলোর উৎপত্তি হয়েছে এবং সেজন্যই এগুলোকে ঐশী বাণী সংক্রান্ত বিষয়রূপে পরিগণিত করা হয়েছে। কিন্তু এরূপ যুক্তি প্রদর্শন করাও ঠিক হবে না। কেননা তাঁরা কুরআন-হাদীস থেকে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা পুরোপুরি শুদ্ধ ও গ্রহনীয় নাও হতে পারে; যে সব বিষয়কে তাঁরা পূর্ব-শর্তরূপে ধরে নিয়েছেন, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে পূর্ব-শর্ত না-ও হতে পারে; যে সব বিষয়কে তাঁরা অগ্রাহ্য করেন, তা মূলত অগ্রাহ্য করার বিষয় নাও হতে পারে; আবার তাঁরা এসব বিষয়ে যে ব্যাখ্যা-বিবরণ দিয়েছেন, তা অন্য সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যা থেকে হয়তো অধিকতর শ্রেয় নয়।

এখন রইলো সে সব বিষয়, যা প্রকৃতপক্ষে ইসলামের মৌলিক বিষয়রূপে পরিগণিত। এগুলোর যথার্থতা সম্পর্কে কোন প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু শেষ যুগীয় ইমামগণ এ গুলো প্রমাণ করতে গিয়ে এমন নীতি অবলম্বন করেন, যে সম্পর্কে প্রশ্নের পর প্রশ্ন দাঁড়ায়। উদাহরণ-স্বরূপ এখানে দু'টি বিষয়ের উল্লেখ করছি, যাতে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, শেষ যুগীয় ইমামগণ যুক্তি প্রমাণে কিরূপ পন্থা অবলম্বন করেছেন।

## আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব প্রমাণ

কুরআনে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের যে প্রমাণ রয়েছে তা দু'প্রকার ঃ ১. সম্বোধনমূলক ২. যুক্তিমূলক। কিন্তু ইলমে কালাম গ্রন্থে এগুলোর কোন উল্লেখ নেই। তাতে যে যুক্তি প্রমাণ পেশ করা হয়েছে, তা এই ঃ

১. বিশ্ব নশ্বর; যা নশ্বর, তা হেতু-নির্ভরশীল; তাই বিশ্ব হেতু-নির্ভরশীল। এই হেতু-ই আল্লাহ্।

২. বিশ্ব অনাবশ্যক; যা অনাবশ্যক, তা হেতু নির্ভরশীল।

৩. পরমূর্ত পদার্থ (বর্ণ, গন্ধ) নশ্বর; যা নশ্বর তা হেতু-নির্ভরশীল।

৪. সমস্ত পদার্থ সাদৃশ্যমূলক; যা সাদৃশ্যমূলক, তা স্বীয় বৈশিষ্ট্যের জন্য হেতু-নির্ভরশীল।

এ প্রমাণ চারটি ত্রুটিমুক্ত নয়। কেননা, বিশ্বের নশ্বরতা ও অনাবশ্যকতা একটি বিতর্কমূলক বিষয়। দ্বিতীয়তঃ সমস্ত পদার্থের সাদৃশ্য মূলক হওয়াও প্রমাণ-সিদ্ধ নয়। এ ছাড়া এ সব প্রমাণ কেবল তখনি ফলপ্রসূ হতে পারে, যদি 'কার্য-কারণে'র অনন্ত ধারাকে নাকচ করা যায়। তা না হলে একজন প্রকৃতিবাদী প্রশ্ন করতে পারে যে, 'কার্য-কারণে'র অনন্ত ধারা তো আদিকাল থেকেই চলে আসছে। মুতাকাল্লিমগণ অনন্তধারার এ প্রশ্নটি নাকচ করার জন্য বহু প্রমাণ দেন। কিন্তু এ সব প্রমাণ দিয়ে কেবল সেই অনন্তধারাকেই বাতিল করা যায়, যার অঙ্গগুলো পরস্পর সংহত ও অভিন্ন। আর যদি স্বীকার করা হয় যে, পূর্ববর্তী হেতুগুলো বিলুপ্ত হয়ে থাকে, তবে এ সব যুক্তি দিয়ে 'কার্যকারণে'র অনন্ত ধারা বাতিল করা সম্ভব নয়।

এ ছাড়া এখানে আরো অনেক কথা রয়েছে। উপরিউক্ত প্রমাণ চারটি যদি ত্রুটিবিহীন হয়, তবে তা দিয়ে কেবল হেতু প্রমাণ করাই সম্ভব হতে পারে। কিন্তু সেই হেতু যে এখতিয়ারসম্পন্ন এবং ক্ষমতাশীল হবে, তাতো প্রমাণিত হয় না। কেননা হেতু দু'প্রকারঃ সত্তা-উদ্ভূত। যেমন সূর্য হলো আলোর হেতু। দ্বিতীয় হলো স্বেচ্ছা-উদ্ভূত। যেমন মানুষ হলো তার স্বেচ্ছা-প্রণোদিত কার্যবলীর হেতু। তাই নিছক হেতু প্রতিষ্ঠিত হলেই আল্লাহ্‌র ইচ্ছাপরিচালিত বা এখতিয়ারসম্পন্ন হেতু হওয়া কি করে প্রতিষ্ঠিত হবে? অথচ উদ্দেশ্য হলো সেটাই।

নবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণে পূর্ববর্তী ইমামগণ কিভাবে প্রমাণ পেশ করেছেন, তা গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হবে। শেষ যুগীয় ইমামগণ কেবল মুজিয়ার উপর ভিত্তি করেই নবুওয়াতের যথার্থতা প্রমাণ করেন। এতে বহু প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে এবং শেষ যুগীয় ইমামগণ তার পাল্টা জওয়াবও দিয়েছেন। আমি সেগুলো বিস্তারিতভাবে উদ্ধৃত করছি। ইমাম রাযী এ প্রশ্নগুলো তাঁর 'মাতালিবে আলিয়া' নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত করেন। 'শরহে মাওয়াকিফ' নামক গ্রন্থে এগুলো সংক্ষিপ্তভাবে উদ্ধৃত করা হয়। ইমাম রাযী মোটামুটিভাবে প্রশ্নাবলীর সংক্ষিপ্ত উত্তর দেন। কিন্তু 'শরহে মাওয়াকিফ' ইত্যাদি

গ্রন্থে প্রথমে বিষষটিকে সামগ্রিকভাবে তুলে ধরে উত্তর দেয়া হয়। অতঃপর প্রত্যেকটি প্রশ্নের বিস্তারিতভাবে পৃথক পৃথক উত্তর প্রদান করা হয়।

## মুজিযা সম্পর্কিত কয়েকটি প্রশ্নোত্তর

### প্রথম প্রশ্ন

যদি স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম এবং অলৌকিকত্ব বৈধ হয়, তবে বাস্তব এবং নিঃসন্দেহ বস্তু থেকেও মানুষের বিশ্বাস উঠে যাবে। যদি স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রমের ফলে মানুষ গাধায় পরিণত হয়, সূর্য অস্তমিত হয়ে আবার উদিত হয়, পাথর কণা বাকশীল হয়, মৃত ব্যক্তি কবর থেকে জীবিত অবস্থায় বেরিয়ে আসে, হামিদ হাবীবে পরিণত হয়, তবে কোন্ বস্তুটির প্রতি মানুষের আস্থা অটুট থাকতে পারে? যে সব বস্তুকে মানুয় বাস্তব ও নিশ্চিত বলে ধারণা করে, এমতাবস্থায় সেগুলো কি করে বাস্তব ও নিশ্চিত থাকতে পারে? কেননা সেগুলোও সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমের ফলে মৌলিক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তিত হতে পারে।

### উত্তর

আসমান-জমিন, পাহাড়-পর্বত সৃষ্টির চাইতে স্বভাবের ব্যতিক্রম অধিক বিস্ময়কর নয়। তাই স্বভাবের ব্যতিক্রম যে সম্ভব, এটা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। পরিবর্তনের সম্ভাব্যতা থাকা সত্ত্বেও কারুর মনে এ সন্দেহের উদ্রেক হয় না যে, হামিদ হয়তো হাবীবে পরিণত হয়েছে, গাধা হয়তো মানুষে পরিণত হয়েছে। তাই যদি স্বাভাবিক নিয়মে ছিটে-ফোঁটা দু' একটি ব্যতিক্রম ঘটে, তবে বাস্তবের বাস্তবতায় এবং স্বতঃসিদ্ধতায় কোন ব্যাঘাত জন্মায় না।

### দ্বিতীয় প্রশ্ন

যে বস্তুটি মুজিযা বলে অভিহিত, তা যে মন্ত্র বা যাদু নয়, সেটা কিভাবে নিশ্চিত করা যাবে?

### উত্তর

মুজিযার প্রভাবে প্রাকৃতিক নিয়মে যত বড় ব্যতিক্রম ঘটতে পারে, যাদুর প্রভাবে তা কখনো সম্ভব নয়। যেমন দরিয়া বিদীর্ণ হওয়া,

মৃত ব্যক্তির জীবিত হওয়া, আজন্ম মূক ও বধিরের বাকশক্তি ও শ্রবণ শক্তি লাভ করা ইত্যাদি। এ উত্তর দিয়েছেন মাওয়াকিফের ব্যাখ্যাকার এবং আরো অনেকে। কিন্তু তাঁরা এটা ভেবে দেখেন নি যে, নবীদের সব মুজিযা মহান ও বিশাল হয় না। এ ছাড়া আশয়ারিগণ এটা মেনে নিয়েছেন যে, যাদুর প্রভাবে প্রাকৃতিক নিয়মে যে কোন ব্যতিক্রমই ঘটতে পারে। অবশ্য মুতাযিলিগণ এতটুকু শর্ত আরোপ করেন যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ পদার্থ, জীবন, বর্ণ এবং স্বাদ সৃষ্টি করতে পারে না। কিন্তু আশায়েরাবাদিগণ মুতাযিলাবাদীদের এ মতবাদ সমর্থন করেন নি। ইমাম রাযী তাঁর 'তফসীর-এ-কবীর' গ্রন্থে হারুত-মারুতের ঘটনায় বিষয়টি বিস্তারিত ভরে আলোচনা করেন। তিনি এক স্থানে বলেন ঃ

'আহলে–সুন্নাত' এটা বিশ্বাস করেন যে, যাদুকর বাতাসে উড়তে পারে এবং সে মানুষকে গাধায়, আবার গাধাকে মানুষে পরিণত করতে পারে।''

গাধাকে মানুষে পরিণত করা অন্ধকে দৃষ্টি শক্তি দেয়ার চাইতে বেশী বিস্ময়কর নয় কি?

## তৃতীয় প্রশ্ন

মুজিযার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, 'কেউ এর প্রত্যুত্তর দিতে সক্ষম নয়।' এর অর্থ কি? ''কেউ'' বলতে যদি সংশ্লিষ্ট যুগের মানুষকে বুঝায়, তবে মুজিযার বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে না। কেননা, জোরোয়াস্টার এবং আবদুল্লাহ্ ইবনে মুকান্না. এর ন্যায় অনেক যাদুকর ও নুবুওয়াতের দাবীদার বিগত হয়েছে, যাদের প্রত্যুত্তর তখনকার মানুষরা দিতে সক্ষম হয়নি। আর যদি এ অর্থ হয় যে, তার প্রত্যুত্তর কেয়ামত পর্যন্ত কেউ দিতে সক্ষম নয়, তবে এ নিশ্চয়তা কে দেবে যে, নবিগণ যে অলৌকিকত্ব প্রদর্শন করেন, তার প্রত্যুত্তর কেয়ামত পর্যন্ত কেউ দিতে সক্ষম হবে না। ইমাম রাযী এ প্রশ্নটি তাঁর 'মাতালিবে আলিয়া' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন এবং এর সংক্ষিপ্ত উত্তরও প্রদান করেন। উত্তরটি পরে আলোচিত হবে। 'শরহে-মাওয়াকিফ' ইত্যাদি গ্রন্থে এ প্রশ্নটির উল্লেখ নেই।

## চতুর্থ প্রশ্ন

চতুর্থ প্রশ্ন হলো, আশয়ারীদের মতে জিন এবং শয়তান যে কোন পদার্থে অনুপ্রবেশ করতে পারে এবং অভ্যন্তর থেকে কথাবার্তাও বলতে পারে। এ মতবাদে অনেক মুজিযা সন্দেহযুক্ত হয়ে দাঁড়ায়। যেমন, কোন নবী এ মুজিযা দেখালেন যে, বৃক্ষ থেকে আওয়াজ বেরুচ্ছে। এতে সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে যে, হয়তো জিন বৃক্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে কথাবার্তা বলছে।

## উত্তর

আশায়েরাবাদিগণ এর উত্তরে বলেন, 'যাবতীয় কার্যের স্রষ্টা হলেন আল্লাহ্। তাই জিন ইত্যাদির যে কার্যাবলী রয়েছে, তা মূলতঃ আল্লাহ্রই সৃষ্টি।' কিন্তু এ প্রশ্ন এবং এ উত্তরের মধ্যে আমি কোন সঙ্গতি খুঁজে পাচ্ছি না। এই তো হলো বিস্তারিত জওয়াব। 'শরহে মাওয়াক্বিক' গ্রন্থে উপরিউক্ত প্রশ্নাবলীর মোটামুটি উত্তর দেয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, এসব প্রশ্ন কল্পনাপ্রসূত। তা কারুর বিশ্বাসে ফাটল ধরাতে পারে না।

মাওয়াকিফের ব্যাখ্যাকার যে উত্তর দেন, তা আশায়েরা মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। মুজিযার প্রভাবে লোকের মনে নবুওয়াত সম্পর্কে যে বিশ্বাসের সৃষ্টি হবে, তা যুক্তিবাদের উপর ভিত্তি করে নয়, বরং তা হয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে। সাধারণতঃ দেখা যায়, নবী থেকে যখন কোন মুজিয়া জাহির হয়, তখনি উপস্থিত লোকেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা বিশ্বাস করে নেয়। মাওয়াকিফ গ্রন্থের ব্যাখ্যাকার 'মুজিযার চিহ্ন' শীর্ষক অধ্যায়ে এ বিষয়টি পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করেন। তাঁর ব্যাখ্যা অনেকটা যথার্থ। কিন্তু এ ব্যাখ্যায় যাদুর উপর মুজিযার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয় না। কেননা নবুওয়াতের দাবীদার যদি একজন যাদুকর হয় এবং সে বিশাল আকারে যাদু দেখাতে সক্ষম হয়, তবে অজস্র লোক স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা বিশ্বাস করে নেয়। এমন অনেক মিথ্যাবাদী নবীরও আবির্ভাব ঘটেছে, যাদের প্রতি হাজার হাজার, বরং লক্ষ লক্ষ লোকও বিশ্বাস স্থাপন করেছে। ইমাম রাযী 'মাতালিবে আলিয়া' নামক গ্রন্থে এসব প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তরে বলেন, সমস্ত কর্মের স্রষ্টা হলেন আল্লাহ্। তাই মুজিযারও স্রষ্টা হলেন তিনি। মুজিযার উদ্দেশ্য হলো নবুওয়াতের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করা। তাই

মুজিযার এ উদ্দেশ্য সাধিত না হয়ে পারে না। ইমাম রাযী আশায়েরাবাদীদের চিন্তাধারার আলোকেই এ জওয়াব দেন। কিন্তু তিনি নিজেই এ উত্তরের গুরুত্ব দেননি। তিনি নবুওয়াতের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অন্য একটি পন্থা অবলম্বন করেন এবং সে সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, 'আমার এ প্রমাণ-পদ্ধতি সমস্ত অভিযোগ থেকে মুক্ত'। 'মাতালিবে আলিয়া নামক' গ্রন্থে তিনি এ পদ্ধতিটি ফলাও করে বিশ্লেষণ করেন। কিন্তু পরবর্তী ইমামগণ তা সম্পূর্ণরূপে নাকচ করে দেন।

মোট কথা, শেষ যুগীয় ইমামদের ধারা হলো, তাঁরা প্রমাণক্ষেত্রে এমন পদ্ধতি অবলম্বন করেন, যা অধিকতর জটিল এবং যাতে পদে পদে সমস্যা দেখা দেয়। এটা অবশ্য তাঁদের দুঃসাহসিকতারই পরিচয় বহন করে। কিন্তু এসব সমস্যা সমাধানে তাঁরা কতটুকু সক্ষম হন, তা'ই বিচার্য।

ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ আকাইদ প্রতিষ্ঠায় পূর্ববর্তী ইমামগণ যে সব প্রমাণ রেখে গেছেন, তা'ই ইলমে কালামের প্রাণধন। আমি বিষয়টি গ্রন্থের দ্বিতীয়ভাগে আলোচনার জন্য তুলে রাখলাম।

'আখিরু-দা'ওয়ানা আনিল্-হামদু-লিল্লাহি-রব্বিল-আলামীন'!